ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬০

প্রকাশক

কানাইলাল সরকার

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর

অজিত মুখোপাধ্যায়

রেয়ার প্রিণ্টস

৪বি, সীতানাথ রোড

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদ ব্লক

স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং

ব্লক মুদ্রণ

চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই

ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম চার টাকা

## কৈফিয়ত
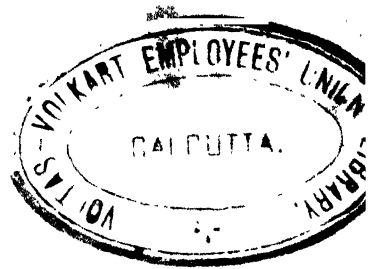
'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'—'হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা পরম সত্যের মুখ ঢাকা রয়েছে। 'হিরণ্ময় পাত্র' আবরণ, সত্যের সঙ্কোচাবরণ। সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ব্যাকৃতা মায়ার সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণগুলিই এই আববণ। অতি উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো এদের রূপ, অতি মনোরম এদের প্রকৃতি। সত্যের পরম সুন্দর, শুচিশুভ্র মুখখানি এরাই আবৃত করে রাখে, এরাই সত্যের আবরণরূপ হিরণ্ময় পাত্র বা Glittering disc :—মানুষের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে ওই 'নির্ঋতি', ওই 'বারুণী', ওই 'মহামদ'। অসত্যের এই পাত্র অপসারিত হলেই নির্বিশেষ সত্যের আনন্দঘন স্বরূপদর্শন ঘটে।

এই অসত্য মূর্তিকে আমাদের পুরাণে অস্বীকার করা হয় নি। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই এরা আছে। এরাই 'তামসী-সৃষ্টি' বা 'রুদ্র-সর্গ'। এরা ধর্মের চিরবৈরী হলেও একই লোকপিতামহের অঙ্গজ সন্তান। সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষার জন্য এদের উৎপত্তি। 'মৃত্যু' যদি না থাকত, জড়বস্তুর ভারে ও স্বার্থ লোভীর অত্যাচারে জগৎটা চিরকালের নরকে পরিণত হত। তা ছাড়া আলোর পাশে অন্ধকারকে রেখেই আলোর মহিমা দেখাতে হয়, কখনও দেখা যায়—অন্ধকারই হয় আলোর দূতী—যেমন 'দুর্ভগা' ( জয়া ), 'অন্তক' ( মৃত্যু ), 'নরক' নবজীবনের অভ্যুদয় সূচক।

অসৎ বৃত্তিগুলোকে অসৎ ভেবে আমরা চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছি। কিন্তু আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এভাবে এদের বর্জন করেন নি। তাঁরা দেখেছেন, যে 'বারুণী' বিশ্বে মদমত্ততা সৃষ্টি করে, সেই বারুণীই আবার কুণ্ডলী শক্তির উদ্বোধক। পঙ্কের কুৎসিত মূর্তিকে দেখানো এই আখ্যায়িকাগুলির উদ্দেশ্য নয়—এদের বিচার করতে হবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে—সামগ্রিক সৃষ্টির পটভূমিকায় রেখে এদের মূল্য যাচাই করতে হবে। চার্বাকের কথাই বলি, 'কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ'—এর অর্থ ব্যভিচারী কামনার প্রশ্রয় দেওয়া নয়—কামকে প্রেমে পরিণত করা—যা বৈষ্ণব, পাশুপত ও শাক্তধর্মের মূল কথা। অধর্মও আমাদের সাধনার অঙ্গীভূত—মহামায়ার মহাস্নানে পণ্যাঙ্গনা ভবনের ধূলিকণারও স্থান রয়েছে। সাংখ্যসূত্রে ( ৪।১১ ) বলা হয়েছে,—'নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ।'

এই আখ্যায়িকাগুলি সংগ্রহ করে আমি ভয়ে ভয়ে 'দেশ'এর কাছে এসেছিলুম। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক এগুলি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'দেশ'-এর সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে সর্বাধিক। তিনি আমাকে প্রিয় বন্ধনে বেঁধেছেন। গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করছি। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ কালে, ভারত-বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, আসাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আমি প্রবাসী বাঙ্গালীর অকুণ্ঠ প্রশংসা পত্র পেয়েছি, কতিপয় বন্ধু এর দু-একটিকে হিন্দীতে অনুবাদ করে ও প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই আমার প্রিয় বন্ধু সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে, যাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা আমাকে এগুলি গল্পাকারে গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছে। গল্পগুলির প্রকাশমূলে বন্ধুবর শ্রীপশু-পতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দান আমি কোনদিন ভুলব না। বিখ্যাত প্রকাশক 'ত্রিবেণী প্রকাশন'—এই আখ্যায়িকাগুলি সযত্নে ও সতর্কতার সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করেছেন।

হিরণ্ময় পাত্রের আখ্যায়িকা রচনায় আমাকে বিভিন্ন পুরাণ অনুসন্ধান করতে হয়েছে এবং তার জন্য গবেষণা-জনিত যে পরিশ্রম করেছি, দেশবাসীর কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পেলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

পোঃ গড়িয়া<br>
২৪ পরগনা<br>
বিষুব সংক্রান্তি<br>
১৩৬৬

নিবেদক<br>
শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

সাগরময় ঘোষ

প্রিয়বরেষু

## সূচীপত্র
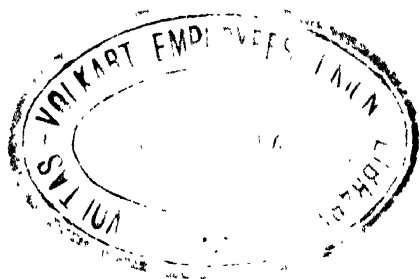
এই লেখকের

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী (নাটক)

শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

সাহিত্য দীপিকা

# ॥ নির্ঋতি ॥

সায়ন্তন সূর্যের শেষরশ্মি স্তিমিত হয়ে এল, পূর্ব দিগ্বলয়ে নামল সন্ধ্যার ঘোর। গোধূলির রহস্যঘন আলো-ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে রইল একা।

সম্মুখে বিশাল প্রান্তর—নির্জন, নিস্তব্ধ। দক্ষিণে বামে অন্তহীন শূন্যতা। একটা বুভুক্ষু রাক্ষস যেন বিস্তার করেছে করাল গ্রাস, অন্ধকার যেন তারই মুখগহ্বর। আতঙ্কে পলায়নপর পক্ষিকুল, পলায়নপর তপনদেব।

ভয়ে শিউরে ওঠে তারও অন্তরাত্মা। স্বভাবতই শুষ্ক তার বদন, বিশুষ্ক অধর। এখন যেন আরও শুষ্ক। শুষ্ক বক্ষ, শুষ্ক রসনা। শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে একটা সশঙ্ক ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, 'কেউ তো আসছে না এখনও? সে কি তা হলে পরিত্যক্তা!'—হু-হু-করা সন্ধ্যার সমীরণে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যর্থতার হাহাশ্বাস।

নাম তার নির্ঋতি। মহদ্ভয় উদ্যত যাঁর ভ্রূভঙ্গে, সেই বিধাতার আর-এক সৃষ্টি—পাপের সহচরী, কল্যাণের অরি, ধর্মের বৈরী। অসত্যের বক্র-কুটিল পথে তার গতি, গোপন তার পদক্ষেপ, ভ্রান্তিসৃষ্টিতে সে অদ্বিতীয়া। ছলনাময়ী, অতি ভয়ঙ্করী। অলক্ষ্মী সে, বিশ্বের অশান্তি। নিকৃতি সে ভীষণা বিভ্রান্তি।

তিমিরাদর্শে নিজের স্বরূপ দেখে নিজেই শিউরে ওঠে সে। নিরন্ধ্র অন্ধকারের মহাতমিস্রা তার দেহে, সিউকালীর মত কৃষ্ণ কেশ। রুক্ষ নয়নে খদ্যোতের মত তীব্র কটাক্ষ। সে যেন স্বয়ং রুদ্রাধিকারভুক্ত সন্ধ্যা। বুদ্ধিতে অবুদ্ধি—সে সংসারত্রাস।

কিন্তু আজ নিজেই সে সন্ত্রস্ত। নির্ঋতি প্রতীক্ষা করছে অনেকক্ষণ। কোথায় ঋষি-সত্তম উদ্দালক, তার ভাবী স্বামী? ফিরে আসবেন বলে, গিয়েছেন বহুক্ষণ। এখনও তো এলেন না! মহাপ্রান্তরের অতিবৃদ্ধ এক অশ্বত্থতলে সে একা, প্রান্তরের মতই পরিত্যক্তা। সন্ধ্যার ঘোর যত নিবিড়তর হয়, তত গভীর নৈরাশ্যে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। শঙ্কাকুল চিত্তে চলে স্মৃতির রোমন্থন।

আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণী, উচ্ছৃঙ্খল নির্ঋতি। অধর্ম তার জনক, হিংসা তার জননী। আশৈশব অধর্মে আর হিংসায় তার মন্ত্রদীক্ষা। নিয়মহীন বিশৃঙ্খলার

পথে স্বাধীন তার গতি। তাদের বংশের চিরশত্রু ধর্ম; বংশের একমাত্র লক্ষ্য ধর্মের নির্যাতন ও উৎসাদন। নির্ঋতিরও সেই এক লক্ষ্য,—ধর্মের রাজ্যে সে সৃষ্টি করবে উপপ্লব। নীড় বেঁধে গৃহধর্মের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা তার হয় নি কোনদিন। অলক্ষ্মী সে, চিরচঞ্চলা। চঞ্চল চরণে সে বিশ্ব পরিক্রমণ করে, সুযোগ পেলেই অলক্ষ্যে আক্রমণ করে ধর্ম-মিত্রকে।

নির্ঋতির সহোদর অনৃত। সে মিথ্যার বিগ্রহ, মূর্তিমান ব্যভিচার। কৃষ্ণকায়, বিরাট দেহ। যেমন দুর্নীতিপরায়ণ তেমনি কুটিল। চির কামাবচর। শৈশব থেকেই সে নিরুদ্দেশ। নির্ঋতি তাকে দেখে নি কোনদিন, কিন্তু শুনেছে তার কথা। নির্ঋতির একান্ত আগ্রহ, অনৃতকে সে খুঁজে বের করবে। ভ্রাতা ও ভগ্নী—দুইজনে মিলে বিপর্যস্ত করবে ধর্মের রাজত্ব।

কোথায় অনৃত? অনৃতকে সে খোঁজে, সন্ধান করে গৃহে, গৃহান্তরে। যেখানে শান্তি ও সংযম সেখানে নয়, যেখানে তুষ্টি ও পুষ্টি সেখানে নয়। অনৃত সেখানে থাকে না। অধর্মের ক্ষেত্রজ সন্তান, হিংসার নয়নানন্দ—স্থিতি তার পাপে, মিথ্যা ভাষণে, কুটিল কর্মে। ইন্দ্রিয়-মিত্র চঞ্চল অনৃত, আসক্তি তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগলোকে।

নির্ঋতির অনুসন্ধিৎসা তাই তাকে আকর্ষণ করে উচ্ছৃঙ্খলতার সর্পিল সরণিতে। সে ঘুরে বেড়ায় স্বার্থপর, লোভকুটিল, প্রমত্ত মানুষের গৃহে—উদ্‌গ্রীব হয়ে সে বিচরণ করে রূপাসক্ত রিপু-কিঙ্করের প্রমোদ-ভবনে। অসত্য যেখানে পদে পদে প্রমাদ সৃষ্টি করে, সে অনৃতকে সেইখানে খোঁজে; শান্তির রাজ্যে যেখানে অশান্তি প্রলয়শিখা বিস্তার করে, নির্ঋতির সেখানে সোৎসুক পদক্ষেপ। কিন্তু কোথায় অনৃত, নির্ঋতির প্রিয় সহোদর!

অনৃতকে সে পায় না, বিরতও হয় না তার কামচারী গতি। সে বহুরূপিণী। বহু রূপ ধারণ করে সে বিশ্ব সঞ্চরণ করে। অধার্মিকের ভবনে উন্মুক্ত তার প্রবেশদ্বার। কখনও দৃষ্টির অগোচরে মানুষে মানুষে সে বৈষম্য সৃষ্টি করে, কীটরূপে কেটে দেয় বন্ধুত্বের বন্ধন; কখনও প্রেমের পাত্রে কামনার বিষ ঢেলে রাখে। নিজে সে বিকৃত, কদাকার—সৃষ্টির বিকৃতি ও কদাচারে তার উৎকট উল্লাস। জঘন্য কাম, দুর্জয় ক্রোধ, দুরন্ত লোভের রাজত্বে সে বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী। সেখানে স্বরূপে তার আত্মপ্রকাশ। সেখানে সে মূর্তিমতী নিকৃতি।

সর্বাপেক্ষা বিভ্রান্তিকর তার শুষ্ক মুখের স্মিত হাসি। স্থূলোদরী সে, স্থূলোষ্ঠী। রক্তাক্ত লোচনে মদিরেক্ষণ। সসজ্জ হয়ে সে যখন হাস্য করে, কথা বলে—

তখন কী জানি কেন, তাকে অসামান্যা সুন্দরী বলে মনে হয়। অনন্যসাধারণ তার উক্তির পারিপাট্য, বচনে মধুর ধারা। মিথ্যাকে সে প্রত্যক্ষ সত্যের মত প্রমাণ করে, অকাট্য যুক্তি, অপ্রতর্ক্য সিদ্ধান্ত। কে বলবে, সে ছলনাময়ী? কে বলবে, সে বিষকুম্ভ পয়োমুখ? মনে হয়, সত্যের প্রতিমা নির্ঋতি।

কিন্তু নির্ঋতির এই নিকৃতি-জালে আবদ্ধ হয় তারাই, যারা লোভী, কামুক, স্বার্থান্ধ। মুখ্য লক্ষ্য যে ধর্মরাজ্য, শত চেষ্টা সত্ত্বেও নির্ঋতি সেখানে প্রবেশপথ পায় না। পঞ্চযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত গৃহের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ। সংযাতাত্মা পুরুষ মুহূর্তে তার কৌশল বুঝতে পারে। সত্যসন্ধী মানুষ তাকে দেখে উপেক্ষার হাসি হাসে। নির্ঋতির অন্তরে সে হাসি বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ধার্মিকের নিকট তার চির পরাজয়। শান্ত, স্থির তপোবনে প্রবেশ করতে নিজেই ভয় পায় নির্ঋতি।

এই পরাজয় তার অন্তরে সৃষ্টি করে ক্ষুব্ধ আক্রোশ। রুক্ষ, কৃষ্ণ কেশপাশে আবৃত তার মেঘপ্রভ আননের আরক্ত নয়ন ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে ওঠে। ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে সে। স্থূল ওষ্ঠ স্থূলতর হয়, শুষ্ক বদন হয় আরও বিকট। নির্ঋতি প্রতিজ্ঞা করে, অনৃতকে সে খুঁজে বের করবেই। ভ্রাতা ও ভগ্নীতে মিলে তারা তপোধনের তপোবনে সৃষ্টি করবে ঘোর আলোড়ন। কে জানে, অনৃত হয়তো ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ধর্মের ওই আশ্রমেই, হয়তো অধিকার খুঁজছে গোপনে।

কল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য উন্মাদ হয় সে। নিকৃতির আশ্রয়ে নির্ঋতি কী না করতে পারে! ছলনার যাবতীয় কৌশল তার করায়ত্ত। অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে সে তীব্র কালকূট ঢেলে দিতে পারে। তার মিথ্যা চক্রান্তে শ্যামল ভূমি মুহূর্তে ঊষর মরুভূতে পরিণত হয়। ভীষণ, অব্যর্থ তার ষড়যন্ত্র।

ছলনার অভিসন্ধি নিয়ে ছলনাময়ী তাই উপস্থিত হল বিধাতার নিকট। কৌশলে করায়ত্ত করতে হবে সৃষ্টি-কুশলী কমলযোনিকে। অন্তরের কুশ্রী ইচ্ছাকে গোপন করে, স্থূল ওষ্ঠে যতটা সম্ভব সুস্মিত হাস্যরেখা টেনে, সে বিধাতাকে জানাল, 'জন্ম থেকেই স্বেচ্ছাচারিণী আমি, অতি চঞ্চলা। আজ আমি ক্লান্ত। স্বেচ্ছা-বিহারে বীতস্পৃহ আমি, আমি গৃহ চাই। অবিবেকী মিথ্যাকে সমূলে ধ্বংস করব। দয়াময়, আমাকে তুমি এমন একজন সত্যসন্ধী ঋষিসত্তমের সঙ্গ দাও, যার সাহচর্যে আমার স্বভাব পরিবর্তিত হতে পারে।'

করুণাময় বিধাতাপুরুষ। নির্ঋতির কাতর প্রার্থনায় তাঁর অন্তর বিগলিত হল,

চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি ভাবলেন, 'হায়, ওর মত দুঃখী কে! চির-অশান্ত, তাই ক্লান্ত। শান্তি যদি চায় নির্ঋতি, শান্তি হক ওর জীবনে; নীড় বেঁধে যদি সুখী হয় নির্ঋতি, নীড় হক ওর।'

উদার দৃষ্টি মেলে বিধাতাপুরুষ দেখলেন বিরাট সৃষ্টির রূপ। তাকালেন ঊর্ধ্বে, অধোদেশে; দক্ষিণে, বামে; ওই সপ্তলোক—ভূর্লোক, ভুবর্লোক স্বর্লোক, মহর্লোক জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক; সপ্ত-লোকে স্থাপিত চতুর্দশ ভুবন। কে আছেন এমন ঋষি, যাঁর করুণাছায়ায় নির্ঋতি আশ্রয় পাবে, জীবনের জ্বালা ভুলবে সে স্নেহের স্নিগ্ধস্পর্শে?

সহসা স্মরণ হল ঋষিসত্তম উদ্দালকের কথা। আরুণি উদ্দালক—জ্ঞানী, নিরহঙ্কার, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ধর্ম, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত তাঁর আশ্রম। শুদ্ধ সত্ত্বের প্রতিমূর্তি—শান্ত, উদার, স্থিতধী। তাঁর নিকট সমান সুখ-দুঃখ, সমান শীতোষ্ণ। শত্রু-মিত্রেও তাঁর সমজ্ঞান। নির্ঋতির মত অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিতে পারেন সেই তপোধন।

কাতর নির্ঋতির প্রতি করুণাঘন দৃষ্টি মেলে নির্দেশ দিলেন বিধাতাপুরুষ, 'ঋষি উদ্দালকের স্নেহস্পর্শে তোমার শান্তি হক নির্ঋতি, অন্ধকার বিদূরিত হক সাধন-সত্যের জ্যোতির্ময় আলোকে। তুমি তাঁর তপোবনে যাও, তিনি তোমায় গ্রহণ করবেন।'

অন্তর্ধান করলেন বিধাতাপুরুষ। উল্লাসে নেচে উঠল নির্ঋতির অন্তর। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের মহা সুযোগ উপস্থিত। অনৃতকে যদি সে খুঁজে না পায়, নির্ঋতি একাই নির্মূল করতে পারবে ধর্মের আশ্রম। এতদিন রুদ্ধ ছিল যে প্রবেশদ্বার, আজ বিধাতার নির্দেশে তা উন্মুক্ত। ছলনায় সে মতিভ্রষ্ট করবে ধার্মিককে। কৌশলের অসাধ্য কী? জগতে নিকৃতির জয়জয়কার। উৎকট উল্লাসে সে এসে উপস্থিত হল তপোঋদ্ধ ঋষি উদ্দালকের আশ্রমে।

তখন সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেছে, সমাপ্ত হয়েছে সায়ংসন্ধ্যার ক্রিয়া। স্তব্ধ ব্রাহ্মণগণের কলকলধ্বনি। শান্ত আশ্রমপদে নিবিড় প্রশান্তি, যেন উচ্চারিত শান্তিমন্ত্রের ক্রিয়া বিস্তার করেছে প্রত্যক্ষ প্রভাব। চতুর্দিকে 'ওঁ শান্তি' বাণীর অনুরণন। উল্লসিত নির্ঋতির উৎসাহ যেন স্তিমিত হয়ে আসে। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে সাহস সঞ্চয় করে সে ধীরে প্রবেশ করে আশ্রমে, মুখে মধু ঢেলে ঋষিকে জানায় বিধাতার অভিপ্রায়।

ঋষি উদ্দালক দ্বিধা করলেন না। অসঙ্কোচে তিনি নির্ঋতিকে গ্রহণ

করলেন। সত্যের স্পর্শে অসত্য যদি সত্যসন্ধী হয়, কোন্ কল্যাণ-মিত্র তাতে প্রতিবাদী হয়? ঋষির তপস্যা সত্যের, কল্যাণের। স্বার্থান্বেষী, লোভী মানুষের মিথ্যাচারে যে পাপ পুঞ্জীভূত হয়, ঋষির তপঃশক্তিতে হয় তার বিনাশ। সংশিতব্রত তাপসের তপস্যার ষষ্ঠাংশ কররূপে গৃহীত হয় বলেই রাজ্যের কল্যাণ অক্ষুণ্ণ থাকে। তপোবনের প্রভাব অসামান্য। এ প্রভাব তো মানুষের মঙ্গলার্থে। আরও ভাবলেন ঋষি উদ্দালক, নির্ঋতি মূর্তিমতী অলক্ষ্মী, নির্ঋতি মিথ্যা ব্যভিচার। তাতেই বা ক্ষতি কী? উত্তমের অধম-সংস্পর্শেই বা ভয় কোথায়? 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' যাঁর জীবনের ধ্যান, তিনি যে সত্যের স্পর্শমণি; সে মণি চির অমলিন, তার স্পর্শে কৃষ্ণায়স্ স্বর্ণে পরিণত হয়। বিনা দ্বিধায় তাই ঋষি উদ্দালক নির্ঋতিকে গ্রহণ করলেন, মুখে শোনালেন, সত্যের দুর্জয় বাণী: 'ধৃতির সাহচর্যে তোমার মতি স্থির হক নির্ঋতি, সত্যের সংস্পর্শে তোমার মিথ্যাচার সত্যসন্ধানী হক, পুণ্যের পবিত্র স্পর্শে কলধৌত হক তোমার কলুষিত হৃদয়, তুমি উজ্জ্বল হও।'

ঋষি উদ্দালকের আশ্রমে সে রাত্রির মত আশ্রয় পেল নির্ঋতি। স্থির হল, পরদিন অগ্নিসাক্ষী করে যথাবিহিত নিয়মে সে হবে ঋষি উদ্দালকের ধর্মপত্নী।

কিন্তু এ কী হল নির্ঋতির! তিমিরঘন রাত্রি, নির্ঋতির মহাসুযোগ। অথচ কিছুই করতে পারছে না সে! অন্তরে উৎকট পাপ ইচ্ছা, কিন্তু নিস্তেজ তার কর্মেন্দ্রিয়। প্রচণ্ড একটা অগ্নি-উচ্ছ্বাসকে প্রকাণ্ড একটা পাষাণ যেন চাপা দিয়ে রেখেছে। বিনিদ্র নয়ন, দেহময় নিদারুণ উত্তেজনা। কুটিরাভ্যন্তর অসহ্য মনে হয়। অস্থিরভাবে সে এসে দাঁড়ায় কুটিরদ্বারে।

শান্ত আশ্রমপদ। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তপোধীর ঋষিবৃন্দ। ঘুমন্ত পৃথিবী—সুপ্তিমগ্ন জীবজন্তু। হিংস্র সর্প-ব্যাঘ্র হিংসাহীন। অন্ধকারে সদাজাগ্রত নিশাচর প্রাণী নিশ্চিন্ত আরামের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। স্তব্ধ বনস্পতি-ওষধি, নিস্তব্ধ গ্রহ-তারকা। অব্যক্ত-চৈতন্য বিশ্বচরাচর নিশ্চেষ্ট। অমনি একটা নিশ্চেষ্টা আশ্রয় করেছে নির্ঋতির উদ্দাম প্রকৃতিকে, যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়েছে উন্নতফণা এক কালনাগিনী। অপূর্ব সুযোগ, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াশক্তি।

অস্থির নির্ঋতি—অস্থিরচিত্তে পদচারণা করে। মস্তিষ্কে অগ্নিজ্বালা। ছিদ্রপথে ছিদ্রান্বেষণ ব্যর্থ হয়েছে তার। ছলনা এবার যেন প্রত্যাঘাত করছে তাকেই। প্রশান্ত আশ্রমের প্রশান্তি তাকে উন্মাদ করে তোলে। আর বাইরে দাঁড়াতে পারে না। আতঙ্কে দ্রুত পদসঞ্চারে সে কুটিরাভ্যন্তরে আসে, কম্পিত বিবশ দেহকে সে এলিয়ে দেয় শয্যায়।

উত্তপ্ত মস্তিক, ক্লান্ত দেহ, শ্রান্ত নয়ন। নির্ঋতি ঠিক বুঝতে পারে না, কী সে চায়? তার কামনা কি প্রেম, না প্রতিশোধ! প্রেম যদি, কেন এই উত্তেজনা! প্রতিশোধই যদি তার কাম্য, কেন এই নিষ্ক্রিয়তা! বিচ্ছিন্ন চিন্তার সূত্রকে সে জোড়া দিতে পারে না। এক সময় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে আসে ক্লান্ত নয়ন। মুদ্রিত নয়নপল্লব স্বপ্নঘোরেও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

রজনী প্রভাতকল্পা। শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগ্রত হল ঋষি উদ্দালকের আশ্রম। 'এই সমিধ, এই হবি, ওই যে অরণি' প্রভৃতি শব্দে মুখর হয়ে উঠল তপোবন। অগ্নি প্রজ্জলিত হল, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বলে যজ্ঞাগ্নিতে আহুত হল হবি। হোমধূপের সৌরভে আমোদিত সমীরণ, পদক্রমে উচ্চারিত সুগম্ভীর বেদধ্বনিতে মন্দ্রিত অরণ্যভূমি। সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর গীত।

ঘুম ভেঙে গেল নির্ঋতির। চকিতে চোখ মেলে চাইল সে। সে যেন আতঙ্কগ্রস্ত। নয়নে ত্রাস, সর্বাঙ্গে স্বেদ, মুখে আর্তচিহ্ন। উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠল নির্ঋতি। অসহ্য, অসহ্য! হোমধূপের সৌরভ অসহ্য, অসহ্য গম্ভীর বেদধ্বনি। মাতালের মত ছুটে বেরিয়ে এল সে, কম্পিত অঙ্গ—স্খলিত চরণ। কিন্তু অবরুদ্ধ আশ্রমের নির্গমনদ্বার। উত্তেজিত হয়ে সে এসে উপস্থিত হল ঋষি উদ্দালকের সম্মুখে, বলল ত্রস্তকণ্ঠে, 'আমি থাকব না, থাকব না এ আশ্রমে। আমাকে দূরে নিয়ে চল, ঋষি। এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা অসম্ভব।'

বিস্মিত, স্তম্ভিত উদ্দালক। এ কী বলছে নির্ঋতি! কোন কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই ঝড়ের বেগে নির্ঋতি তাঁর হাত জড়িয়ে ধরল—চোখে মিনতি, কণ্ঠে ভয়ার্তি: 'আমায় পথ দেখিয়ে দাও, আমায় বাইরে নিয়ে চল।'

'কিন্তু, কেন?' প্রশ্ন করলেন উদ্দালক।

'এখানে নয়, এখানে নয়—তুমি আমায় দূরে নিয়ে চল, আমি সব কথাই বলব তোমায়।'—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে নির্ঋতি। দ্রুত আকর্ষণ করতে থাকে ঋষিকে। উদ্দালক বাধ্য হন তাকে নিয়ে আশ্রমের বাইরে আসতে। যতবার বলেন ঋষি, 'বল, কেন এলে'—ততবার বলে নির্ঋতি, 'চল দূরে, আরও দূরে।'

বিদ্যুৎবেগে ছুটেছে নির্ঋতি, ঋষিকে সঙ্গে নিয়ে, ছুটেছে ঠিক ভূতগ্রস্ত আতঙ্কিতের মত। সারাদিন ঘুরেছে, থামবার মত স্থান পায় নি কোথাও। কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে চরণ—ভ্রূক্ষেপ নেই, উচ্চাবচ ভূমিতে হয়েছে পদস্খলন—বোধ নেই, ঊর্ধ্বে মধ্যাহ্ন-ভাস্করের প্রখর দীপ্তি—আতপ্ত পদতল, তবু জ্ঞান নেই। সঘন নিশ্বাস, পরিশ্রান্ত দেহ। তথাপি চলেছে বিরতিবিহীন পথপরিক্রমা। অবশেষে

অপরাহ্ণে সে এসে দাঁড়িয়েছে দিগন্তবিস্তৃত এক পরিত্যক্ত প্রান্তরে নির্জন অশ্বত্থতলে। এইখানে মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে নিঋ্ঁতি। আশ্রম নয়, আশ্রম থেকে দূরে—বহুদূরে এই জনশূন্য প্রান্তরই তার যোগ্য বাসভূমি।

'কেন চলে এলে?'—শুধালেন ঋষি। বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি তাঁর।

বুকভরে উন্মুক্ত প্রান্তরের বাতাস টেনে অনর্গল বলে চলে নিঋ্ঁতি, 'যেখানে বেদধ্বনি ছন্দিত হয়, সেখানে আমি বাস করতে পারি না। যেখানে হয় যজ্ঞ, দেবপূজা—তা-ও আমার বাসযোগ্য নয়। সংযম, শুদ্ধি, সত্য আমার চোখের বিষ। যজ্ঞহীন, দানহীন, অতিথি-সংকারহীন স্থান আমার আবাসভূমি। আমি অলক্ষ্মী, আমার উল্লাস শূন্যতায়, শ্রীহীনতায়, ধূমল ধূসরতায়। আমি নিঋ্ঁতি বিশ্বের অসত্য—মিথ্যাচারে কুটিলতায় ব্যভিচারে আমার স্থিতি। আমি নিকৃতি—হিংসায়, ছলনায়, ষড়যন্ত্রে আমার আনন্দ।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন ঋষি উদ্দালক। সৃষ্টির এ কী অনিয়ম নিঋ্ঁতি! ধর্ম-কর্মের বিরোধী, আচার-নিয়মের অরি, পাপ-সহচরী সে। একে নিয়ে কী করবেন, কোথায় যাবেন তিনি? বিধাতার কী অভিপ্রায়? ধর্মাদি ত্রিবর্গ সাধনের সহায়িনী ভার্যা, পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রী। যে পত্নী সেই ধর্মাচরণের প্রতিবন্ধক, ধার্মিকের গৃহে কোথায় তার স্থান?

বিচলিত হলেন মুনি উদ্দালক, যেন ভূকম্পনে ঈষৎ চঞ্চল স্থির ভূধর। ঋষিকে মৌন দেখে নিঋ্ঁতিও অস্থির হল। পূর্ণ কি হবে না তার মনস্কাম! ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল সে, 'আমাকে কি তা হলে তুমি গ্রহণ করবে না, ঋষি?'

'না, না—তা নয়।'—বললেন স্থিতধী উদ্দালক, 'তুমি অপেক্ষা কর, তোমার বাসযোগ্য ভূমি কোথায়, আমি শুনে আসি বিধাতার নির্দেশ।'

গমনোদ্যত উদ্দালককে বাধা দিয়ে কাতরভাবে বলল ক্লান্ত নিঋ্ঁতি, 'তুমি তো সত্যি ফিরে আসবে আবার!'

'মিথ্যা হয় না ঋষি-বাক্য। সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার আচরণ, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার বাণী। তুমি অপেক্ষা কর, আমি শুধু জেনে আসি বিধাতার নির্দেশ—ধার্মিকের নিলয়ে কোথায় নিঋ্ঁতির স্থান?'

ধীর চরণে চলে গেলেন ঋষি। আদিত্যপথে যেমন যাত্রা করে রাজহংস, তেমনি আকাশপথে অন্তর্হিত হলেন যোগ-সিদ্ধ উদ্দালক। নিঋ্ঁতির কর্ণে জেগে রইল একটি অনুরণন, 'আমি আসব, আসব, আসব।'

সেই থেকে প্রতীক্ষা করছে নির্ঋতি, প্রতীক্ষা করছে জনহীন পরিত্যক্ত প্রান্তরে শুষ্কশাখ অশ্বত্থতলায় চরন্‌-শ্রান্ত দেহ, ক্লান্ত নয়ন। তবুও চক্ষু তার মুদ্রিত হয় নি ক্ষণেকের তরে। আরক্ত লোচনে শ্রান্তিহীন প্রতীক্ষা, উৎকন্ঠিত দৃষ্টি। অপরাহ্ণের বিদায়ী সূর্যের শেষরশ্মিপাতে আরক্ত হয়েছে দিগন্ত, আরক্ত হয়েছে সূর্যবিরহে; প্রতীক্ষাব্যাকুল নির্ঋতির রক্তে জেগেছে শিহরণ। ধীরে মিলিয়ে গেছে সোনালী কিরণ, মিলিয়ে যায় নি নির্ঋতির আশার দীপ। তারপর নেমেছে সন্ধ্যা, তিমিরাঞ্চলে আচ্ছাদিত দিগ্বলয়। তখন কেঁপে উঠেছে নির্ঋতির অন্তর, ঋষি কি আসবেন না!

ঘোর রাক্ষসী মুহূর্তে নির্ঋতি ভয় পেয়ে গেল। সমীরণে যেন প্রেত-পিশাচের হাহাশ্বাস! তার শুষ্ক বদন শুষ্কতর হয়ে উঠল। যৌবন-দর্পিতা, মদ-বিহ্বলা আজন্ম-স্বেচ্ছাচারিণীর অন্তরে সভয় কম্পন। গভীর নৈরাশ্যে যেন ভেঙে পড়ল নির্ঋতি। বড় সহায়হীন, বড় একা সে। পাপমতি সে, নির্বাসিতা। এ নির্বাসন থেকে মুক্তি নেই, চেষ্টা করলেও মুক্তি পাবে না। বিধাতা ধরে ফেলেছেন তার ছলনা, ধরে ফেলেছেন কুহকিনীর মিথ্যা কৌশল। ওই গাঢ় অন্ধকার বিধাতার উদ্যত বজ্র, এই নিঃসীম নীরবতা প্রলয়ের পূর্বাভাস।

কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরেছে নির্ঋতির। একটা ক্রন্দন অন্তর বিদীর্ণ করে উত্থিত হয়, কিন্তু স্তব্ধ হয়ে যায় কণ্ঠেই। সভয়ে নিমীলিত হয়ে আসে অক্ষিপুট। প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখ মেলে রাখে। একটা অতি ক্ষীণ আশা, মিথ্যা কি হয় ঋষিবাক্য! সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ধর্ম, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের বাক্য—ঘনতমিস্রার দিগ্‌দর্শন তাঁদের শব্দজ্যোতি।

নিরাশ হলেও নির্ঋতি প্রতীক্ষা করে। উত্তরঙ্গ সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ আশা, কোথায় ঋষি, কোথায় সত্যবাদী উদ্দালক!

সহসা সেই গাঢ় তমসায় পরিত্যক্ত প্রান্তরে একটা শব্দ ওঠে—কার যেন গোপন পদ-সঞ্চার। ঋষি কি এলেন তা হলে? ভর্তা কি এলেন ভীতা ভার্যাকে আশ্রয় দিতে? কম্প্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে নির্ঋতি, 'তুমি কি এলে ঋষি!'

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু শোনা যায় কার যেন উত্তর, 'আমি এসেছি।'

এসেছেন, তিনিই এসেছেন। আনন্দে উল্লাসিত হয় নির্ঋতি। কী গভীর আশ্বাস! নির্ঋতির যেন নবজন্ম হয়েছে আজ। নৈরাশ্যের তীর্থনীরে স্নান করে পাপমতি নির্ঋতি আজ শুভ্র, পবিত্র। আজ সত্যিই সে প্রেমার্থিনী। আজ আর সংশয় নেই, দ্বিধা নেই। লোভকে, লালসাকে, মিথ্যার ব্যভিচারকে সে

নিঃশেষে বিসর্জন দেবে, নিবিড়ভাবে গ্রহণ করবে সত্যদ্রষ্টা ঋষির প্রেমালিঙ্গন। সে আর-কিছু চায় না। আজ একান্তভাবে সে কামনা করে সত্যের স্পর্শ।

নির্ঋতি ভাবতে চেষ্টা করে, এও কি ভান ? এও কি ছলনা ?—হয়তো ভান নয়, ছলনা নয়। লোপ পেয়ে গেছে তার বিচারবুদ্ধি। বিমূঢ়া নির্ঋতি।

সহসা কে তাকে আলিঙ্গন করল, উষ্ণ—জ্বালাময় আশ্লেষ। রোমাঞ্চিত নির্ঋতি। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে, চোখের পাতায় কী নিদারুণ ক্লান্তি ! আবেশে মুদ্রিত হয়ে আসে নয়ন। নির্ঋতি ভাবে, সত্যের স্পর্শ বুঝি এমনই উত্তপ্ত, এমনি প্রচণ্ড, এমনি আবল্য-সঞ্চারী। কথা বলতে পারে না সে। অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে ; নিঃশেষে নিজেকে সে সমর্পণ করে কামনার নিবিড় বাহুপাশে।

আকাশে কি ঝড় উঠেছে ? উন্মাদ প্রলয় যেন আজ নির্বাধ। সমুদ্র-মন্থনের ঘোর গর্জনে যেন বধির শ্রুতিমূল। সর্বাঙ্গে রক্তকণার উত্তাল নৃত্য। আজ নির্ঋতির রভস-রজনী। আজ নির্ঋতির উল্লাস। নির্মম ঋষিকে সে জয় করেছে, ধর্মধীরের তেজকে সে গ্রহণ করেছে নিজের মধ্যে। আজ তার জয়, ঋষির পরাজয়—নির্ঋতির বিজয়, সত্যের পরাভব। নির্জন প্রান্তরে অন্ধকারে দণ্ডায়মান এই শুষ্কশাখ, নিষ্পত্র অশ্বত্থবৃক্ষ অলক্ষ্মী নির্ঋতির জয়গৌরবের সাক্ষী।

রজনী প্রভাত হল, শান্ত হল যেন প্রলয়ের মদমত্ততা। তমঃপ্রচ্ছাদিত দিগ্বলয় প্রথম আলোর শুভ্রকিরীট মাথায় পরে ঘোষণা করল জ্যোতির্ময় সত্যের আগমন বার্তা। উষার গোধূলিতে চোখ মেলে তাকাল রমণক্লান্ত, তৃপ্ত নির্ঋতি। কিন্তু মুহূর্তেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বসল সে। এ কী ! কার আলিঙ্গন-পাশে ধরা দিয়েছে নির্ঋতি ! এ তো স্বর্ণকান্তিকান্ত ঋষিসত্তম উদ্দালক নয়। এ যে তারই মত ভীমদর্শন, কৃষ্ণকান্ত—আসঙ্গলোভী, লালসাকুটিল, কদর্য ! আতঙ্কে আর্তকণ্ঠে পাগলের মত চিৎকার করে ওঠে নির্ঋতি, 'কে তুমি ! কে তুমি !"

উত্তর আসে, 'আমি অনৃত।'

অনৃত ! অধর্ম-নন্দন, নির্ঋতির সহোদর অনৃত ! হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নির্ঋতি। এ কী সর্বনাশ হল তার ! সত্যকে আঘাত করতে গিয়ে, ধর্মকে জয় করতে গিয়ে, অসত্যের লূতাতন্তুতে নিজেই আবদ্ধ হয়েছে সে। ভীম ভল্লাহতা বরাহীর মত মূর্ছিতা হল নির্ঋতি।

বিমূঢ়, হতবাক অনৃত। সভয়ে পালিয়ে গেল লম্পট। দূরে শোনা গেল, ঋষি উদ্দালকের আশ্বাসভরা গম্ভীর মধুর কণ্ঠঃ 'কোথায় নির্ঋতি ! এই যে এসেছি আমি।'

তখন সংজ্ঞাহারা নির্ঋতি।

অনৃত ও নির্ঋতি—অসত্য আর মিথ্যা। অধর্ম ও হিংসার পুত্র ও কন্যা তারা—বিশ্বের ব্যভিচার ও অলক্ষ্মী। তাদের অসত্যসাধনার বিষময় ফল সর্বান্তক মৃত্যু। মৃত্যু ব্যভিচারী কামনার কালকূট, মহাভয়। বিশ্বব্যাপী তার সদম্ভ নিষ্ঠুর আস্ফালন। জননী তার ঋত-রিপু নিকৃতি-নিপুণ নির্ঋতি।*

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১১৬ অধ্যায় ]

# ॥ দর্পক ॥

দর্পক সদর্পে উপস্থিত হল রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদে। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশ, বিশ্বামিত্রকে তপোভ্রষ্ট করতে হবে। অমিততেজা বিশ্বামিত্র—দর্পিত, উগ্র, ক্রোধান্বিত। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, নূতন স্বর্গ, নূতন ইন্দ্র সৃষ্টি করবেন। স্থিরাসনে অত্যুগ্র তপস্যায় তিনি আসীন ; নিশ্চল দেহ, নিমীলিত নয়ন, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস। ধৃতব্রত তাপসের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উগ্র তপস্যার উগ্র দীপ্তি।

শঙ্কিত হয়েছেন বজ্রী ইন্দ্র। স্বর্গ-রাজ্যের একাধিকার বুঝি বিপন্ন হয়! বিশ্বামিত্রকে পদভ্রষ্ট করার আয়োজনে ত্রুটি করেন নি তিনি। পাঠিয়েছেন ভূত-প্রেত-পিশাচ, ছদ্মবেশ ধারণ করে এসেছে প্ররোচক ক্রোধ, লোভ। ব্যর্থ হয়েছে তারা, ব্যর্থ হয়েছে ইন্দ্রমায়া। নিরুপায় হয়ে দেবরাজ কামদেবের শরণাপন্ন হয়েছেন। মিনতি করে বলেছেন তাকে, 'অপরাজেয় তোমার বিক্রম, ত্রিজগতের দর্প মুহূর্তে চূর্ণ করতে পার তুমি। কন্দর্প, তুমি আমার সহায় হও।'

বজ্রধারী যে ইন্দ্রের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় ত্রিভুবন, তাঁর করুণ মুখচ্ছবি দেখে হেসে উঠেছে কন্দর্প। গর্বে পূর্ণ হয়েছে অন্তর। সার্থক তার কন্দর্প বা দর্পক নাম। বিশ্বামিত্র কোন্ ছার, স্বয়ং বিধাতাকেও সে বিভ্রান্ত করতে পারে।

পুষ্কর তীর্থের রমণীয় প্রস্থে ধ্যানে বসেছেন বিশ্বামিত্র। আদিত্যতুল্য তেজ, সমুদ্রের মত গাম্ভীর্য—মন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছে ব্রহ্ম-তন্ময়তায়। ধীরে এগিয়ে এল দর্পক, যেন বিশ্ববিজয়ী বীর। অলক্ষ্যে সে লক্ষ্য করল ঋষিকে, লক্ষ্য করল চতুষ্পার্শ্বস্থ অরণ্যভূমি। ইন্দ্রের নির্দেশে আশ্রমপদে এসে উপনীত হয়েছে স্বরপ্সরী মেনকা। অপরূপ রূপ—অনিন্দিত কান্তি। বিভ্রম-উৎপাদনেও কুশলী সে। কিন্তু সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে, যেন প্রাণহীন এক রূপপিণ্ড। মেনকার শক্তি কী, ঋষিকে সে পদভ্রষ্ট করে! ঝটিকা যত প্রচণ্ডই হক, অচল হিমাচলকে বিচলিত করে—কার সাধ্য!

নর হোক, নারী হোক—স্থায়ী রতিভাব সকল হৃদয়েই বর্তমান। কিন্তু উদ্বোধনের কারণ না ঘটলে, রতি কখনও স্বয়ংক্রিয় হয় না। কাষ্ঠ আহিতাগ্নি ;

কিন্তু কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ না হলে সে অগ্নি প্রকাশিত হয় না। তিমির গর্ভে নিষ্প্রভ সূর্যকান্তমণি। সৌরকর স্পর্শেই তার দীপ্তির প্রকাশ। বিশ্বলোকে দর্পক মদন সেই রতি-ভাবের উদ্বোধক। মদন আছে, তাই পুরুষের প্রকৃতি-সম্ভোগেচ্ছা, মদন আছে, তাই নারীর প্রতি নরের সানুরাগ আকর্ষণ ও সংসর্গ। প্রজাপতি হয়ে মদন পুংকেশরের পরাগ মাখিয়ে দেয় গর্ভকেশরে। তাই সুন্দর হয়ে ফোটে সৃষ্টির ফুল।

মদন যদি না থাকত—ভাবল মদন, ব্যর্থ হত প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির কামনা। অকাম হত নর, অকামাহত নারী—ব্যর্থ হয়ে যেত নারীর হাব-ভাব, বিলাস-কটাক্ষ। ওই তো বিশ্বামিত্র, ওই তো বিশ্বমোহিনী মেনকা। ধ্যানমগ্ন ঋষি, ক্রীড়া-চঞ্চলা নারী। কত তার কৌশল! নূপুরে শিঞ্জন, কঙ্কণে ঝঙ্কার, কিন্তু মৌন, নির্বিকার তাপস। এত চেষ্টা করেও মোহিনী তো পারে নি মৌনীর মৌন ভঙ্গ করতে।

বিদ্রূপহাস্যে মুখর হয় দর্পক। নীরস তরু কি মঞ্জরিত হয় কখনও? মদনহীন সৃষ্টি অনুর্বর মরুভূমি। আত্মদর্পে উল্লসিত হয়ে সে অগ্রসর হয় অলক্ষ্যে। অলক্ষ্যচারীই সে—তাকে কেউ দেখতে পায় না। চক্ষুর অন্তরালে গুপ্ত শায়কের মত গোপন তার সঞ্চরণ, অনিরুদ্ধ তার গতি।

তখন প্রভাতকাল। এদিকে তপোমগ্ন মৌনী তাপস, ওদিকে স্বাধ্যায়ঘোষ-মুখর ঋষির আশ্রম; এদিকে নিবিড় নীরবতা, ওদিকে মধুর ঝঙ্কার। দূর থেকে ভেসে আসছে পদক্রমে উচ্চারিত মধুর গীতধ্বনি। হয়তো ঋষি বিশ্বামিত্রেরই শিষ্য তারা। গুরুর অন্তরে ব্রহ্ম-ধ্যানের একতানতা যেন মধুর লয়ে ঝঙ্কৃত হচ্ছে শিষ্যদের কণ্ঠে:

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

নিরাকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের স্তুতি। তিনি আকারহীন, অপাণিপাদ—তবু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন; তিনি অচক্ষু, অকর্ণ—তবু তিনি দর্শন করেন, শ্রবণ করেন। বিস্ময়ের বিস্ময় তিনি, তাঁকে কেউ জানে না—কিন্তু তিনি সকলকেই জানেন।

কী মধুর সঙ্গীত, কী সুমিষ্ট কণ্ঠ, কী উদার রহস্যঘন ভাব! কিন্তু মুহূর্তে ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠে দর্পক। এ কী ব্রহ্মের স্তুতি, না তারই প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ! সে-ও দেহহীন, অপাণিপাদ। তাকে কেউ দেখে না, কিন্তু সে সব

দেখে—সব শোনে। তাকে লক্ষ্য করেই কি—! ক্রোধ উদ্দাম হয়ে ওঠে অন্তরে। দর্পান্ধের ক্রোধ, অতি ভয়ঙ্কর তার মূর্তি।

সে দেখবে, দেখাবে—অপাণিপাদ হলেও কী প্রচণ্ড তার বিক্রম! সে অচক্ষু হয়েও বিশ্বচক্ষু, সে অকর্ণ—কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিও তার কর্ণগোচর হয়। তার অব্যর্থ সন্ধানে বিভ্রান্ত হয় স্বর্গের দেবতা, মর্ত্যের মানুষ, পাতালের অসুরসঙ্ঘ। চতুর্দশ ভুবনে নির্বাধ তার পরাক্রম।

ভীরু বামোরু মেনকা। হতে পারে সে ভুবনমোহিনী রূপসী। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অতিবলা শক্তির নিকট সে অ-বলা। মর্ত্যে দ্বিতীয় বিধাতা বিশ্বামিত্র। হুতাশনের মত চিরদীপ্ত তাঁর ক্রোধ, সে ক্রোধাগ্নির আহুতি হয়েছে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শত সন্তান। তাই তো ভয়ে সঙ্কুচিত মেনকা। উভয়-সঙ্কট তার। একদিকে আহিতাগ্নি ঋষি, অন্যদিকে বজ্রধারী ইন্দ্র—মধ্যে ভীতা, কম্পিতা অপ্সরী।

কিন্তু নির্ভয় দর্পক। বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় বিধাতা, জ্যোতিশ্চক্রের বহির্ভাগে সপ্তর্ষিমণ্ডল তাঁর নবসৃষ্টি। তাতে দর্পকের ভয় নেই। অমিতদ্যুতি ভাস্করের তেজে যেমন নীহার বিগলিত হয়, তেমনই সে বিগলিত করবে উগ্রতপস্বীকে। ত্রিভুবনে নিরঙ্কুশ তার ক্ষমতা, সে অজেয়।

অজেয়? একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন তীক্ষ্ণ খড়্গের মত উদ্যত হয় যেন দর্পকের সম্মুখে। হৃদয়ে এ কী সভয় কম্পন! কোন্ দূর দিনের একটা স্মৃতি দুঃস্বপ্নের মত জেগে ওঠে তার মনে। ও কী! কিসের বহ্নিশিখা ওই! কল্পান্তের কালানল, কার যেন প্রদীপ্ত ক্রোধ! সুতীব্র গতি, অত্যুগ্র জ্বালা—বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসছে তারই দিকে। এ কী প্রচণ্ড দাহ! কোথায় তার দেহ? আগ্নেয়নিঃস্রাবে নিশ্চিহ্ন তার অবয়ব!

শিউরে ওঠে দর্পক। অচক্ষু দৃষ্টি মেলে তাকায় নিজের দিকে। সত্যই সে দেহহীন অনঙ্গ। দারুণ বিতৃষ্ণায় তার অন্তর পূর্ণ হয়। সে কি রাহুর মত কদর্য, কবন্ধের মত কুৎসিত?

আবার ভেসে আসে ঋষিকণ্ঠের সঙ্গীত, 'অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা'—দর্পকের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়, মধুর সঙ্গীত মনে হয় বিরক্তিকর। অসহ্য শ্লেষোক্তি। দেহহীন, সে দেহহীন। সে অনঙ্গ—অপাণিপাদ, অচক্ষু, অকর্ণ। দেহহীন একটা সত্তার পিণ্ড—কেবল অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর। সে কিম্ভূতকিমাকার কিংপুরুষ। নিজের প্রতি ঘৃণায়, ধিক্কারে পূর্ণ হয়ে ওঠে সে। সঙ্গে সঙ্গে মনের অতলে জাগে পুঞ্জিত প্রশ্ন। দেহ কি ছিল না তার? দেহ ছিল, অনিন্দ্যসুন্দর দেহ—রূপ

ছিল, ভুবনমোহন রূপ। কেন তবে সে অঙ্গহীন? আনমনা হয়ে যায় মন, আচ্ছন্ন হয়ে যায় মেনকা-বিশ্বামিত্রের কথা। দূর দিনের একটি প্রতিবিম্ব পড়ে মনের মুকুরে।

তখন কল্পান্তকাল। চতুর্দিকে অনন্ত শূন্যতা। ব্রাহ্মী নিশার গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন শূন্যতল। নিম্নে সীমাহীন অতলান্ত কারণ-সলিল। প্রচণ্ড বাত্যায় বিক্ষুব্ধ উর্মিমালা। সেই গর্জনমুখর নিঃসীম কারণজলে অধিশয়ান বিরাট পুরুষ। তাঁর দেহে তিরোহিত সমগ্র সৃষ্টি।

বিরাট পুরুষের নাভিকমলে প্রসুপ্ত বিধাতা ব্রাহ্মী নিশার অবসানে নয়ন মেলে তাকালেন। ধীরে তাঁর অন্তরে জাগল সৃষ্টির ইচ্ছা। তাঁর অভিধ্যানে ক্রমে প্রকাশিত হল রাত্রি, দিবা, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না—প্রকাশিত হল মুখ্যসর্গ স্থাবর-জঙ্গম—তির্যকস্রোতা পশু, উর্ধ্বস্রোতা দেবতাবৃন্দ, অর্বাকস্রোতা মানুষ। সুন্দর সৃষ্টি, সুন্দর তার শৃঙ্খলা।

তবুও পরিতৃপ্ত হল না পদ্মযোনি ব্রহ্মার হৃদয়। প্রজাপতি তিনি—প্রজা তো সৃষ্টি হয় নি তেমন! রাজ্য আছে প্রজা নেই, আবাস আছে আবাসিক নেই। আছে মানসপ্রজা ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ—মিথুন সৃষ্টিও হয়েছে অনেক, কিন্তু হয় নি আশানুরূপ প্রজাসৃষ্টি।

করুণাঘন কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠল কমলযোনির মানস-কমল। দেখতে দেখতে সৃষ্টি হল আরক্ত। পুষ্পসম্ভার নিয়ে প্রকাশিত হল ঋতুরাজ বসন্ত—প্রস্ফুটিত হল রক্তাশোক, শুভ্র হাসি ছড়িয়ে ফুটে উঠল নবমল্লিকা। বকুলগন্ধে আমোদিত সমীরণ; কান্তিরসের ধারায় অভিস্নাত প্রকৃতি।

সেই মুহূর্তে বিধাতার সকাম সঙ্কল্পে আর্বিভূত হল কমনীয় অথচ তেজস্বী, পূর্ণ-যৌবন মনোহর এক মনসিজ পুরুষ। অনিন্দ্যসুন্দর তার রূপ। সুপুষ্ট, সুঠাম, সুবলিত দেহ—উন্নত গ্রীবা, সুচারু নাসিকা, সুবিশাল নীলনয়ন। সে নয়নে আশ্চর্য দৃঢ়তা। কটি, উরু, জঙ্ঘা—নিটোল, নিখুঁত। রক্তাভ অঙ্গবর্ণ, আরক্ত করদ্বয় ও পদতল, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত শিশিরধৌর তক্তকমল।

রূপসজ্জাও তার রূপের অনুরূপ। চাঁচর-কেশে মীনকেতন মুকুট, অঙ্গে বসন্ত পুষ্পের পুষ্পাভরণ। রক্তাশোকের অঙ্গদ, কুরুবকের চূড়া, চম্পক কুসুমের কণ্ঠহার—চরণমঞ্জীর তার মঞ্জুল পুষ্পমঞ্জরী। দেহ-ভরা বকুল গন্ধ। হস্তে তার পুষ্পধনু। পৃষ্ঠে পুষ্পময় তূণীরে অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল-নির্মিত পঞ্চ পুষ্প-শায়ক।

মদমত্ত গজেন্দ্রের মত পদবিক্ষেপ করে, কমলনয়নে বিভ্রম বিস্তার করে, অঙ্গের বকুল গন্ধে দিঙ্মণ্ডল সুরভিত করে দর্পিতের মত সে এসে দাঁড়াল প্রজাপতি বিধাতার সম্মুখে। আশ্চর্য তার প্রভাব। সৃষ্টি-সভায় উপস্থিত ছিলেন যাঁরা—স্বর্গের দেবতা, অন্তরীক্ষের সিদ্ধ-চারণ, মর্ত্যের মানুষ, পাতালের অসুর—মুহূর্তে উন্মথিত হল তাঁদের চিত্তপ্রদেশ। 'কে এই মনোভব পুরুষ'—ভেবে বিস্মিত হলেন কিন্নর, গন্ধর্ব। অসুরের সুরার নেশা ছুটে গেল, স্বরপ্সরী নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই সুবেশধারী সুন্দর পুরুষের প্রতি। শুধু তাই নয়, সহস্র মিথুন মন্ত্রমুগ্ধের মত সানুরাগে পরস্পরের সন্নিহিত হল। সকলেরই নয়নে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

বিলসিত চরণে দর্পিতের মত বিধাতার কাছে এগিয়ে এল সে, তাকাল সুবিশাল নয়ন মেলে। কণ্ঠে মধুর ঝঙ্কার তুলে বলল, 'জানি না, কী আমার নাম —আশ্রয়ই বা কোথায়? আমার নাম ও ধাম নির্দেশ করুন।'

বিধাতা তন্ময় দৃষ্টিতে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন নিজের মনোভব সৃষ্টির প্রতি, সবিস্ময়ে ভাবছিলেন, 'অহো রূপম্ অহো রূপম্!' প্রশ্ন শুনে সম্বিৎ ফিরে এল তাঁর। নিমেষে হর্ষোদ্ভাসিত হল তাঁর বদনমণ্ডল। সিসৃক্ষু তিনি। কিন্তু ভূরি সৃজনেও পূর্ণ হয় নি তাঁর সৃষ্টি। মিথুন সৃষ্টি হয়েছে, প্রজা সৃষ্টি হয় নি। নারী ও পুরুষের পরস্পর সংসর্গে যে সৃষ্টি সম্ভব, পদ্মসম্ভব বিধাতার ঋতধ্যানে তার প্রকাশ ঘটে নি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন মানসজাত নূতন সৃষ্টির প্রতি, দেখলেন তার অপূর্ব সম্মোহন রূপ, দেখলেন তার মনোমথনকর প্রভাব, দেখলেন চতুর্দশ ভুবনের সানুরাগ চাঞ্চল্য। এই নবসৃষ্টিই নিখিল নরনারীর হৃদয়ে জাগাবে সহর্ষ সৃষ্টিকামনা, কোটি কোটি সৃষ্টির বীজ ছড়িয়ে দেবে মিথুন-সমাজে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ব্রহ্মা। সদ্যোজাত সন্তানের নাম নির্দেশ করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন উপস্থিত মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি প্রভৃতি ঋষির প্রতি।

মনস্তত্ত্ববিদ ত্রিকালদর্শী ঋষি। ধ্যানবলে তাঁরা জানলেন বিধাতার অভিপ্রায়। একে একে তাঁরা নামকরণ করলেন অনন্তযৌবন নবজাতকের। হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললেন ঋষিপ্রবর মরীচি, 'ত্রিভুবনের চিত্ত মথিত করে উৎপন্ন হয়েছ তুমি, মনোমথনকর তোমার প্রভাব। তোমার নাম হোক মন্মথ।'

ষোড়শ প্রজাপতির অন্যতম প্রজাপতি অত্রি সহর্ষে বললেন, 'ত্রিলোকের মত্ততা সম্পাদনেও তুমি অদ্বিতীয়—তাই, মদন নামেও অভিহিত হবে তুমি।'

সহাস্যে বললেন প্রজাপতি অঙ্গিরা, 'মুকুটচূড়ায় তোমার মকর প্রতীক, করে

কুসুমধনু আয়ুধ পঞ্চবাণ। তুমি মকরচূড়, কুসুমধন্বা এবং পঞ্চশর নামে ভুবন-বিখ্যাত হবে।'

এতক্ষণ নীরব ছিলেন মহর্ষি ভৃগু। তিনি বললেন, 'সর্বোপরি তুমি খ্যাতিলাভ করবে কামদেব নামে। মিথুন-সমাজে সৃষ্টির কামনায় তোমার জন্ম, তুমি মূর্তিমান কাম। পঞ্চশরে স্ত্রীপুরুষের মনে কামসঞ্চার করে তুমি সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হবে। কিন্তু অধর্মতনুজ কদর্য কাম থেকে তুমি হবে স্বতন্ত্র।'

বহু নামে অভিহিত, অভিনন্দিত হল মনোভব মদন। প্রজাপতি দক্ষ হৃষ্টচিত্তে তার হাতে সম্প্রদান করলেন স্বীয় মানসকন্যা রতিকে। সর্বাঙ্গসুন্দরী. অসিতেক্ষণা রতি। এমন পতিলাভ করে নিজেকে সে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করল।

মনোভব মদনের কিন্তু বিন্দুমাত্র বিকার লক্ষিত হল না ঋষিদের বাচনে কিংবা রতিলাভে। আননে সদর্প এক গাম্ভীর্য, অধরে স্মিত হাসি—যেন বজ্রসূচক বিদ্যুৎ। বিধাতার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বলল, 'এবার নির্দেশ করে দিন আমার আশ্রয়স্থল।'

'তোমার আশ্রয়স্থল?'—মুহূর্ত দ্বিধা না করে ঘোষণা করলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, 'চতুর্দশ ভুবনেই তোমার অবাধ অধিকার বিস্তৃত হবে। হে মন্মথ! পাতালে, মর্ত্যে, স্বর্গে তোমার গতি হবে অনিরুদ্ধ। ইচ্ছা করলে তপোলোকেও আশ্রয় নিতে পারবে তুমি, মুনি-মানসেও তোমার সঞ্চরণে বাধা থাকবে না। এমন কী সত্য-লোকেও—'

কী ভেবে একটু থামলেন বিধাতা পুরুষ। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাঁর প্রতি তাকিয়ে আছে সিদ্ধ-চারণ, তাকিয়ে আছে তপোঋদ্ধ ঋষিবৃন্দ। বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও সোৎকণ্ঠ দৃষ্টি। ব্রহ্মা বলে চললেন, 'এমন কী সত্যলোকেও—বিষ্ণুলোক কিংবা মহেশ্বর-লোকেও ক্ষুণ্ণ হবে না তোমার গতি। এই যে সৃষ্টিকর্তা আমি, যাঁর হৃদয়ে সৃষ্টির তপস্যা, বাক্যে যাঁর অস্খলিত সত্য, সেই আমাকেও সম্মোহিত করবার ক্ষমতা তোমার থাকবে।'

নীরব হলেন কমলযোনি প্রজাপতি। বিধাতার বাক্যে মদন উল্লসিত হল, শক্তির দর্পে আত্ম-অহঙ্কারও হল ভয়ঙ্কর। আলোহিত আননে মদোদ্ধত উল্লাসের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল কি না বোঝা গেল না—কেবল একটা সদাপ টঙ্কার জাগল তার পুষ্পধনুতে। সে টঙ্কারে ভুবন মোহিত হল, মিথুনসমাজ হল বিহ্বল। কোমলাঙ্গী নারী কম্পিত কলেবরে বিবশার মত আলিঙ্গন করল পুরুষকে। নিবিড় কামনার সে আলিঙ্গনে পুরুষ অবশ হল—দূরে গেল তার পৌরুষ।

মুনিমানসও চঞ্চল হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গে শিহরণ। অবশ আবেশ সঞ্চারিত হল বিশ্বলোকে।

এই মদ-বিহ্বলতায় শুধু স্থির রইলেন কমলযোনি ব্রহ্মা, জিষ্ণু বিষ্ণু আর যোগীশ্বর মহেশ্বর। বিশুদ্ধ, স্থিতধী তাঁরা। মোহাতীত অকল্প তাঁদের মানস, নিশ্চল দৃঢ়তা।

ক্ষণকালের জন্য ক্ষুণ্ণ হল মদন। ব্রহ্মার বরে সে অজেয়, অব্যর্থ তার শক্তি। ত্রিভুবন মোহিত, তাপিত, স্তম্ভিত তার ধনুর টঙ্কারে। কিন্তু অবিচলিত কেন এই ত্রিমূর্তি? অজেয় কি সৃষ্টিকর্তা? মিথ্যা কি সত্যমূর্তি বিধাতার বাক্য?—তার সকল আক্রোশ গিয়ে পড়ল পদ্মসম্ভব ব্রহ্মার উপর।

দর্পভরে সে তূণ থেকে তুলে নিল পুষ্পময় পঞ্চশর। অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা আর নীলোৎপলে নির্মিত পঞ্চশায়ক—সম্মোহনে উন্মাদনে, শোষণে, তাপনে, স্তম্ভনে যারা দ্বিতীয় রহিত। শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই—সত্য কিনা কমলযোনি ব্রহ্মার বাক্য, মদন স্মিতহাস্যে ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল সেই কুসুমশর।

পলকে প্রমাদ সৃষ্টি হল ব্রহ্মার মনে। প্রথম সম্মোহিত হলেন তিনি। মুগ্ধ হৃদয়, মুগ্ধ দৃষ্টি, অবশ সর্বাঙ্গ। পর মুহূর্তেই অনুভব করলেন অস্থির উন্মাদনা। বিঘূর্ণিত মস্তক, মনে মাদকতা, দেহে বিদ্যুৎ শিহরণ। শোষণবানে লোক-পিতামহের বক্ষ থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত বিশুষ্ক হয়ে গেল; রসনা, ওষ্ঠাধর হল শুষ্ক মরুর মত পিপাসিত। সঙ্গে সঙ্গে তাপন নামক তীরের প্রভাবে দেহে সৃষ্টি হল অসহ্য জ্বালা। সুতীব্র উত্তাপ—যেন কোটি সূর্যের দাহন। স্তম্ভন শায়কে স্তম্ভিত হলেন পদ্মসম্ভব—বিভ্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তি, লুপ্ত সত্যের তপোবল।

সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন চিরস্থিরকান্তি সর্বশুক্লা সরস্বতী। তিনি ব্রহ্মার অঙ্গজ সন্তান। হতচেতন ব্রহ্মা মুহূর্তে কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিস্মৃত হলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত কন্যা বাণীর প্রতি ধাবিত হলেন তিনি।

প্রজাপতির ভ্রান্তি দেখে উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করে উঠলেন বিষ্ণু-মহেশ্বর। নিয়মের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় দেখে মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্র করজোড়ে নিবেদন করলেন সবিনয় বচন, 'শান্ত হোন, শান্ত হোন পিতা! যতাত্মা বিকারহীন পুরুষ আপনি, আপনি কন্যাগমনে উদ্যত। এ কাজ ধর্ম-বিরুদ্ধ। আপনার মত সত্যসন্ধী পুরুষের পক্ষে এরূপ কাতর হওয়া অশোভন, বিশেষত এ কামনা অসামাজিক, সৃষ্টি-শৃঙ্খলার ব্যভিচারী।'

আত্মপুত্রদের বিনয়নম্র কুশল বচনে সম্বিৎ ফিরে পেলেন প্রজাপতি। লজ্জায় আনত হল তাঁর মস্তক। ছিঃ ছিঃ, কি করছেন তিনি!

ব্রহ্মার লজ্জা দেখে কৌতুক বোধ করলেন মহেশ্বর। তিনি উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করে উঠলেন। বিধাতা পুরুষের লজ্জা এবার পরিণত হল ক্রোধে। ললাট-ফলক হল ভ্রূকুটি-কুটিল, কণ্ঠে ধ্বনিত হল বজ্রনাদ। মদনকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি, 'দর্পিত কাম, সনাতন সৃষ্টি পত্তনের জন্য আমার সঙ্কল্প থেকে উৎপন্ন হয়েছ তুমি। প্রীতিমুগ্ধ হয়ে আমি সর্বলোকে তোমার আশ্রয় নির্দেশ করেছি, তোমাতে সঞ্চার করেছি অমোঘ শক্তি। কিন্তু আত্মদর্পে স্ফীত হয়ে তুমি কামশর নিক্ষেপ করেছ আমার প্রতি। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে।'

শঙ্কিত দেবসঙ্ঘ, কম্পিত সমগ্র সমাজ। আতঙ্কে শিউরে উঠল রতির হৃদয়। কিন্তু নির্ভীক মদন। স্থির কঠিন দৃষ্টি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল বিধাতার প্রতি।

বজ্ররবে প্রচারিত হল বিধাতার অভিশাপ, 'চন্দ্রে কলঙ্কের মত, তোমার ভুবন-মোহন সৌন্দর্যে কলঙ্ক-চিহ্নরূপে জেগে থাকবে কদর্য কামনার কুটিলতা। প্রেমের অধিদেবতারূপেই সৃষ্টি করেছিলাম তোমাকে, অধর্মজ কাম থেকে তুমি ছিলে স্বতন্ত্র। আজ থেকে অধর্ম-প্রভব কামের কলঙ্কও তোমাকে বহন করতে হবে। গুরুতল্প গমনাদি ব্যভিচারী কামনার প্রেরকরূপে সমাজে নিন্দিত, ধিকৃত হবে তুমি।'

একটু থামলেন বিধাতা পুরুষ, আননে-নয়নে রোষের অরুণিমা। নিস্তব্ধ সমগ্র সৃষ্টি। আতঙ্কে যেন চক্ষু মুদ্রিত করেছে চতুর্দশ ভুবনের জীব। ঝটিকার সূচনা হয়েছে, এবার হবে বজ্রপাত। ভয়ার্দিত সৃষ্টিতে তারই শঙ্কাকুল প্রতীক্ষা। কিন্তু অবিচলিত দর্পিত মদন। নিরাতঙ্ক তার হৃদয়, চোখে সুকঠিন দীপ্তি, উদ্ধত অপূর্ব দেহভঙ্গী।

বজ্র পতিত হল। সরোষে বললেন ব্রহ্মা, 'হে দর্পান্ধ মন্মথ, যে দর্পে আত্মহারা তুমি, যে দর্প লুপ্ত করেছে তোমার লঘুগুরু বিচারবদ্ধি, সে দর্প চূর্ণ হবে তোমার। ত্রৈলোক্য-মোহন তোমার রূপ, অঙ্গ-কান্তির গৌরবে তুমি আত্মহারা—কপর্দীর রুদ্ররোষে সেই রূপ, সেই অঙ্গ ভস্মীভূত হবে। চার্বঙ্গ, তুমি হবে অঙ্গহীন, অনঙ্গ।'

ব্রহ্মার অভিশাপে বেদনাতুর হল সৃষ্টি। মনোভাবের জন্মক্ষণে জেগেছিল

যে আনন্দ-বিহ্বলতা, তা পূর্ণ হল অশ্রু-উচ্ছ্বাসে। শোকে ভেঙে পড়ল মদনপ্রিয়া রতি। তার দুনয়নে নামল বাদলের অশ্রান্ত ধারা, কণ্ঠে ধ্বনিত হল করুণ উতরোল। রতি-বিলাপের মূর্ছনায় মূর্ছিত হল জীবকুল। সতী অরুন্ধতীর নয়ন ছলছল, ম্লান সাধ্বী অনসূয়ার বদন-কমল।

দর্পিত মদন মর্মাহত হল, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল না তার দর্প। বিধাতাকে লক্ষ্য করে অকম্পিত কণ্ঠেই বলল সে, 'আমাকে অভিশাপ দেওয়া উচিত হয় নি বিধাতার। রুষ্ট হয়েছেন লোক-পিতামহ, অবশ্য কারও তুষ্টি বা রুষ্টি নিজের নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমি নিরপরাধ।'

মদনের স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হলেন ঋষিবৃন্দ, স্তব্ধ হয়ে রইলেন ঊর্ধ্বস্রোতা দেবতা-সমাজ। ব্যর্থ কামনায় বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করে উঠলেন, 'কি! নিরপরাধ!'

'নিরপরাধ বই কি?'—শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল দর্পিত কুসুমধন্বা, 'আপনার বাক্যের সত্যতা পরীক্ষার জন্যই আমি আপনার প্রতি শরাঘাত করেছি। প্রমাণ পেয়েছি, সত্য বিধাতার বাক্য, তিনি সত্যের বাঙ্মূর্তি। কিন্তু আমার এ কায আপনার ক্রোধোদ্রেক করবে—এ আমি ধারণা করতে পারি নি। পরীক্ষা দ্বারাই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র বা শিক্ষার ফলাফল নির্ণয় করা হয়। পুত্রের সাফল্যে পিতা আশীর্বাদ করেন না, অভিশাপ দেন—এ অভিজ্ঞতা হল এই প্রথম।'

নীরব হল মন্মথ, নীরব নিখিল ভুবন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে কলমুখর সৃষ্টি। চমৎকৃত হলেন বিধাতা পুরুষ, 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম'—এ বিধান তাঁরই। মানসপুত্র মদনের দৃঢ়তা দেখে তিনি তুষ্ট হলেন। কিন্তু প্রদত্ত অভিশাপ জ্যা-মুক্ত তীরের মত, একবার নিক্ষিপ্ত হলে প্রত্যাহৃত হয় না। আন্দোলিত হল চিত্তপ্রদেশ।

বিধাতার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দেখে আবার হাস্য করে উঠলেন মহাদেব। সে বিদ্রূপহাস্য মদনের শরাঘাতের মতই জ্বালাকর। একদিকে দর্পিত পুত্রের দৃঢ়তা, অন্যদিকে কপর্দীর হাস্য-কটাক্ষ। অশেষ দম্ভ মহেশ্বরের! প্রতিকার প্রয়োজন। মদনকে উদ্দেশ্য করেই বললেন বাক-চতুর ব্রহ্মা কিন্তু লক্ষ্য হলেন বিদ্রূপকারী মহেশ্বর: 'তোমার দৃঢ়তা দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি। প্রশংসনীয় তোমার দর্প। তোমার আর এক নাম হবে দর্পক। নিখিল সৃষ্টিতে সকলের দর্পনাশেই তুমি সমর্থ হবে। এমন কি, যোগদর্পে দর্পিত যে কপর্দী, তাঁরও দর্প চূর্ণ হবে তোমার হাতে। যোগীশ্বর মহেশ্বরের দর্প চূর্ণ করে জগতে তুমি কন্দর্প নামে বিখ্যাত হবে।'

বিমর্ষ হলেন মহেশ্বর, তাঁর ললাটস্থ অর্ধচন্দ্র হল দীপ্তি-ম্লান। পরিতৃপ্ত হলেন প্রজাপতি, প্রশংস দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন, গ্রীবভঙ্গাভিরাম দর্পোদ্ধত দর্পকের প্রতি। এমন ত্রৈলোক্যোন্মাদক অঙ্গ তাঁর অভিশাপে অঙ্গহীন হবে ভেবে করুণার্দ্র হল তাঁর অন্তর। শান্তকণ্ঠে তিনি সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করলেন: 'রুদ্ররোষে অঙ্গহীন হলেও ক্ষোভের কারণ নেই। হে কন্দর্প! শম্ভু তোমার দেহ হরণ করলেও বল হরণ করতে পারবেন না। ত্রিভুবনে তুমি হবে অবার্যবীর্য, অপ্রতিহত হবে তোমার বজ্রসার পুষ্পশরের লক্ষ্য। অলক্ষ্যচারী হয়ে তুমি তোমার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করবে। সৃষ্টির প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী হবে তোমার অব্যর্থ পঞ্চশরেব অধীন।'

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল অধর্মপুত্র কাম। সহসা বিধাতার দৃষ্টি পড়ল তার প্রতি। কদাকার দেহ, লালসা-কুটিল জঘন্য দৃষ্টি, বিকৃত বক্রগতি। ব্যভিচারী কামনার প্রেরক সে। শিউরে উঠলেন বিধাতা। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি এই কদর্য কুটিল কাম-কলঙ্কে অভিশপ্ত করেছেন মনোভব মন্মথকে? কাম আর প্রেমকে তিনি করেছেন একাকার।

অনুশোচনায় কাতর হলেন বিধাতা। মনসিজ মদনেব প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। শান্তস্বরে তিনি বললেন, 'তুমি দুঃখিত হয়ো না দর্পক। কামনায় ভ্রান্তচিত্ত আমি, রোষাবিষ্ট হয়ে কাম-কলঙ্কের ভার বহনের অভিশাপ দিয়েছি তোমাকে। কামের কদর্য কলঙ্কে কলঙ্কিত হলেও আমি বলছি, কামে ও প্রেমে স্বাতন্ত্র্য থাকবে। তুমি হবে প্রেমের অধিদেবতা। কামগন্ধহীন, অতীন্দ্রিয় প্রেমের সুধাপাত্র অদৃশ্য হস্তে তুমি নিখিল বিশ্বের নরনারীর অধরে তুলে ধরবে, তোমার অলক্ষ্য পদসঞ্চারে বেজে উঠবে শুদ্ধ, সত্ত্বময় সৃষ্টিব সুর। কাব্যে ও শিল্পে থাকবে তোমারই অগ্রাধিকার। হে অতনু, তনুহীন হয়েও অখিল ভুবনে তুমিই নব নব রোমাঞ্চ সৃষ্টি করবে, কল্পকলায় ছন্দিত হবে তোমার জয়গাথা। লোকে তোমাকে নমস্কার করবে এই বাক্যে—

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্তু অবার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

নীরব হলেন লোক-পিতামহ। নীরবে সভাভঙ্গ হল। দর্পিত বঙ্কিম ভঙ্গীতে রতিকে সঙ্গে নিয়ে, নীরবে বিধিনির্দিষ্ট কার্যে অগ্রসর হল দর্পক মদন। অভিশাপে বা আশীর্বাদে সমান তার মনোভাব।

বিধাতার অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি। রুদ্ররোষে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মদন। দক্ষযজ্ঞে

দেহত্যাগ করেছিলেন পতিব্রতা সতী। সতীশোকে উন্মত্ত ভৈরব মৃতা পত্নীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন ত্রিভুবন। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীর অঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল একান্নটি পীঠস্থান। তারপর আত্মভোলা যোগীশ্বর হিমালয়ের সানুদেশে কল্পান্তব্যাপী ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন। তখন তারকাসুরের প্রতাপে উপদ্রুত স্বর্গলোক। তারক-নিধনে প্রয়োজন হয়েছিল 'কুমারসম্ভব'। সতী জন্ম নিয়েছিলেন হিমরাজগৃহে কন্যা পার্বতীরূপে। তাঁর গর্ভে, মহাদেবের ঔরসে যে কুমার সম্ভব হবে তিনিই হবেন তারক-নিহন্তা। বিপন্ন ইন্দ্র বিধাতার নির্দেশে মদনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। যোগীশ্বর মহেশ্বর। তাঁর তপোভঙ্গ করতে হবে, তাকে আকৃষ্ট করতে হবে পার্বতী গৌরীর প্রতি। এই কঠিন কর্মেই ব্রতী হয়েছিল দর্পক মন্মথ। যোগীশ্বর মহাদেব যখন নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মত ছিলেন ধ্যান-নিলীন আর পুষ্পাভরণে সজ্জিতা, গৌরাঙ্গী গৌরী যখন নতজানু হয়ে প্রণাম করছিলেন সেই যোগীবরকে, তখন হিমালয়প্রস্থে অকালবসন্তের উদয় হয়েছিল, মদনের ক্রিয়া চলেছিল অলক্ষ্যে। জিতেন্দ্রিয় মহাদেব নয়ন মেলে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু তখনও বিন্দুমাত্র বিকারগ্রস্ত হয় নি তাঁর অন্তর। সহসা মদন-কৌশলে পার্বতীর কেশস্থিত কর্ণিকার ভূমিতলে স্খলিত হল। যতাত্মা মহাদেব ঈষৎ চঞ্চল হলেন, যেন চন্দ্রোদয়ে ঈষৎ চঞ্চল হল সাগরের অম্বুরাশি। হিমরাজ-কন্যার অনিন্দ্য অঙ্গলাবণ্য যেন চকিতে চমক সৃষ্টি করল বিরূপাক্ষের নয়নে। বিরক্ত হয়ে তিনি আকস্মিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয় করবার জন্য চতুর্দিকে বিস্তার করলেন তার রোষ-রক্ত নয়ন, দেখলেন, অদূরে অলক্ষ্যে রয়েছে 'চক্রীকৃতচারুচাপ' শরনিক্ষেপোদ্যত মদন। ক্রুদ্ধ হলেন রুদ্র। ললাটস্থ নেত্রে ধকধক করে জ্বলে উঠল ভীষণ বহ্নিশিখা। 'ক্রোধ সংবরণ করুন'—বলার পূর্বেই নয়ননিমেষে রুদ্রের নয়নাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেল দর্পক মন্মথ, শুধু পড়ে রইল একটি নিষ্প্রাণ ভস্মের স্তূপ।

সেই দগ্ধ ভস্মস্তূপ আবার প্রসন্নাক্ষ বিরূপাক্ষের অনুগ্রহে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু সে প্রাণময় একটা সত্তামাত্র, অনুভূতিপ্রবণ কিন্তু দেহহীন—ক্রিয়াশীল, কিন্তু অপাণিপাদ। অনঙ্গ নামের কলঙ্ক ঘোচে নি অতনুর।

স্মৃতির ছায়াছবি মুছে যায়। বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদে উদাস দৃষ্টি মেলে খানিক স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অনঙ্গ। ঋষিকণ্ঠে তখন নীরব হয়ে গেছে 'অপাণিপাদো' মন্ত্রের কলি। কিন্তু এখনও যেন ঘণ্টাধ্বনির শেষ অনুরণনের মত তার রেশ ছড়িয়ে আছে তপোবনে; এখনও যেন ঘোষণা করছে অনঙ্গ নামের কলঙ্ক। সহস্র বৃশ্চিকদংশন অনুভব করে দর্পক।

মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয় সেই দর্প, দেখা দেয় স্মিত হাস্যরেখা। হ্যাঁ, 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' স্বয়ং অনঙ্গ। তার প্রমাণ এবার দেবে সে। দৃঢ়সঙ্কল্পে প্রস্তুত হল অবার্যবীর্য দর্পক। তপোমগ্ন বিশ্বামিত্রকে লক্ষ্য করে চাপে শর যোজনা করল সে। বজ্রসার তার পুষ্পশর, অতিশয় কোমল—অতীব কঠিন।

সহসা আরক্ত হয়ে উঠল পুষ্করতীর্থের অরণ্যভূমি। মধ্য বসন্তের রক্তিমা ছড়িয়ে পড়ল স্থলে—অশোক-পাটলের বক্ষে ; ছড়িয়ে পড়ল জলে—অরবিন্দ-দল যেন বনলক্ষ্মীর অঙ্গধৌত অলক্তরাগ। সমীরিত হল বনভূমি, নিস্পন্দ অরণ্যে জাগল বিহঙ্গের সঙ্গীত স্পন্দন। অদ্ভুত প্রাণ-চেতনায় পূর্ণ হয়ে উঠল অচেতন পদার্থ।

ধ্যানমগ্ন কৌশিকের অন্তর হল চঞ্চল। ব্রহ্মধ্যানের একতানতা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর একটি সুগভীর সুরঝঙ্কারে। তাঁর নিমীলিত নয়ন ধীরে উন্মীলিত হল, যেন প্রথম প্রভাতে পাপড়ি মেলে বিকশিত হল একটি নীলপদ্ম। বিমোহিত অন্তর, বিমোহিত নয়ন। বনভূমিতে আজ প্রাণের এ কী চঞ্চল লীলা! পুষ্পিতা লতিকা আবেশে জড়িয়ে ধরেছে মহীরুহের কণ্ঠদেশ—প্রিয়তমা যেন কণ্ঠলগ্ন হয়েছে প্রেমিকের ; বিনম্রশাখ তরু আনত হয়ে যেন চুম্বন করছে দয়িত ধরণীর রোমাঞ্চিত অঙ্গ ; চূত-মঞ্জরীতে প্রণয়ের পূর্বরাগ। ভ্রমরপংক্তি, পক্ষিকুল, মৃগ-কদম্ব, চক্রবাক-মিথুন আজ বিলাস-চঞ্চল। পুষ্পে পুষ্পে মধুপের মধুর গুঞ্জন, শাখায় শাখায় পক্ষিকুলের সুমিষ্ট কাকলি। গুঞ্জনে, কূজনে, কেলিকলোচ্ছ্বাসে মুখরিত যতির তপোভূমি। শুধু তাই নয়, সম্মুখে বিশ্ব-বিমোহিনী কামিনী। অপরূপ রূপ, চারু অঙ্গে রূপের তরঙ্গ, নয়নে মোহময় আকর্ষণ। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সানুরাগ দৃষ্টি মুহূর্তে নিবদ্ধ হল মোহিনীর চারু-অঙ্গে।

সেই মুহূর্তে অনঙ্গ নিক্ষেপ করল তার উন্মাদন শর। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল ঋষির শোণিত কণায়। মদমত্তের মত সিদ্ধাসন ত্যাগ করে কম্পিত পদে তিনি অগ্রসর হলেন মোহিনী মেনকার প্রতি। তাঁর নয়নে রুদ্রের রোষারুণ নয়, অনুরাগের স্নিগ্ধ দীপ্তি।

বিজয়ী দর্পক। অন্তরে তার বিজয়ের দৃপ্ত উল্লাস, বাইরে প্রকাশিত দর্পিত স্মিত এক বক্রকুটিল হাসি। গর্জ-মুখর উর্মিমুখে শুভ্রফেনার মত ক্ষণদীপ্ত সে হাসি যেন দর্পভরে ঘোষণা করল, 'কোথায় বিশ্বামিত্র, দর্পিত রাজর্ষি? বিলুপ্ত-ধৈর্য দ্বিতীয় বিধাতা, যেন চন্দ্রোদয়ে চঞ্চল প্রশান্ত সাগর! কোথায় বিশ্বামিত্রের অর্বাচীন শিষ্যবৃন্দ? তারা দেখুক, অপাণিপাদ দর্পকের দর্পসীমা। অতনু সে, কিন্তু অপরাজেয় তার বিক্রম।'

বিজয়গৌরবে অলক্ষ্য পদবিক্ষেপ করে অগ্রসর হল অনঙ্গ দর্পক। তখন মেনকার বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হয়েছেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, যেন রাহুগ্রাসে গ্রস্ত হয়েছেন দীপ্ত দীধিতি, যেন উত্তরঙ্গ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে ধরা দিয়েছে বেলাভূমির বলয়বেষ্টনে।

দর্পকের এই দর্প আজও বিশ্বভুবনে এমনি অপরিম্লান। নিখিল নরনারীর অন্তরে অব্যর্থ তার শরসন্ধান। সত্য হয়ে আছে যেমন বিধতার আশীবাদ, তেমনি সত্য হয়ে আছে তাঁর অভিশাপ। প্রেমে ও নন্দনতত্ত্বে দর্পকের অগ্রাধিকার বিস্তৃত হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যভিচারী কামনার কলঙ্ক আজও তাকে বহন করতে হয়। সনাতন সৃষ্টিতে তির্যক কাম-কন্দর্প ধিক্কৃত হয়, নিন্দিত হয়, তবু লাঞ্ছিত বা নিষ্ক্রিয় হয় না দর্পিত দর্পক। ত্রিভুবনে অপরাজেয় তার হৃদয়-প্রমাথী বিক্রম।*

(১) কালিকা পুরাণ ১, ২, ৩

(২) রামায়ণ বালকাণ্ড ৬৩ সর্গ

# বারুণী ॥

বিশ্বব্যাপী অপরিসীম প্রভাব তার। দর্পিণী বিজয়িনী—নাম বারুণী। আলোহিত অঙ্গবর্ণ, প্রত্যঙ্গে স্ববলিত সুষমার রক্তিম দীপ্তি। পূর্ণা স্রোতস্বিনীর মত পূর্ণযৌবনা, উদ্দাম—যেন উচ্ছল তারল্যে দৃপ্ত ঔদ্ধত্য। যৌবনমদে সে মদবিহ্বলা, চঞ্চলা, স্খলিতচরণা।

পিতা তার বরুণরাজ। উরুচক্ষু ব্যোমদেবতা তিনি। অন্তরীক্ষপতি মিত্র দেবতার পরম মিত্র, সৃষ্টিলোকে একসঙ্গে উচ্চারিত 'মিত্রাবরুণ' নাম। সপ্ত-সমুদ্রেরও অধীশ্বর বরুণ। ঊর্ধ্বলোকে ও অধোলোকে সমান বিস্তৃত তাঁর বিক্রম।

বীর্যবান পিতা বরুণের ঔরসে বারুণীর জন্ম—পিতার মতই সে প্রতাপশালিনী। ব্যোমচারী অসংখ্য প্রজা তার প্রসোতা, সাগরাশ্রয়ী সংখ্যাহীন প্রাণী তার বন্দী। উদ্ধত রত্নাকর মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত তার ইঙ্গিতে মস্তক আনত করে। নিয়ত অবিন্যস্ত তার মেঘনিভ কেশকলাপ—প্রলয়কালীন মেঘের মতই মুহূর্তে ফুলে ওঠে, মুহূর্তে দোল খায়, আবার মুহূর্তে পিঙ্গল আনন আচ্ছন্ন করে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের সৃষ্টি করে। সেই ঘন-নীল কেশপাশে চপলাসদৃশ তার আনন, রক্তাক্ত লোচনের সুতীব্র শাসন। মহাসমুদ্রের সহস্র ঊর্মিশীর্ষে মদমত্ত পদবিক্ষেপ করে সদর্পে বিচরণ করে বরুণ-নন্দিনী বারুণী—যেন সসাগরা বরু-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

পিতার প্রকৃতি যেমন সন্তানে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি আত্মপ্রকাশ করে মাতার স্বভাব। বারুণীর মাতা শুক্রা। স্বামীর মতই সে বীর্যবতী, অভিমানে স্ফীতা। মোহকর তার রূপ, মোহিনী তার শক্তি। তিল তিল বিষপানে যেমন বর্ধিত হয় বিষকন্যা, জননী শুক্রার স্নেহদর্পে তেমনি লালিতা হয়েছে বারুণী। মাতার স্নেহের দুলালী, তার আদরের নাম সুরা। স্বামী পাশী বরুণ, সুরসঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মর্যাদা। জননীর সাধ, তাঁর নন্দিনীও হবে সুরভোগ্যা।

বারুণীর মনেও অহঙ্কারের শেষ নেই। তার রূপবহ্নিতে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয় জীবকুল। তার একটিমাত্র অপাঙ্গ দৃষ্টিতে গজেন্দ্র ঐরাবত মদস্রাব করে, স্বর্গতুরগ উচ্চৈঃশ্রবা হয় অস্থির। অতুলনীয় রূপ, অপ্রমেয় ঐশ্বর্য, অপরিমিত

মোহিনী শক্তি—বিশ্বে কোন্ নারী তার সমকক্ষ? তার ধারণা, ত্রিলোককে সে হেলায় পদানত করতে পারে।

দর্পিণীর এই দর্প আহত হল সেই প্রথম, যেদিন সুরাসুর অমৃতলাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হলেন সাগরমন্থনে। মন্দর-পর্বত দণ্ড, বাসুকি নাগরজ্জু। সেই রজ্জুর পুচ্ছাংশ ধরেছেন দেবতা, শীর্ষাংশ ধরেছে অসুর-দানব। পরিচালক স্বয়ং প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু। ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত বিশ্বলোক, আকর্ষণে ও ঘর্ষণে টলমল বরুণ-রাজ্য। প্রমথিত বরুণালয় থেকে একে একে উত্থিত হচ্ছে তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিল-গিল রাঘব—কত রত্ন, কত ওষধি! ক্রমে উত্থিত হলেন বিষ্ণুবল্লভা লক্ষ্মী, ইন্দ্রাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, মেঘবাহন ঐরাবত, অমূল্য রত্ন কৌস্তুভ, কামদুধা সুরভী। বিষ্ণু সেই মন্থনজাত দ্রব্য বণ্টন করে দিলেন দেবতা ও দানবদের মধ্যে। উৎকৃষ্ট যত দ্রব্য, সবই হল দেবভোগ্য। ক্ষুব্ধ আক্রোশে পূর্ণ হল অসুর-দানবের অন্তর, তবু প্রতিবাদ করল না তারা। যে দুর্লভ অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন, তা যদি হস্তগত হয়, তা হলে তুচ্ছ লক্ষ্মী, তুচ্ছ উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত। দ্বিগুণ উৎসাহে মন্থন-রজ্জু আকর্ষণ করল তারা।

এদিকে শ্রমক্লান্ত হলেন দেবতা। নিস্তেজ হলেন বজ্রী ইন্দ্র; সূর্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে এল; চোখে অন্ধকার দেখলেন দেববৈদ্য দস্র ও নাসত্য। ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। তিনি বিষ্ণুকে দেবদেহে বলাধান করতে নির্দেশ দিলেন। রসাধার সোম। বিলোড়িত সাগরজল থেকে ইতিপূর্বেই তার উদ্ভব হয়েছিল। শ্বেতশুভ্র কান্তি, স্নিগ্ধ দীপ্তি, অঙ্গে শুদ্ধ সাত্ত্বিক রসের উচ্ছল তরঙ্গ। বিষ্ণু এই সোম বণ্টন করে দিলেন দেবতা-সমাজে। সোমরস পান করে সাত্ত্বিক শক্তিতে বললাভ করলেন দেবতা।

দানব-শক্তিও এদিকে স্তিমিতপ্রায়। পর্বতের মত তাদের বিশাল দেহ থেকে ঝর্ণাধারার মত স্বেদ নির্গত হচ্ছে, ঘনশ্বাসে অগ্নির উচ্ছ্বাস। তবুও সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে শ্রান্ত দানব আবার প্রাণপণে আকর্ষণ করল মন্থনরজ্জু। প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হল মন্থন-দণ্ড মন্দর; পরিশ্রান্ত বাসুকি-নাগের মুখ হল আরক্ত। উত্তপ্ত দৃষ্টি, ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

সহসা প্রমথিত বরুণালয় থেকে উত্থিত হল প্রমাথিনী বারুণী। আলোহিত অঙ্গ-কান্তি, মদিরাক্ষরা নয়ন, ঘন-নীল কুটিল কুন্তল। পরিধানে রক্তাম্বর, কণ্ঠে পদ্মরাগ রত্নহার, কটিতটে রত্নময় মেখলা। সর্ব-শৃঙ্গার বেশাঢ্য মূর্তি।

রূপের ছটায় বিভ্রম সৃষ্টি করে চঞ্চলা তটিনীর মত এগিয়ে এল নটিনী।

চলচল কান্তি, টলমল স্খলিত গতি। মদবিহ্বল দেহ, মোহমদির বিলোল কটাক্ষ যেন চঞ্চল লোহিতসাগরে সচঞ্চল ঊর্মিদোলা।

স্তম্ভিত দেবতা ও দানব, স্তিমিত যেন কর্মশক্তি। মন্থন-রজ্জু হস্তে ধারণ করে প্রথমে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা—যেন মন্ত্রবলে ক্ষণেক স্থির হয়ে রইল অশান্ত সাগরতরঙ্গ। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিতর্ক উঠল বিমুগ্ধ দেবতা ও বিমূঢ় দানব-সমাজে।

দেবরাজ ইন্দ্র ভাবলেন, 'কে ইনি? ইনি কি দ্বিতীয় কমলা? সর্বাঙ্গ-সুলক্ষণা অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেহ, ইনি কি সর্ব-কল্যাণের আকর সর্বমঙ্গলা ষোড়শী?'

কামমোহিত দানবপ্রধান ভাবল, 'মদিরেক্ষণা, লাস্যময়ী কে এই সমুদ্রোদ্ভবা? অঙ্গে কাঞ্চন-দীপ্তি, অসম্বৃত কটিমেখলায় মদনের স্মবালাপ। ইনি কি স্বয়ং রতি, না মূর্তিমতী উদ্দীপন-শক্তি?'

বিচার-বিমূঢ় যখন সুরাসুর, তখন মদ-বিহ্বলা বারুণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল মদস্খলিত বচন—যেন মধুবৃষ্টি করল কিন্নর-কণ্ঠের অস্ফুট গান: 'বরুণকন্যা আমি বারুণী। আমি বলদায়িনী শক্তি। মাতা আমার শুক্রা। শুক্রা-তেজের বহ্নিদীপ্তি আমার দেহে। আমার স্পর্শে অসীম উদ্দীপনা।'

নির্বাক দেবতা, স্তব্ধ দানবসমাজ। বারুণী দেখল, তার রূপের বিভ্রমে সম্মোহিত সুরাসুর। রূপগর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে, অধরকোণে ফুটে উঠল সদর্প এক স্মিত হাস্যরেখা। বিশ্বমোহিনী সে—কে তার রূপে মোহিত না হয়? কিন্তু সুরা সে, সুরভোগ্যা। সুরসমাজেই সে হবে বরণীয়া। কী সুন্দর দেবতার রূপ—যেন স্বপ্নলোকের একখানি মোহময় স্বপ্ন। তারা মন্থন-ক্লান্ত, তব দেহে অপূর্ব দীপ্তি! সুন্দরকে জয় করেই তো জয়ের গৌরব! লোকে বলবে, সুরবিজয়িনী সুরা।

সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বারুণী উপস্থিত হল দেবতাদের সম্মুখে। নূপুরে শিঞ্জন, কাঞ্চিতে ক্বণন তুলে—কটাক্ষে মদিরাবেশ মাখিয়ে গদগদভাবে বলল রূপ-গর্বিতা, 'বল দেবসঙ্ঘে কোন্ দেবতা গ্রহণ করবে আমায়? সুরপ্রধান বরুণের ঔরসে দেবগোত্রে আমার জন্ম। আমার আর এক নাম সুরা। লক্ষ্মীর চেয়েও আমি রূপবতী, শক্তি-সঞ্চারে সোম অপেক্ষাও অধিক যোগ্যতা আমার।'

বারুণী-বাক্যে চঞ্চল হলেন ইন্দ্র, চঞ্চল বিশ্বদেব-মরুদ্গণ, দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের অন্তরে অশান্ত উন্মাদনা। স্বয়মাগত সুদুর্লভ সামগ্রী, মধুর চেয়েও মধুমত্তর, বুঝি অমৃতের চেয়েও স্বাদু। সোমপায়ী দেববৃন্দের নিকট তুচ্ছ মনে

হল শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্দীপক সোমরসের আস্বাদন। কোথায় শুভ্রকান্তি স্নিগ্ধ সোম, আর কোথায় এই অরুণ-দীপ্ত সুরা! কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু। মন্থনজাত দ্রব্যের বণ্টনকারী তিনি। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবার অধিকার নেই তাঁদের। তাই পিপাসু দৃষ্টি মেলে তাঁরা একবার তাকালেন মনোমোহিনী বারুণীর প্রতি, আরবার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন বিষ্ণুর দিকে। কেবল আদেশের অপেক্ষা।

মায়াধীশ বিষ্ণু। তিনি বুঝলেন বারুণীর মায়া। গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেলে তিনি দেখে নিলেন তার স্বরূপ। পুষ্পদ্রব তরল কান্তির নির্যাস তার লাবণ্য—অঙ্গে তারল্য-তরঙ্গ। অতি উপভোগ্য এই কান্তিরস। বলসঞ্চারে অদ্ভুত ক্ষমতা। কিন্তু সর্বনাশা এই লোহিতাঙ্গী। কল্পান্তের রঞ্জিত সন্ধ্যাভ্র—নয়নমোহন, কিন্তু প্রলয়সূচক। সংজ্ঞানাশ করে সেবকের সর্বনাশ করে সে। সোমপায়ী দেবতাদের সাবধান করে তাই সংকেতে জানিয়ে দিলেন বিষ্ণু, 'বৈরি-মিত্র বিষকন্যা এই বারুণী বৈরিপক্ষেরই বলাধান করুক, তোমরা ওকে প্রত্যাখ্যান কর।'

বিষ্ণুর ইঙ্গিতে দেবতাগণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন—নির্বাপিত যেন উৎসাহ-দীপ। দেবতাদের নিরুৎসাহ মুহূর্তে বারুণীকে চঞ্চল করে তুলল। ব্যর্থ তার রূপ? নয়নপাতে সে দেখে নিল অঙ্গসজ্জা, তারপর অপাঙ্গে দেব-অঙ্গে বিলোল কটাক্ষ বিস্তার করে, নয়নাভিরাম গ্রীবাভঙ্গী করে আবার বলল দর্পিতা অনঙ্গমোহিনী, 'সুরমণ্ডলে সমুদ্ভূতা আমি সুরা, সুরগম্যা। সুর-লক্ষ্মীর মতই আমার ঐশ্বর্য, সনাতনী শক্তির মতই আমার শক্তি। বল, কোন্ দেবতা গ্রহণ করবে আমায়?'

আবার বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল দেবতাদের অঙ্গে। কিন্তু অপ্রমত্ত রইলেন জিষ্ণু-বিষ্ণু।

তিনি বাক্‌চতুর। সুর ও সুরা উভয়কেই লক্ষ্য করে বললেন তিনি, 'সোমপায়ী দেবতা সোমরস পান করেই শক্তি সঞ্চয় করে, বারুণীতে তারা নিস্পৃহ।'

'আমি শুধু বারুণী নই, আমি সুরসম্ভব সুরা—সুরভোগ্যা।'

'সুরসম্ভবা হলেও রাজসিক তোমার প্রকৃতি, তামসিক তোমার আচরণ। দেবতার ভোগ্যা তুমি নও।'

আঘাতে আরক্ত হল রক্তমুখী। আজন্ম স্বেচ্ছাচারিণীর ইচ্ছায় এই প্রথম বাধা। পুঞ্জিত হল মদোদ্ধত অভিমান। পরুষদীপ্ত কণ্ঠে বলল সে, 'তা হলে কার ভোগ্যা সুরা?'

অসুরদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে শান্তকণ্ঠে বললেন অন্তর্যামী বিষ্ণু, 'ওগো সুরা, ভুবনমোহন তোমার রূপ—প্রচণ্ড তোমার বলদায়িনী শক্তি। তোমার শক্তি অসুরদেহে বলাধান করুক। ক্লান্ত দৈত্য-দানবও তোমার রূপমুগ্ধ, তাদের ভোগ্যা হও তুমি।'

অপমানে আহতা ফণিনীর মত ফণা তুলে দাঁড়াল বারুণী। তার সঙ্কল্প প্রতিহত হতে পারে, এ কল্পনাও কোনদিন করে নি মদোদ্ধতা। গর্জন করে উঠল দর্পিতার অহঙ্কার, 'এত স্পর্ধা! সুরসম্ভবা, সুরগম্যা সুরা আমি। আমাকে প্রত্যাখ্যান!'

প্রলয়কালের দুর্নিমিত্ত সূচিত হল তার চোখে-মুখে। আলোহিত আননে পিঙ্গল মেঘদ্যুতি, রক্তাক্ত স্তব্ধ লোচনে মদঘূর্ণিত বিদ্যুৎ-কটাক্ষ, প্রমুক্ত কেশপাশে সহস্র শকুনের মত্ততা। কল্পান্তের ভূকম্পন দেখা দিল অঙ্গে, স্খলিত চরণে মুহুর্মুহু স্খলন। দেবতা কি এতই শক্তিশালী? সে কি নিতান্তই শক্তিহীনা? দৃঢ়সঙ্কল্পে মন স্থির করে অগ্রসর হল প্রলয়-ঝটিকা। যেমন করেই হোক, এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে সে। সে জানে, দেবতার চিরশত্রু দানব, অনাদিকাল থেকে সুরবিরোধী অসুর। তাদের প্ররোচিত করে সে চূর্ণ করবে দেবতার অহঙ্কার।

ক্লান্ত বাসুকির বিষাক্ত ফণামুখে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিত দানবদল, দাঁড়িয়ে আছে শক্তিপ্রমত্ত অসুর—যেন উদ্যত বজ্রমুখে উদ্ধত মস্তক তুলে স্থির দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান মদ। বারুণীর রূপে তারা সম্মোহিত। এই মুগ্ধতাকে কোটিগুণ বর্ধিত করে, আলোল কটাক্ষে শিহরণ জাগিয়ে বলল মোহিনী বরুণ-নন্দিনী, 'অসুর, দানব, তোমরা শোন। অমিত শক্তিধর পাশী বরুণের কন্যা আমি বারুণী। জননী শুক্রার বহ্নি-দীপ্তি আমার সর্বাঙ্গে। আমি শক্তি-সঞ্চারিণী সুরা। স্বেচ্ছায় বরণ করছি তোমাদের, আমাকে গ্রহণ কর।'

ব্যাকুল হৃদয়ে এই বাক্যেরই প্রতীক্ষা করছিল অসুর ও দানব। এতক্ষণ অশান্ত ক্রোধভরে তারা প্রত্যক্ষ করছিল বিষ্ণুর আচরণ। চিরকালের চক্রী চক্রধারী বিষ্ণু। সমুদ্রমন্থনে যত উত্তম দ্রব্য উত্থিত হয়েছে—বিষ্ণুর নির্দেশে সবই অধিকার করেছে দেবতা। সদ্য-সমুত্থিতা এই মোহিনী রূপসী—এ থেকেও যদি বঞ্চিত হয় তারা, তা হলে বিপর্যয় ঘটবে এই ক্ষীরোদসাগরের কূলে, প্রলয় সৃষ্টি হবে প্রমদার তরে। আশ্চর্য-সুন্দর এই বামোরু নিতম্বিনী। এর রক্তিম আননে সদ্য-প্রস্ফুটিত অরবিন্দের দীপ্তি, মদবিহ্বল নয়নে ইন্দীবরের নীলিমা, স্খলিত চরণতলে স্থল-পঙ্কজের শোভা। এর হাস্যে সৌন্দর্যের লহরী, লাস্যে মদনোৎসব।

কাম-মোহিত দানবরাজ মন্ত্রমুগ্ধের মত নতজানু হল বারুণীর চরণতলে, কামার্ত অসুর আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত করজোড়ে দাঁড়াল বারুণীর সম্মুখে। উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠল দৈত্যসঙ্ঘ। অসুরপুরীতে হল সুরার অভিষেক।

সেই থেকে বারুণী অসুর, দানব ও দৈত্যকুলের ভোগ্যা। সে একবীরা নয়, বহুবীরা। বারুণী-সম্ভোগে অমিত শক্তিধর দৈত্য-দানব। তারা মদোদ্ধত, অভিমানে স্ফীত, অহঙ্কারে উন্মত্ত। বারুণীর বহ্নিজ্বালা তাদের সর্বাঙ্গে, তাই সতত উত্তপ্ত, চঞ্চল, মোহান্ধ। তাদের উন্মত্ততায় পর্যাকুল দেবসঙ্ঘ। সুরাসুর-সংগ্রামে ইন্ধন ও অরণি—দুই-ই সুরা বারুণী।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত হয় নি দর্পিণী বরুণকন্যা। অসুরভোগ্যা হলেও সে সুর-প্রত্যাখ্যাতা—এ অপমান শেলের মত তার অন্তর বিদ্ধ করে। স্বর্গের দেবতাকে সে পদভ্রষ্ট করতে চায়, পারে না। স্বর্গের সীমানায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। সে ধিকৃত হয়, ব্যর্থ হয় তার চেষ্টা—তবু অন্তরে অনির্বাণ জেগে থাকে সুর-সম্ভোগের কামনা।

বহুদিন পর উপস্থিত হল সুযোগ। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এসেছিল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট। সুরার প্রবোচনায় সুরাসক্ত দানব নিহত করল সেই সুন্দর ব্রাহ্মণসন্তানকে। রক্তজবার মত কচের দেহরক্ত, উগ্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে পৈশাচিক উল্লাসে তাকিয়ে দেখল বারুণী। ওই রক্তই না তারও দেহে। তবু সে সুরলোক-ভ্রষ্টা।

পিশাচীর মন্ত্রণায় স্থির হল, কচের অস্থিচূর্ণ দিয়ে গুরুর তর্পণ করবে দানব। কচের চূর্ণাস্থিরূপ আহার্য পরিবেষণের ভার গ্রহণ করবে স্বয়ং বারুণী। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, দেব-অংশে তাঁর জন্ম। তপোবলে তিনি সঞ্জীবনী বিদ্যার অধিকারী। সুরার কামনা—সুরাংশে জাত এই ঋষিকে মোহিত করে সে পূর্ণ করবে সুর-সম্ভোগের অতৃপ্ত বাসনা।

নিমন্ত্রিত হয়ে দৈত্যপুরীতে পদার্পণ করলেন দৈত্যাচার্য ভার্গব। উৎসব-প্রমত্ত দানবপুরী। চতুর্দিকে মোহময়ী সুরার প্রভাব। মদমত্ত হাসি, মদোন্মত্ত গর্জন, স্খলিত বচনের হুঙ্কার—যেন দানবগৃহে আজ তাল-বেতালের তাণ্ডব। আলোক-সজ্জায় সজ্জিত প্রমোদ-ভবন, সহস্র দীপের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল মণি-মাণিক্যখচিত কক্ষ। বিস্মিত শুক্রাচার্য। শিষ্য ময়দানবের অদ্ভুত এ কীর্তি বিশ্ব-কর্মার কারু-শিল্পকে লজ্জা দেয়। শিষ্য-গর্বে গর্বিত দৈত্যগুরু—নয়নে তাঁর কল্পনার স্বপ্ন। ইন্দ্রপুরীর কি এত ঐশ্বর্য ? নন্দনকাননে কোথায় এত আনন্দ ?

মোহিনীর বেশে বারুণী এসে উপস্থিত হল প্রমোদকক্ষে, প্রণতা হল শুক্রর চরণে স্পর্শে চমকে উঠলেন মহর্ষি শুক্রাচার্য। কল্পলোক থেকে তাঁর দৃষ্টি নেমে এল নীচে, স্থিরবদ্ধ হল কামিনীর কমনীয় অঙ্গে। কী অপরূপ রূপ! আলোহিত অঙ্গকান্তি, রূপের তরঙ্গে উচ্ছলিত অঙ্গ। পরিধানে রক্তাম্বর, বিস্রস্ত ঘন-নীল কুটিল কুন্তল—যেন ইন্দ্রকান্তমণিতে ঠিকরে পড়েছে মরকতদ্যুতি। কটাক্ষে মোহময় মদিরাবেশ, অধরে রহস্যময় হাসি। সদ্য-প্রস্ফুটিত যেন বিশ্বকামনার রক্তকমল।

মুগ্ধ হয়ে যান শুক্রাচার্য উশনা। ইন্দ্রজালনিপুণা ভানুমতী বারুণীকে চেনেন তিনি। অসীম তার শক্তি, অশেষ তার দর্প। তবুও কী দীপ্তি ওই ফুল্ল আননে, কী অনমনীয় দৃঢ়তা ওই তরল কটাক্ষে! মরালের মত উন্নত গ্রীবাভঙ্গি, মদমত্তা করিণীর মত দৃপ্ত পদক্ষেপ। কবি তিনি, 'কবীনাম্ উশনা কবিঃ'—তিনি সুন্দরের উপাসক। সুন্দর কি কেবল নারীর নমনীয়তা? সুন্দর কি কেবল কোমলাঙ্গের কমনীয় মাধুরী? এই যে রুদ্র কাঠিন্য, এই যে সন্নত ভীমকান্তি—এ কি সুন্দর নয়?—সুন্দর, সুন্দর! কবির শিল্পদৃষ্টি খুলে যায়, বিশ্বমাধুরীর সৌন্দর্য ছড়িয়ে তাঁর নয়নে জাগে করালীর রুদ্ররূপ। ঢলঢল আসবমত্তা মনোমোহিনী! সে রূপের তুলনা কোথায়?

স্থূল সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়, ভয়ঙ্করের ভয়াল মূর্তি সকল মনেই ত্রাসের সঞ্চার করে। কিন্তু অন্ধকারে সৌন্দর্য দেখেন কে? উদ্যতফণা বিষধর সর্পে পরম-পদের চিহ্ন কার আবিষ্কার? সে আবিষ্কার শিল্পীর। কবি সেই শিল্পী। তাঁর অন্তরে রুদ্রের শিবময় দক্ষিণমুখের অনুধ্যান। বারুণীকে যেন নূতন করে আবিষ্কার করলেন কবিপুত্র উশনা। রূপরাগে অনুরাগের রক্তিম ছটা, ক্রমে তীব্র আকর্ষণ। মুগ্ধ কবি চকিতে স্পর্শ করলেন বারুণীর অঙ্গ।

স্পর্শমাত্র চিত্ত বিক্ষিপ্ত হল, মস্তিষ্কে ভীষণ উত্তেজনা, সর্বদেহময় প্রদাহ। উগ্রতেজা ঋষি অন্তরে অনুভব করলেন বিচিত্র মদন-বিহ্বলতা—যেন চন্দ্রস্পর্শে উচ্ছ্বসিত সাগরাম্বু।

অর্ধমূর্ছিত চেতনা, মদিরা-বিহ্বল আঁখিতে তন্দ্রার ঘোর। স্বপ্ন দেখছেন যেন কবি-পুত্র উশনা: সুরাসঙ্গে দেহময় পুলক শিহরণ, জাগ্রত দীপ্ত কুণ্ডলিনী, কোটি সূর্যের মত সমুজ্জ্বল, কোটি চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ। কী আশ্চর্য দীপ্তি! যেন সমুল্লসিত বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎবেগে সেই কুণ্ডলিনী-সহায়ে তিনি ঊর্ধ্বে উঠছেন, নিমেষে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নিম্নস্থ ভূলোক। ওই বরুণালয়, ওই অগ্নিময় কামভবন, এই অনাহত নাদলোক।

পলকে নিরালম্ব শূন্যলোকে উপস্থিত হলেন তিনি। নিঃসীম নীলা। শব্দতরঙ্গ যেন বিপুল কম্পনে আত্মহারা। ওই যে জ্যোতিশ্চক্রের সীমা ছাড়িয়ে তপোলোক। কী অতল প্রশান্তি! লুপ্ত বুদ্ধি, লুপ্ত অহঙ্কার, লুপ্ত প্রাকৃত প্রকৃতি, শুদ্ধ একটি চেতনার উল্লাস। এই যে পরম শিবধাম—অমেয় প্রশান্তি, প্রশান্ত বসন্তোল্লাস। গুচ্ছে গুচ্ছে প্রস্ফুটিত পুষ্প, পুষ্পে পুষ্পে গুঞ্জরিত মধুপ ঝঙ্কার। দিব্য গন্ধে আমোদিত দিঙ্‌মণ্ডল। সহস্র গন্ধর্ব, কিন্নর দাঁড়িয়ে আছে করজোড়ে। পুলক-বিস্ময়ে দেখলেন ঋষি, সহস্রার কমলের কর্ণিকাবিন্দুতে মনোময় স্বর্ণপর্যঙ্কে শিবসমালিঙ্গিতা উল্লাসময়ী পরানাদ। কী মধুর কেলি-কাকলি! অবারিত যেন মধুর উৎস। সহস্রার কমলে ক্ষরিত কোটি লাক্ষারসের সমারুণ সামরস্যধারা। সেই ধারায় অভিস্নাত দেহ, রোমাঞ্চিত অঙ্গ, পরমানন্দে আচ্ছন্ন চৈতন্য। আবেশে নয়ন মুদ্রিত হল দৈত্যগুরুর।

সেই স্বপ্ন-বিহ্বলতার সুযোগে মোহিনী বারুণী শুক্রাচার্যের মুখে তুলে দিল কচের অস্থিচূর্ণমিশ্রিত আহার্য। সুরাসঙ্গে অপূর্ব স্বাদু সে ভোজ্যদ্রব্য।

কিন্তু ভার্গবের এ মোহমুগ্ধতা মুহূর্তের মাত্র। সত্যদ্রষ্টা ঋষি উশনা—শম, দম, তপস্যাই তাঁর আচরণীয়। বারুণীতে বিহ্বল হওয়া সংশিতব্রত ভার্গবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ধ্যানবলে সেইক্ষণেই বুঝতে পারলেন তিনি, মুহূর্তের বিভ্রান্তিতে ভয়ঙ্কর অঘটন ঘটে গেছে। মোহমুগ্ধ হয়ে তিনি পানীয়ের সঙ্গে পান করেছেন প্রিয়শিষ্য কচের অস্থিচূর্ণ, ব্রহ্মপাতকের ভাগী হয়েছেন তিনি।

এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে কে? ক্ষুব্ধ দৃষ্টি মেলে তাকালেন ভার্গব। সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে নিকৃতি-নিপুণা, প্রমাথিনী বারুণী। রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রূপসী—তীব্র তার আকর্ষণ, জ্বালাময় তার স্পর্শ, উন্মাদক তার আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গনে রক্তকণায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নৃত্য করে, চুম্বনে ওষ্ঠাধর, রসনা, কণ্ঠ, বক্ষ জ্বলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জাগে দুর্দম দম্ভ। কামতরঙ্গও উদ্বেল হয় সেই মুহূর্তে—কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিচারহীন সে কামবেগ। সুতীব্র আবেগের পরিণাম প্রচণ্ড আত্মবিস্মরণ। উল্লাস না উদ্‌ভ্রান্তি, আনন্দ না বেদনা, আরাম না অস্বস্তি—এ বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তরে উদ্বেগ, মস্তিকে উল্লোল—শতধাখণ্ডিত চিন্তার সূত্র। সূত্রহীন সংলাপ প্রলাপে পরিণত হয়। স্খলিত বচনে কখনও প্রমত্ত হুঙ্কার, কখনও গদগদভাব। স্মৃতি ও বিস্মৃতির সে এক মোহকর অবস্থা। মহাভয়ঙ্করী এই লোহিতবর্ণা বারুণী, সংজ্ঞানাশে নিপুণ তার নিকৃতি।

উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন উগ্রতেজা ভার্গব। দর্পিণী বরুণ-নন্দিনীকে

লক্ষ্য করে তিনি উচ্চারণ করলেন অভিশাপ-বাণী : 'সুরা হয়েও আত্মদর্পে তুমি হয়েছ সুরপরিত্যক্তা! তাতেও দর্প চূর্ণ হয় নি তোমার। অসুর দানবের ভোগ্যা হয়েও সম্ভোগ-কামনায় তুমি অস্থির। তোমার কদর্য লালসাবিস্তার দেবধর্মী ঋষিব্রাহ্মণের' ওপর। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে যে-কোন ব্রাহ্মণের পরিত্যাজ্যা হবে তুমি। যতাত্মা ব্রাহ্মণ ঘৃণায় তোমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে। হে দর্পিতা, অশেষ দর্পও চূর্ণ হবে তোমার। ধৃতব্রত বীর সাধকের হস্তে নিঃশেষে খর্ব হবে তোমার দর্প।'

নীরব হলেন ভূরিতেজা ভার্গব—যেন নীরব হল কল্পান্তের বজ্রনির্ঘোষ। স্পর্ধিতা বারুণী মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হল, কিন্তু ভেঙে পড়ল না। প্রাংশু শাল বজ্রে বিদীর্ণ হয়, তবু নমিত হয় না। বরুণনন্দিনী সে বারুণী, জননী শুক্রার বহ্নিদীপ্তি তার দেহে ও মনে। তার দর্প খর্ব করে কার সাধ্য ?

বিস্মিত হয়ে যান মহাতেজা শুক্রাচার্য। যাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত বজ্রী ইন্দ্র, তাঁরই হুতাশনসম ক্রোধের মুখে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিণী। এ কী অনমনীয় দর্প! এ কী কঠিন তেজ! তার বাগ্‌বজ্র যেন তাঁকেই প্রত্যাঘাত করে।

কবির কল্পনায় কোমল আলোচন, সমবেদনায় সিক্ত অন্তর। ক্রোধশান্ত ভার্গব ভাবেন, বারুণী তো কেবল মদান্ধতাই সৃষ্টি করে না, কান্তি ও পুষ্টি বর্ধন করে। বিষের সূচিকাভরণের মত বহু বিষবীজ বিনষ্ট করে সে। দুঃখের আঁধার-ঘরে স্ফূর্তির দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখে বারুণী; কত ক্লান্তি, কত শোকের কালিমা মুহূর্তে মুছিয়ে দেয়, ক্লান্তিহরা, শোকহরা সুরা। সুরা নিজে সুরলোকভ্রষ্টা, কিন্তু এ মরলোকে সুরাই অমরলোকের সুধা বর্ষণ করে। নিজেই অনুভব করেছেন কবি উশনা, সুরাসঙ্গে দীপ্ত কুণ্ডলিনীর কী সে সুখকর জাগরণ!

নরম হয়ে আসে ঋষির অন্তর। ঋষি বজ্র-কঠিন কিন্তু কুসুম-কোমলতাও তাঁদেরই। করুণাঘন কবি গভীর অনুকম্পায় সুরাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'সুরা, তোমার মদান্ধতায় ক্রুদ্ধ হয়েই আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি, কিন্তু তুষ্ট হয়েছি তোমার দৃঢ়তা দেখে। অশেষ তোমার রূপ-দর্প, প্রবল তোমার ভোগবাসনা। প্রজাপতির সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষায় তোমারও প্রয়োজন আছে। তোমার ভোগ-কামনা ক্ষুণ্ণ হবে না। দানব ও অসুর-রাজ্যে তুমি বহুভোগ্যা, মর্ত্যলোকেও অক্ষুণ্ণ থাকবে তোমার অধিকার। ধৃতব্রত ব্রাহ্মণের ওপর তোমার অধিকার থাকবে না বটে, কিন্তু দানবধর্মী মানুষ হবে তোমার ইঙ্গিতের দাস। ইহলোকে যারা কামাসক্ত, মৃগয়াসক্ত ও অক্ষক্রীড়ামত্ত—তাদের হৃদয়ে অবাধে

বিচরণ করতে পারবে তুমি। অহঙ্কারী যারা, দাম্ভিক যারা, অজিতেন্দ্রিয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যারা—তাদের গৃহে তুমি হবে একেশ্বরী। কিন্তু—'

বলতে বলতে উদাস হয়ে যান ঋষি। প্রমোদকক্ষে শান্ত হয়ে গেছে মদমত্ত উল্লাস, নীরব হয়েছে স্খলিত বচনের হুঙ্কার। উজ্জ্বল দীপাবলী মনে হচ্ছে যেন বড় স্নিগ্ধ। ত্রিযামার শেষ যামের সমীরণ শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে অশান্ত, দর্পোদ্ধত দেহে। করুণায় রুদ্ধ হয়ে আসে ঋষির কণ্ঠ, তিনি বলেন, 'কিন্তু, এ দর্প কি ভাল, ভাল কি উগ্র ভোগ-কামনা? সুরা, তুমি সুরনন্দিনী, সুর্য-মণ্ডলে তোমার জন্ম, দেহে তোমার সৌর-দীপ্তি, নয়নে সুর্য-প্রভা—কিন্তু তুমি সুর-পরিত্যক্তা। ইতরভোগে অশুচি তোমার দেহ, তামসিকতায় অপবিত্র তুমি।'

ক্ষণেকের জন্য নীরব হন কবি উশনা, নয়নে স্নিগ্ধ কোমলতা, বদনে জ্যোতির্ময় প্রভা। কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দর্পিতা বারুণী। তেমনি উদ্ধত ভঙ্গি, তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি—যেন রাত্রিশেষের দীপ্ত শুক্র-তারকা—তমোময় নিশান্তের প্রদীপ্ত ঔদ্ধত্য। নয়নে কি তাব পূর্বাশাব স্বপ্ন? করুণায় বিগলিত কণ্ঠে বলেন সত্যের বাঙ্‌মূর্তি কবি, 'আমার আশীর্বাদে শাপমুক্ত হতে পারবে তুমি। যে বীর্যবান বীর সাধকের হস্তে দর্প খর্ব হবে তোমার, তার বাঙ্‌মন্ত্রেই হবে শাপ-মুক্তি। অশুচি লৌকিকী সুরা তুমি, মন্ত্র-সংস্কারে হবে শুচিস্মিতা। সেদিন তুমি অমিত সাত্ত্বিক শক্তির অধিকারী হবে। তোমার স্পর্শে সাধক হবেন সুর, সার্থক হবে তোমার সুরা নাম।'

শুক্রাচায আর অপেক্ষা করলেন না। ব্রাহ্মমুহূর্তের শুভ্র জ্যোতিরেখা দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগ্বলয়ে। সুরাসঙ্গে ব্রহ্মপাতকের ভাগী হয়েছেন তিনি। তাঁকে শুদ্ধ হতে হবে, মুক্ত করতে হবে বৃহস্পতিপুত্র প্রিয়শিষ্য কচকে। দ্রুত দানবভবন থেকে বেরিয়ে এলেন ভার্গব।

তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্পর্ধিতা বরুণ-নন্দিনী। এ কি তার পরাজয়, না বিজয়ের পুরস্কার? স্তিমিতপ্রায় আলোকে চকচক করে উঠল তার রক্তাক্ত স্তব্ধ লোচন। গর্জন করে উঠল অমিত দর্প, চায় না সে স্বর্গলোক, চায় না সে ভীরু ব্রাহ্মণের স্পর্শ। পিতার শক্তিদর্প তার রক্তকণায়, মাতার বহ্নি-দীপ্তি তার দেহে। ত্রিভুবনে কে রোধ করবে তার গতি? প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত জ্বলে উঠল তার আরক্ত আনন, তারপর স্খলিত চরণে প্রমত্তা করিণীর ন্যায় অগ্রসর হল মদোদ্ধতা দর্পিতা, কামোন্মত্তা ক্রুদ্ধা কামিনী।

সেই থেকে বিশ্বলোকে শুরু হল বারুণীর প্রচণ্ড আক্রমণ। সুর-সম্ভোগের ব্যর্থ কামনায় সুরা হল রুদ্র-ভয়ঙ্করী। স্বর্গে সে প্রবেশাধিকার পায় না, কিন্তু তারই প্ররোচনায় প্রমত্ত অসুর স্বর্গলোক আক্রমণ করে, মদোন্মত্ত দানবের হিংস্রতায় শিউরে ওঠে সুরলোক। ভূগর্ভস্থ কালাগ্নি তারই ক্ষুব্ধ হৃদয়ের জ্বালা-করাল শিখা, সে শিখা সুর-সীমন্তিনীর মহাভয়। অসুর-দানবের পুরে পুরে দর্পিতা বারুণীর দৃপ্ত পদক্ষেপ। তাদের রক্তচক্ষুতে বারুণীর রক্তলোচনের রোষ-কটাক্ষ, তাদের ভীম ভ্রূকুটিতে তারই কুটিল ভ্রূকুটি, তাদের হুঙ্কার-গর্জনে বারুণীরই ক্রোধান্ধ হুঙ্কার।

মর্ত্যলোকে বারুণীর স্বাধিকার-প্রমত্ততা আরও ভয়ঙ্কর। দানবধর্মী মানুষ তার করতলগত। তাদের বিকট দাপটে তটস্থা মেদিনী। দুর্বলের ওপর শক্তের অত্যাচারে, শোষিত মানুষের প্রতি শোষকের মর্মান্তিক অবিচারে বারুণীর উৎকট উল্লাস। কামাসক্ত দ্যূতাসক্ত, মৃগয়াসক্ত নরনারী বারুণীর কটাক্ষের দাস। অজিতেন্দ্রিয় মানুষকে ব্যভিচারী কামনায় উন্মত্ত করে তোলে বারুণী, পৃথিবীব্যাপী শক্তির দ্যূতক্রীড়ায় প্ররোচনা দেয় বারুণী, মানুষ হয়ে যারা মৃগয়াসক্ত ব্যাধের মত মানুষকে আক্রমণ করে, তাদেরও প্ররোচিকা বারুণী। সে বিরোধিনী, বিশ্বের বুকে বিরাট অক্ষমা। হিংসায় ও হত্যায় সে বিজয়ের অট্টহাসি হাসে, গৃহে গৃহে জ্বালায় ধ্বংসের অগ্নিশিখা। অতি ভীষণ লেলিহ তার রসনা, পুরন্ধ্রী নারীর অশ্রু তার পানীয়। সতী নারীর সীমন্ত-সিন্দূর তার রক্তাম্বরের মঞ্জিষ্ঠা রাগ।

হিংসায় ও কুটিল কামনায় বুদ্ধিভ্রষ্টা বরুণ-নন্দিনী যেন উদ্ধত অন্ধ দম্ভ। ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যা সে—শুক্রাচার্যের অভিশাপ। অহঙ্কারে হাসে উন্মত্তা, দুর্বল ব্রাহ্মণ—সে নাকি বারুণীর প্রতিস্পর্ধী! কালান্তর মেঘে যে রক্তাক্ত বিদ্যুৎশিখা, ফেনিল উর্মিমুখে যার দর্পোল্লাস—তার প্রতিস্পর্ধী ভীরু ব্রাহ্মণ! সে চায় না, তাই মুক্তি পায় আতপান্নভোজী, শিখাধারী ব্রাহ্মণ। 'লৌকিকী সুরা সে'—বলেছেন দৈত্যাচার্য ভার্গব, অসুর-দানবের ভোগে সে নাকি অশুচি, তাকে নাকি মন্ত্রপূত করবে বীর সাধক—তার হাতেই নাকি দর্প চূর্ণ হবে বারুণীর! প্রমত্ত হাসিতে ফেটে পড়ে বারুণী, একটা সশ্লেষ বক্রোক্তি উচ্চারিত হয় মুখে। 'ভণ্ড কাপালিক! রক্ত গৈরিকের অন্তরালে তার ব্যভিচারী কুটিল কামনা। সুরাসম্ভোগের লালসায় তারা সাধু, কামিনী-ভোগের কামনায় তারা কাপালিক। বারুণীর একটিমাত্র চুম্বনে চলিতচিত্ত হয় যারা—তারা বীর! তারাই জয়

করবে বারুণীকে!' সশ্লেষ হাস্যে মুখর হয় বারুণী, দম্ভে আত্মহারা হয় দর্পিতা। সে অপরাজিতা, ত্রিভুবন তার ভোগের পাত্র। 'লৌকিকী সুরা'—মর্ত্যলোকে সে একেশ্বরী।

কিন্তু এত ভোগেও তৃপ্তি কোথায়? প্রমুক্ত স্রোতস্বতীর মত উদ্দাম ভোগ কামনা। এত বিজয়, তবু অতৃপ্ত বিজয়-নেশা—যেন মরুৎ-সংযুক্ত চণ্ড বহ্নিশিখা, চির অগ্নি-মান্দ্য তার উদরে। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। অস্থির, উন্মাদ বারুণী—অস্থির মস্তিষ্ক, অস্থির স্খলিত পদক্ষেপ। নিদ্রা নেই—বিনিদ্রা, চঞ্চল তার আরক্ত, মদঘূর্ণিত নয়ন। গভীর নিশীথে পণ্যাঙ্গনা ভবনে সে অতন্দ্র জেগে থাকে, অন্ধকারে চক্রীরূপে সে চক্রান্ত করে। রক্তাক্ত লোচনে আরক্ত দৃষ্টি, বিপযস্ত বুদ্ধি। সে কি উন্মাদ হয়ে গেল?—উন্মত্ততা নয়, মদাতঙ্ক—অতিমদের ভীষণ প্রতিক্রিয়া। সর্বদেহময় প্রদাহ, রসনায় মরুর তৃষ্ণা, কণ্ঠে অনন্ত শুষ্কতা। দুরন্ত মদাত্যয়, ঘোর বিকার। সে কখনও ক্রোধে গর্জন করে, কখনও অট্টহাসি হাসে, কখনও নীরব হয়ে থাকে। উত্তপ্ত কল্পনায় বিচ্ছিন্ন স্মৃতির মালা: কে সে? বরুণ-নন্দিনী? না, সে সুরা। কোথায় রূপকুমার অশ্বিনীকুমার? এ যে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু! কে ও? সুন্দর ব্রাহ্মণ সন্তান—কচ? শিশুর দেহে এত রক্ত! হৃদয়ে উল্লাস, নিষ্পলক বারুণীর দৃষ্টি। ওই যে মহর্ষি শুক্রাচায। কী বলছেন? এত দর্প ভাল নয়?

কঠিন হয়ে ওঠে বারুণী। সৃষ্টির মূল-কমল কামনা, মহনীয় দর্প-শ্রী। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে, অস্তগমনোন্মত স্বর্ণভানু—কী প্রচণ্ড তাঁর তেজ! বাসনার সহস্রকিরণ, সহস্রমুখে বিশ্ব-রস আহরণ করে। অম্লান তাঁর গরিমা। ওই সূর্যমণ্ডলে বারুণীর জন্ম, তারও দেহে সৌরমণ্ডলের দর্প-দীপ্তি!

সহসা সূর্য অস্তমিত হল, যেন অস্তমিত হল একটা জ্বলন্ত শক্তি-দর্প। নিজের অজ্ঞাতসারেই কেঁপে উঠল বারুণীর অন্তর। কী বললেন মার্তণ্ডদেব? —'এত দর্প ভাল নয়, অতি দর্প চূর্ণ হয়!' মহর্ষি ভার্গবের কণ্ঠস্বর যেন অন্তঃকর্ণে গর্জন করে ওঠে। মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে বারুণীর, সংযত কল্পনা যেন প্রবঞ্চনা করে তাকে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। অস্পষ্ট গোধূলি। সম্মুখে অমারজনী। সহসা বারুণী যেন শুনতে পেল একটা দূরাগত পদধ্বনি। কে যেন আসছেন, মুখে বলছেন, 'শিবোঽহম্ সুরোঽহম্'। কী গম্ভীর কণ্ঠনাদ! বিস্মিত হয়ে দেখে বারুণী—অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন—পর্বতের মত বিরাট,

বিভীষণ এক জটাধারী : বলিষ্ঠ দেহ, লৌহভীম বাহু, বিশাল বক্ষ। পরিধানে রক্তাম্বর, ললাটে রক্তপুণ্ড্র, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে কপালপাত্র।

ভয় পাচ্ছে কি ভয়ঙ্করী বারুণী? উগ্রতেজা শুক্রাচার্যকে যে পরাভূত করেছে, তার আবার ভয়? মদস্খলিত চরণ স্থির করতে চেষ্টা করে সে, মদবিহ্বল কণ্ঠকে যথাসম্ভব সংযত করে প্রশ্ন করে, 'কে?'

'শিবোঽহম্ ন চৈবান্যোঽস্মি—আমি বামাচারী কাপালিক।'—গম্ভীর কণ্ঠে বলেন কপর্দী।

অন্ধকার নেমে আসছে বারুণীর রক্তলোচনে। দিনের অমন রক্তপিণ্ডটাকে তমসার আবরণে আবৃত করে দিল কে? 'বামাচারী কাপালিক'—সোচ্চার হল কি উগ্রতেজা ভার্গবের কণ্ঠ? কি ঘোর বজ্রনাদ, কর্ণ যেন বধির হয়ে আসে বারুণীর।

জলদ-গম্ভীর স্বরে বলেন রক্তগৈরিকধারী, 'আদ্যা শক্তি চামুণ্ডা আমার উপাস্যা দেবী। আজ অমাবস্যার নিশীথে শবসাধনায় তুষ্ট করব তাঁকে। তোমাকে আমার প্রয়োজন।'

'আমাকে?'—কণ্ঠ যেন শুষ্ক হয়ে আসছে বারুণীর। বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক, ঘূর্ণিত রক্তলোচন। আতঙ্কে অর্ধস্খলিত কণ্ঠে সে বলে, 'আমাকে কেন? না, না—আমি বারুণী, দেবভোগে অধিকার নেই আমার।'

'কে বলে অধিকার নেই?'—উচ্চহাস্যে চতুর্দিক উচ্চকিত করে বজ্রস্বরে বলেন কাপালিক : 'তুমি শুধু বারুণী নও, তুমি সুরা।

দেবানামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা।
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীর্তিতা॥'

কী বলছেন বীর সাধক?—সে সুরা! ব্রহ্মলোকে যেমন অমৃত, মর্ত্যলোকে তেমনি সুরা। তাকে ভোগ করে সাধক সুরত্ব লাভ করেন। বারুণী যেন আর ভাবতে পারে না কিছু। চেতনা যেন প্রতারণা করছে তাকে। শক্তিও যেন লুপ্তপ্রায়। তবুও প্রাণপণে শেষ নিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে মোহিনী : 'আমি সুরা হলেও লৌকিকী সুরা। শুক্রশাপে পতিতা আমি, দানব-মানবের ভোগে অশুচি—সাধকের অস্পৃশ্যা।'

'অশুচিকে আমি শুচিশুদ্ধ করব'—প্রাণখোলা হাসির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বলেন বীর সাধক : 'আমার ধর্মে কেউ অশুচি নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মায়ের কোলে শুচি-অশুচি স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদ নেই, এস—'

বীরবাহু প্রসারিত করেন বীর কাপালিক। বারুণী আত্মগোপন করতে চেষ্টা

করে। পদতলে কম্পিতা ধরণী, স্থির হয়ে চলতে পারে না সে। স্খলিত গতি। সাধক মুহূর্তে দৃঢ়হস্তে ধারণ করেন তাকে। কী বলিষ্ঠ বাহু! বারুণীর শক্তি নেই বাধা দেয়, সাধ্য নেই চিৎকার করে। জাতুমন্ত্রে নির্জিত সর্পিণীর শক্তি। অমানিশার অন্ধকার তার চোখে।

কথা বলেন না কাপালিক। বারুণীর দেহটাকে একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নকের মত গ্রহণ করে কপালপাত্রে স্থাপন করেন। জল হয়ে গেছে সেই শক্তিমত্ত দেহ। অমেয় শক্তির অধীশ্বরী বরুণের নন্দিনী বারুণী, অভিমানে স্ফীতা শুক্রার কন্যা বারুণী, স্পর্ধিত দানবাসুরের রাজরাজেশ্বরী বারুণী—আজ খর্ব তার দর্প। কপালপাত্রে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ লোহিতসাগর। সম্মুখে উদ্যত রক্তপুণ্ড্ররূপ করাল খড়্গ। আতঙ্কে অর্ধমূর্ছিত চেতনা। প্রাণপণ শক্তিতে বারুণী অবশিষ্ট চেতনাটুকুকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

বীর কাপালিক বারুণীকে নিয়ে আসেন অন্ধকারঘন নির্জন শ্মশানে। মহাশ্মশান, অমা-অন্ধকারে মহাভয়ঙ্কর। অদূরে ক্রব্যাদ অগ্নির শিখা, বিকট শিবাধ্বনি। নির্ভয় কাপালিক দৃঢ় হয়ে বসেন, পূর্বনির্দিষ্ট এক শবাসনে। সুন্দরাঙ্গ শব, এখনও নিমীলিত হয় নি তার চক্ষু—হয়তো সদ্য বজ্রবিদ্ধ হয়েছে সে। নির্ভীক কাপালিক, বজ্রসার তাঁর হৃদয়, বজ্রদৃঢ় দেহ। মুখে একাক্ষরী শবমন্ত্র। ভাল বুঝতে পারে না বারুণী। অতি অস্পষ্ট মন্ত্র। অস্পষ্ট হুঙ্কার-মূর্ছনা আরও অস্পষ্ট হয়ে অর্ধচেতন বারুণীর কর্ণে ধ্বনিত হয়। বারুণী-পূর্ণ কপালপাত্র হস্তে ধারণ করে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন বীর কাপালিক :

ওঁ সূর্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাৎ প্রমুচ্যতাম্ ॥

এ কী হল বারুণীর! মুহূর্তে অদ্ভুত পরিবর্তন। অপহৃত শুক্র-শাপ। শুদ্ধ সে, শুচিশুভ্র। আলোহিত অঙ্গবর্ণ কলধৌত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল, রক্ত-আননে সূর্যমণ্ডলের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। সে যেন নির্মোকমুক্ত একটি রক্তপ্রবাল। সর্বাঙ্গে আনন্দ শিহরণ। কোথায় কামনা? নিস্তরঙ্গ কামনা-সাগর। কোথায় তার মোহিনী মায়া?—নিজেই সে মোহিতা। মূর্ছিতচেতনা যেন শুদ্ধ চৈতন্যের শুভ্র দীপ্তি—স্বল্পস্পন্দিত, বিপুল পুলকে পুলকিত। সে বারুণী নয়, সে সুরা : লৌকিক সুরা নয়, রসসার কুলামৃত।

শুদ্ধশুচি এই সুরাকে আপন দেহের কুণ্ডলিনী-মুখে অর্পণ করলেন বীর সাধক। সার্ধত্রিবলয়াকৃতি সুপ্তা কুণ্ডলিনী নিমেষে সুপ্তিভঙ্গে জাগ্রত হলেন। সূক্ষ্ম

কেশাগ্রের কোটি ভাগের এক ভাগের মত সূক্ষ্ম—অথচ আশ্চর্য কান্তিমতী। যেন সমুল্লসিত কোটি বিদ্যুৎ। যে শেষ দর্পটুকু ছিল বারুণীর তাও নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কোথায় বারুণীর রূপ-গর্ব? কোটি অরুণ-কান্তির মুখে নিষ্প্রভ সুরার দেহ-দীপ্তি। কোথায় তার শক্তির দর্প?—সূক্ষ্ম ভুজগীর অমিত শক্তির মুখে—সুরা যেন আত্মগোপন করার পথ খুঁজে পায় না।

বজ্র কুণ্ডলিনী দণ্ডের মত ঋজু হয়ে বিদ্যুতের মত সুতীব্র বেগে ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছেন। সুরা সে বেগ সহ্য করতে পারছে না। কোথায় ঊর্মিশীর্ষে বিচরণশীলা স্পর্ধিতা? শক্তি-বেগে যেন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে সে। শেষ চৈতন্যও বুঝি লুপ্ত হয়ে যায়। এ পরাজয়, চরম পরাজয়—তবু মনে হয়, এ আনন্দ, বিপুল আনন্দ। কোটি লাক্ষারসের মত দীপ্তারুণ পরমানন্দধারায় নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় দর্পিতা মদোদ্ধতা।

কিন্তু লৌকিকী সুরার এই শুদ্ধি সাময়িক—এর ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। বিশ্বলোকে বিস্তৃত দর্পিতা বারুণীর কামান্ধ শক্তি-দর্প। তার আক্রমণে অস্থির মনুষ্যলোক। দেবধর্মী মানুষকে বুদ্ধিভ্রংশ করার উৎকট লালসায় সে সুযোগ অনুসন্ধান করে। নিদারুণ বিভীষিকার মত ভুবনে ভুবনে বিচরণ করে—রক্তাম্বরা, রক্তবর্ণা, রক্তাস্তস্তব্ধ লোচনা, মদস্খলিত-চরণা বারুণী।*

১। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিপর্ব, ৪র্থ অধ্যায় ও মহাভারত—৭৬ অধ্যায়

## ॥ মহামদ ॥

পাত্র মিত্র নিয়ে সভা করে বসেছে মহামদ। 'ধন মান-মদান্বিত' মহামদ— দম্ভ, দর্প ও অতিমানিতার মূর্ত বিগ্রহ। প্রকৃতির অনুরূপ আকৃতি। মন্দর-সদৃশ মহাকায়। গাঢ় রক্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ দেহ, যেন তমোময় রজঃছটা। অতি ভয়ঙ্কর বদন—সে বদনে অগ্নিগোলকের ন্যায় অগ্নিবর্ষী দুই নয়ন। রুক্ষ, পিঙ্গল কেশ—অসহিষ্ণু রোষে কুঞ্চিত ললাট।

মহামেঘে বজ্রনির্ঘোষ—সদম্ভ হুঙ্কারে বলছে মহামদ, 'এ জগতে আমার সমকক্ষ কে? শক্তিতে, ঐশ্বর্যে ত্রিলোকে কে আমার প্রতিস্পর্দী?'

'কেউ নয়, কেউ নয়'—সমস্বরে সমর্থন করল মহামদের স্তাবকদল। যেমন রাজা, তেমনি প্রজা, তেমনি পার্ষদ। কেউ কুটিল, কেউ ক্রোধবশ, কেউ অভিমানী, কেউ মদান্ধ। হেতুবাদী সভাপণ্ডিত, কামশাস্ত্র-নিপুণ সভাকবি, স্বার্থান্বেষী সদস্য। তাদের মুখে অন্ধ স্তুতি।

প্রভুর বাক্য সমর্থন করে মন্ত্রী বলল, 'বিশ্বের বসু আপনার ভাণ্ডারে, মৃত্যুর উৎক্রান্তিদা শক্তি আপনার দেহে। ত্রৈলোক্যে আপনি অতুলনীয়।'

'হবে না? যেমন বংশ, তেমনি কীর্তি'—মন্তব্য করল সভাপণ্ডিত, 'অহঙ্কার-কুলের ধুরন্ধর মহারাজ মহামদ। মাদ্যতি মন্দতে মদঃ। কে তার প্রতিস্পর্ধী? ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় উনি।'

বাধা দিয়ে বলল বাক্‌চতুর কবি, 'উঁহু, কথাটা ঠিক হল না। শব্দালঙ্কার, আর অর্থালঙ্কারের মালাকর আমি, আমাকে বলতে দাও। দ্বিতীয় দিয়েই অদ্বিতীয়কে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অগ্নি আছে, সোম আছে, আছে সূর্য। তাদের চেয়ে অনেক, অনেক বড় মহারাজ মহামদ। অগ্নি সপ্তজিহ্ব—অমন সপ্তসপ্ততি অগ্নি মহারাজের রসনায়; চন্দ্রের মাত্র ষোড়শ কলা—চতুঃষষ্টি কলায় পরিপূর্ণ আমাদের প্রভু; সূর্য মাত্র সহস্ররশ্মি—মহারাজের কোটি কর। প্রভুর পণ্যা মদিরেক্ষণা বারুণী। পশুমতী বসুমতী স্বেচ্ছায় মহারাজের অঙ্কলক্ষ্মী।'

স্তুতিবাদে তুষ্ট হয় মহামদ। আত্ম-প্রশংসায় অতি আনন্দ দাম্ভিকের। তুষ্টিতে বিকশিত হয় কৃষ্ণবদনের সিত দন্তপংক্তি—যেন মহামেঘে করালী বিদ্যুৎ।

স্মিতহাস্যে বলে সে, 'তোমাদের উক্তি অত্যুক্তি নয়। মহামদ আমি, মহাবল। বিশ্বে অজেয়। তোমরা বোধ হয় জান সেই পুরাণ-বিশ্রুত কাহিনী, বজ্রধারী বাসবের বজ্রকেও আমি প্রতিহত করেছি।'

নিজেদের অজ্ঞতায় সঙ্কুচিত হয় স্তাবকদল, কিন্তু সে সঙ্কোচ মুহূর্তের মাত্র। দক্ষ অভিনেতা স্তাবক, ক্ষণে ক্ষণে নূতন অভিনয়ে চিরাভ্যস্ত তারা। দুঃখে যেন ভেঙে পড়েছে—এমনি ভাব দেখিয়ে বলে, 'কী দুর্ভাগ্য আমাদের! মহারাজের এমন গৌরবময় ইতিহাসটা আমরা জানি না!' আবার পরক্ষণেই অন্য সুর ধরে, 'সাগরের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মহারাজের কীর্তিময় জীবন, সামান্য মানুষের সাধ্য কি তা গণনা করে?'

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে সভাপণ্ডিত, 'আকাশস্থ নক্ষত্রাণি কো নির্ণেতুং সমর্থঃ স্যাৎ!'

তৃপ্তির হাসি হেসে সগর্বে বলে মহামদ, 'সে এক বিচিত্র ইতিহাস। স্বর্গের অধীশ্বর বলে অশেষ দর্প ছিল ইন্দ্রের। অতুল বৈভব, অমিত দৈবশক্তি, অহঙ্কারে স্ফীত ইন্দ্র। তারই নির্দেশে যজ্ঞের সোমভাগ থেকে বঞ্চিত ছিল দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল। দেববৈদ্য—তাদের ক্ষমতাও অসাধারণ। বৃদ্ধ, অন্ধ চ্যবন মুনিকে তারা দিব্য রূপ-যৌবন ও দৃষ্টির অধিকারী করে দিয়েছিল। মহাতেজা চ্যবন মুনি। তিনি ভাবলেন, প্রত্যুপকারে তাঁরও কিছু করা প্রয়োজন। অশ্বিদ্বয়কে সোমভাগী করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সে যজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সিদ্ধ, সাধ্য, দেবর্ষি, মহর্ষি—ত্রিলোক ভেঙ্গে পড়ল। সকলের সম্মুখে রবিতনয়দের জন্য চ্যবন মুনি সোমপাত্র গ্রহণ করলেন। মুনিকে সোম গ্রহণে উদ্যোগী দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল অহঙ্কারী বাসব, 'সামান্য চিকিৎসক দস্র ও নাসত্য। তাদের জাতবিচার নেই, মর্তলোকেও তারা অবাধে বিচরণ করে। দেবতার মত সম্মান তাদের প্রাপ্য নয়।' চ্যবন বললেন, 'কেন, অশ্বিদ্বয়ও দেব-অংশে জাত। তাদের চিকিৎসাগুণেই দেবতা অজর ও অমর। যজ্ঞের সোমভাগ অবশ্যই তাদের প্রাপ্য।' শতক্রতুকে অবজ্ঞা করেই রৌদ্রকর্মা চ্যবন সোমপাত্র উত্তোলন করলেন। বজ্ররবে গর্জন করে উঠল বজ্রী বাসব, 'চিকিৎসক বৈদ্যকে সোমার্হ করলে নিশ্চয় বজ্রাঘাত করব আমি।' ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না উগ্রতেজা মহর্ষি। মন্ত্রোচ্চারণ করে তিনি সোমপাত্র উত্তোলন করলেন। উদ্যত হল ইন্দ্রের অশনি। কি ভীষণ সে বজ্র! দধীচি মুনির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্র, কোটি সূর্যের মত সমুজ্জ্বল, কল্পান্তের মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর নাদ।'

একটু থামল মহামদ। বিস্মিত, সভীত সভাতল—চোখে নির্বাক কৌতূহলী জিজ্ঞাসা। চকিতে চতুর্দিক লক্ষ্য করে বলে চলল সে, 'মুহূর্তে আশ্চর্য কাণ্ড সংঘটিত হল। অশনি উদ্যত দেখে রুদ্রতেজা ঋষির নয়নে কোপবহ্নি জ্বলে উঠল। 'তিষ্ঠ'—এই কথা বলে আমাকে স্মরণ করে ত্বরিতে তিনি হুতাশনে মন্ত্রপূত হবি আহুতি দিলেন।'

'আপনাকে!' বিস্ময়ে প্রশ্ন করল মন্ত্রী, 'আপনাকে কেন?'

সদম্ভ গম্ভীর নাদে সভাতল কাঁপিয়ে বলল মদ-দর্পিত মহামদ, 'আমি তো তুচ্ছ নই। স্বয়ং মহামদ—মহাঘোর, মহাভয়ঙ্কর। সুদীর্ঘ আমার বাহু, বিশাল আমার দেহ—আমি ত্রিভুবন আক্রমণে সমর্থ।'

গর্বিতলোচনে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে। সত্য অতি বিশাল সে দেহ। গিরিশৃঙ্গের মত সমুন্নত গ্রীবা, অনলোজ্জ্বল নয়ন, বিকট করাল বদন। সে দেহের পরিমাণ নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা সেই দেহে—মনে হয়, গ্রাম, নগর, জনপদ, দেশ, মহাদেশ, সসাগরা বসুন্ধরা, এমন কি চতুর্দশ ভুবন গ্রাস করেও তৃপ্তি নেই। ভয়ে, নিরুদ্ধনিশ্বাসে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সভার সমস্ত দর্শক।

দ্রুত বলতে লাগল মহামদ, 'স্মরণমাত্র নিমেষে কোটিযোজন পথ অতিক্রম করে, যজ্ঞশিখায় যজ্ঞপুরুষের মতই আবির্ভূত হলাম আমি। স্তম্ভিত যজ্ঞস্থল—নির্বাক সুরাসুর—স্তব্ধ উদ্গাতা, অধ্বর্যু। নয়নের ইঙ্গিত মাত্র করলেন ঋষি। ক্রোধে আরক্ত হলাম আমি—এত দর্প শতক্রতু ইন্দ্রের! দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে, ঘোর গর্জনে অগ্রসর হলাম বজ্রায়ুধের প্রতি।'

বজ্রবাহু উত্তোলন করে সত্যই প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল বলদর্পিত মহামদ—মনে হল, এক সঙ্গে গর্জন করে উঠল প্রলয়কালীন সহস্র বজ্র। বিরাট মুখগহ্বরে সিত, তীক্ষ্ণ দশন নীল সমুদ্রশীর্ষে শুভ্র ফেনার মত জ্বলজ্বল করে উঠল, রক্ত শুশুকের মত চকিতে প্রকাশিত হল তার রক্তাল লোল রসনা। সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করল সভাজন। কবির চোখে দুঃস্বপ্ন। আসন্ন বুঝি যুগান্তের প্রলয়!

অট্টহাস্যে সভা সচকিত করে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলল মহামদ, 'কোথায় ইন্দ্র! কোথায় ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র! স্তম্ভিত বাহু, স্তব্ধ অমোঘ বজ্র। শুষ্ক তালু, বিশুষ্ক রসনা—'হা হতোঽস্মি' বলে করুণ আর্তনাদ করে ঋষিকে লক্ষ্য করে কাতরকণ্ঠে বলল পুরন্দর, 'প্রসন্ন হোন, রক্ষা করুন। আপনার সঙ্কল্প সত্য হোক—দেবতার মতই অশ্বিনীকুমারদ্বয় গ্রহণ করুক হোমের সোমভাগ। দুরন্ত মহামদকে নিবারণ করুন, মহর্ষি!'

'তারপর তারপর!' সাতঙ্ক সহস্র প্রশ্ন। সদাপ পদচাপে ভূমি কম্পিত করে, বিরক্তিভরে বলল মহামদ, 'তারপর আর কি? কামিনীর মত কোমল ঋষির মন! ভীরু অব্যবস্থিত চিত্ত। মুহূর্তে তুষ্টি, মুহূর্তে রুষ্টি। ইন্দ্রের কাকুতিতে ক্রোধশান্ত হয়ে, হস্ত সংকেতে আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন আমাকে। বাধ্য হয়ে নিরস্ত হলাম।'

হতাশায় বাহু সঙ্কুচিত করল মহামদ। দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেল কবির। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল সে, 'অসীম ক্ষান্তি মহারাজের! ক্ষমতাবান হয়েও ক্ষমার অবতার।'

'দ্বিতীয় বশিষ্ঠ ইব'—বলল সভাপণ্ডিত। সদস্যগণ বলল, 'কি রোমাঞ্চকর কাণ্ড। তারপর কি হল?'

কৌতূহলী সদস্যদের লক্ষ্য করে বলল কবি, 'এর পরেও কি শুনতে চাও এই লোকশ্রুত কাহিনী? তাহলে আমি বলছি, শোন। তারপর, মহারাজের এই বিজয় কীর্তি দেখে, স্বয়ং ইন্দ্র এসে তার স-কিরীট মস্তক আনত করল এই রাজচূড়ামণির চরণতলে; চরণ স্পর্শ করতে ভয় পেল পুরন্দর। তার কিরীটের রত্নপ্রভায় কেবল সমুজ্জ্বল হল মহারাজের পাদপীঠের সন্নিহিত ভূমি। স্তুতিতে মুখর হল গন্ধর্ব, চারণ। অপ্সরী আর কিন্নরীদের সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং ইন্দ্রাণী, বিহ্বলার মত—

'না, তা নয়'—বাধা দিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে উঠল মহামদ। কবি যেন কেঁচো হয়ে গেল। মদঘূর্ণিত লোচনে গর্জন করে উঠল মদোদ্ধত রাজা, 'ইন্দ্রের অর্ধাসন আমি কামনা করি না, তুচ্ছ ইন্দ্রত্ব, তুচ্ছ ইন্দ্রাণীর সেবা। আমি বিস্মিত হলাম চ্যবন মুনির ব্যবহার দেখে। সুমহৎ এই কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তিনি বললেন কিনা, 'আজ থেকে স্ত্রী, পান, অক্ষ ও মৃগয়াসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তোমার অধিকার বিস্তৃত হল। ধার্মিকের নিলয়ে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। অধার্মিকের হৃদয়ে স্থায়ী হোক তোমার আসন। যাও বৎস, এই অধিকার ভোগ কর।' ঘৃণায়, তাচ্ছিল্যে বিকৃত হয় বিকট আনন। নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে রুষ্ট মহামদ, 'চিরকালের স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা ব্রাহ্মণ! মহামদের অধিকার কেবল অধর্মভূমিতে সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? মহামদ কি হীনবল? যার আক্রমণে স্তম্ভিত ইন্দ্রের বজ্র—'

ক্রোধে উন্মত্ত হয় সে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মত চক্ষু থেকে নির্গত হয় আগ্নেয়-নিস্রাব। প্রকাণ্ড দেহটা ক্রমে স্ফীত হতে থাকে। যোজন বিস্তৃত পদ, যোজন-বিস্তৃত বাহু। মনে হয়, মাথা যেন আকাশ স্পর্শ করছে। সিংহনাদে বলে

মহামদ, 'বিশ্বজগতে স্বরাট আমি, সার্বভৌম সম্রাট আমি। আমার রাজ্য ঋষি-নির্দিষ্ট সীমা থেকে বহুদূরে বিস্তৃত। ধর্মরাজকে আক্রমণ করেছি আমি। শান্তি ও সন্তোষ আমার পরাক্রমে অস্থির। গ্রাম নয়, জনপদ নয়, মহাদেশ নয়—সপ্তলোকে আমার অবাধ অধিকার। আমি মান্ধাতাকে মদোদ্ধত করি, বিশ্বামিত্রকে স্বর্গভ্রষ্ট করি। আমার পরাক্রমে স্তব্ধ ইন্দ্রের বজ্র। আমার সমান কে?'

'কেউ নয় মহারাজ!' প্রলাপে, হুঙ্কারে মত্ত কোলাহল ওঠে সভাস্থলে। এমন সময় সমস্ত কোলাহলকে অতিক্রম করে জলদপ্রতিম স্বরে বাইরে নিনাদিত হয় এক মহাগম্ভীর নাদ—'অয়মহং ভোঃ'।

'কে?'—বিস্মিত প্রশ্ন শেষ হতে না হতে সভায় প্রবেশ করেন প্রবৃদ্ধ মহাকালের মত বিপুলকায় এক বৃদ্ধ। দেখতে অনেকটা মহামদেরই মত। তবে, মহামদ যুবক, ইনি বার্ধক্যভারে ঈষৎ নত; মহামদের গাঢ় রক্তের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এঁর বর্ণ তাম্রাভ; মহামদের রক্তবর্ণ দীপ্ত চক্ষু, এঁর নয়ন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ; যেন শ্বেতস্ফটিকে একটি ম্লান নীলা। ইনিও মহামদের মত উদ্ধত, দাম্ভিক—তবে ভূয়োদর্শন ও বহুদর্শনের একটা স্থৈর্য এঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। তুলনায় মনে হয়, মহামদ তমোঘন রজঃ, ইনি রজোঘন সত্ত্বমূর্তি।

সিংহাসন ত্যাগ করল না গর্বিত মহামদ। মানীর মর্যাদাসীমা লঙ্ঘন করাই তার স্বভাব, মদোদ্ধতায় পাত্রাপাত্র বিচারহীন। বৃদ্ধ এগিয়ে চললেন সিংহাসনের দিকে।

বাধা দিয়ে বলল মন্ত্রী, 'ওইখানেই অপেক্ষা করুন, মহারাজ ক্রুদ্ধ হতে পারেন।'

সবিস্ময়ে বললেন বৃদ্ধ, 'এটা কি মহারাজ মহামদের সভা নয়?'

'যারই হোক, এটা এমন একজনের সভা, যাঁর নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর মস্তক আনত করে'—গম্ভীরস্বরে বলল মন্ত্রী।

'অপ্সরী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী যাঁর সেবা করে ধন্য হয়'—চটুল বাক্যে বলল কবি।

দেব ভাষায় বলল সভাপণ্ডিত 'যস্য নাস্তি ত্রিলোকে তুল্য।'

'তাই নাকি! সহাস্যে বললেন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের সিত দশন মহামদের দন্তপংক্তির ন্যায় তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু সমুজ্জ্বল। শুভ্র ভ্রূ আকুঞ্চিত করে বললেন তিনি, 'আমিও কম নই। আমার তপোবল দিয়ে আমি শত শত বিষ্ণু, শত শত রুদ্রকে নিপাত করতে পারি। সংসার বৃক্ষের আদি মূল আমি।'

'এত স্পর্ধা!' সন্নত গ্রীবাভঙ্গী করে বলল মহামদ: 'কে তুমি এমন শক্তিমান? জানো আমার পরিচয়? এ কল্পনা নয়, কাহিনী নয়—ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করেছি আমি।'

'জানো, স্রক চন্দনে এঁকে বরণ করেন স্বয়ং ইন্দ্রাণী?' বলে কবি।

'জানো, অহঙ্কার-মূল বংশের কুল-প্রদীপ ইনি?' বলে সভাপণ্ডিত।

'অহো, তাহলে তুমিই মহামদ!' রাজাকে লক্ষ্য করে সোল্লাসে বললেন বৃদ্ধ। তোমাকেই খুঁজছি আমি। আমি তোমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'অহঙ্কার।'

'আপনি!' একটু নত হল মহামদ। কবি বলল, 'আগে তা বলতে হয়। মহারাজের হয়ে নমস্কার।' পণ্ডিত বলল, 'স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।' মন্ত্রী সসম্ভ্রমে বলল, 'আসন গ্রহণ করুন, প্রপিতামহ।'

আসনে বসলেন প্রবৃদ্ধ অহঙ্কার। বহুদিন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন তিনি, আজ হঠাৎ ফিরে এসেছেন। কুশল বাচন শেষ করে মহামদকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'সাধু! সাধু! দেখছি বেশ বড় হয়েছ। দ্বাপর যুগের শেষে তোমার জন্ম, তখন এতটুকু ছিলে। কলিতে বেশ বাড় বাড়ন্ত হয়েছে তোমার দেহ।'

মহামদের মুখে তৃপ্তির স্মিতহাসি। সগর্বে উত্তর করল সভাপণ্ডিত, 'দেহের দিক থেকেই শুধু বড় হন নি মহারাজ, বংশের মর্যাদাও শতগুণে বর্ধিত করেছেন। অক্ষস্থলী আর মৃগয়াস্থলীতে সীমাবদ্ধ রাজ্য, আজ ধর্মরাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত।

'সে তো প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি'—বললেন অহঙ্কার, 'ধর্ম আমাদের চিরশত্রু। তবুও আত্মীয় বলে আমরা তাকে একটু খাতির করে চলতাম। মহামদ তাও বর্জন করেছে। বেশ, বেশ! তবুও একটা কথা জানতে এসেছি। আমাদের কুল-পঞ্জিটা তো জানা আছে তোমার?'

মস্তক সঞ্চালনে স্বীকৃতি জানিয়ে পণ্ডিতকে বলল মহামদ, 'আমাদের বংশলতিকাটা পিতামহকে শুনিয়ে দাও তো, পণ্ডিত।'

পণ্ডিত আবৃত্তি করতে লাগল, 'প্রকৃতের্মহান্, মহতোহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ মদঃ। মাত্মতি মন্দতে মদঃ।'

'এইটুকু মাত্র!' বিজ্ঞতার হাসি হাসেন পিতামহ, বলেন, 'দেখ, বিস্তৃত বংশপীঠিকা তোমার জানা নেই। কি করে জানবে? কলিকালে আবার বংশের খোঁজও রাখে না কেউ। তা ছাড়া, তোমার জন্ম তো এই সেদিন, প্রাকৃত সৃষ্টির ক্রমানুসারে তোমরা ষষ্ঠ সৃষ্টি, আর আমার সৃষ্টি দ্বিতীয়। দেখতে দেখতে কত কল্প, কত মন্বন্তর, কত যুগ পার হয়ে গেল—সব ইতিহাস আমার নখদর্পণে। বিস্তৃত বংশাবলী তোমার শুনে রাখা উচিত। সম্প্রতি যে পাপগ্রহের দৃষ্টি পড়েছে তোমার ওপর, তাও জানা প্রয়োজন।'

একটু নীরব হন বৃদ্ধ পিতামহ। তারপর স্মৃতি রোমন্থন করে আবৃত্তি করতে

থাকেন কুলের ইতিহাস: 'সৃষ্টির মূলে ছিলেন অসঙ্গ, নির্লিপ্ত পুরুষ আর গুণময়ী অনাদি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের সংস্পর্শরহিত হয়েই 'মহৎ' নামক পুত্রের জন্ম দেন। মহতের দুই স্ত্রী—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। এই দুই স্ত্রী থেকে দুই বংশ—অধর্ম ও ধর্ম। প্রবৃত্তি জননী থেকে আমার উৎপত্তি। কিন্তু সেই কৃত যুগে বিমাতা নিবৃত্তিকেও উপেক্ষা করতাম না আমি। শত্রুতা বোধ আমারও ছিল, সে অতি সামান্য। আমার সন্তান 'মন'। অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত—এই সঙ্কল্প এই বিকল্প—অতিশয় চঞ্চল। তবুও নিজ কৃতিত্বে সে পাঞ্চালেশ্বর হয়েছিল। কুমতি ও সুমতি নামে তার দুই পত্নী আমার দুই স্নুষা। কিন্তু গর্ভধারণ করেই সুমতি সংসার বিরাগী হলেন। 'মন' প্রমত্ত হয়ে রইল পত্নী কুমতিকে নিয়ে। আমাদের বংশ-লতিকার বিস্তার এই কুমতি' থেকেই। দশ ইন্দ্রিয়ের ভোগে তার আনন্দ। এই ভোগানন্দের অমৃতফল তোমার পিতামহ 'মহামোহ'। আশ্চয ছেলে! এমন সংসারাসক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। সেই মহামোহের সন্তান তোমার পিতা 'লোভ' পিতৃব্য 'ক্রোধ'। পিতা 'লোভ' থেকে মাতা তৃষ্ণার গর্ভে তোমার জন্ম। 'অহঙ্কারাৎ মদঃ'—একথা মিথ্যা নয়, কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ—সবই তো আমারই কুল-দুলাল। আমাদের বংশ অমিত বিক্রম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রেরও আমাদের হাতে নিস্তার নেই। কাম সর্বজয়ী, রুদ্র ক্রোধবশ, লোভপুত্র মহামদ—তোমারও গৌরব কম নয়, তুমি ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিহত করেছ। কিন্তু সমূহ বিপদ উপস্থিত।'

'বিপদ!' ভ্রূ আকুঞ্চিত করল মহামদ। পিতামহ বললেন, 'হ্যাঁ, সেইজন্যই এসেছি আমি। জান তো পুরাণ-বাক্য—অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ।'

'তাতে আমার কি?' সিংহনাদে প্রশ্ন করল মহামদ!

'তুমিও যে অত্যন্ত বেড়ে উঠেছ। দর্পে, অভিমানে—উন্মত্ত হয়েছ। তাই ভয়—'

'ভয়!' সবেগে ভূমিতে পদাঘাত করে গর্জন করে উঠল মহামদ।

ধীর চিত্তেই মনে মনে আলোচনা করলেন প্রবুদ্ধ—'অহঙ্কার': মদ তামসিক অহং-এর পরিণাম। স্থৈর্য, ধৈর্য বলে তার কিছু নেই। আমি আঢ্য, আমি অভিজনবান, আজ এই আমি চাই, আজ অমুককে আমি নিহত করব—এই তার দম্ভোক্তি। বৃদ্ধ পিতামহের সত্ত্বগুণে সে বঞ্চিত।

প্রপৌত্রের মদান্ধতায় বেদনা অনুভব করলেন তিনি: হায়, কাল যাদের

প্রত্যাসন্ন, তাদের মদোদ্ধতাকে নিবারণ করবে কে? মদে স্মৃতিভ্রংশতা থেকে বুদ্ধিনাশ—আর 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'। মূঢ়ের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উপদেশও তাদের ক্রোধের কারণ। তবুও শান্তকণ্ঠেই বললেন প্রবৃদ্ধ অহঙ্কার, 'ভয়ের কারণ উপস্থিত বলেই আমি এসেছি। তোমার প্রপিতামহ মনের সুমতি নামে যে পত্নী, তিনি ধর্মকুলে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বিবেক নামে এক পুত্র জন্মেছে। সেই বিবেকের কন্যা 'পরশ্রী-ভাবনা।' শুনেছি, অতি আশ্চর্য তার রূপ, আশ্চর্য তার শক্তি। বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, শক্তির মূলাধার 'পরশ্রীভাবনা'—

কথা শেষ হয় না। ক্রোধে জ্ঞানহারা হয় মহামদ। পরের শ্রী-গৌরবে সে অসহিষ্ণু। বিশেষত নিজে কুরূপ, অন্যের রূপ-স্তুতিতে সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। নিদারুণ রোষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে থাকে সে। আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধ পিতামহ। বহুদর্শী তিনি, বংশের প্রকৃতি তাঁর অজানা নয়। ক্রোধ, পারুষ্য, অতিবাদ, হিংসা—প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ মহামদের। অপেক্ষা করলে হয়তো অপমানিতও হতে পারেন, তাই সত্বর বিদায় নিলেন অহঙ্কার, মুখে বললেন, 'আমাদের বংশে দৈববাণী আছে, সুমতি-কুল থেকে কুমতি-কুল নির্জিত হবে। পাপগ্রহ তোমার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে—তোমার পক্ষে এ অতি দুঃসময়! সাবধান থেকো। আশীর্বাদ করি, তোমার কুশল হোক।'

প্রদোষকে দোষার আশ্রয়ে রেখে যেমন বিদায় গ্রহণ করেন দিনান্তের সূর্য, তেমনি স্তাবক সদস্য আর কুমন্ত্রীর নিকট মহামদকে রেখে বিদায় গ্রহণ করেন প্রবৃদ্ধ অহঙ্কার। ক্রোধে কাঁপতে থাকে মহামদ। তার বিরাট দেহটা আরও বিরাটাকার ধারণ করে, যেন মেঘের ওপর বিস্তৃত হয় প্রলয়কালীন মেঘ। রক্ত নয়নে রোষাগ্নি, যুগান্তের বহ্নিদীপ্তি। সেই সর্বান্তক নয়ন মেলে সে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিশ্বের প্রতি ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

সহসা দ্রুত প্রবেশ করে সীমান্তের দূত, করজোড়ে নিবেদন করে, 'মহারাজ, আসন্ন বিপদ! সীমান্তের ধর্মরাজ্যে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে।'

'বিদ্রোহী!'—রক্তলোচনে তাকায় মহামদ।

'অশান্ত সে বিদ্রোহ, দুর্দম!'

'অশান্ত! দুর্দম! আমার ভাণ্ডার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারো নি? রত্ন-মাণিক্য ছড়িয়ে বশ করতে পারো নি তাদের?'

'অর্থ বিতরণে ত্রুটি করা হয় নি, মহারাজ! মনে হয় সব শ্রী তাদের আয়ত্ত, কুবেরের ঐশ্বর্য তাদের অধিকারে।'

'এতদূর! শক্তিবল কি কম মহামদের? শক্তি প্রয়োগ করতে পারো নি তাদের ওপর?'

'সমস্ত শক্তি ব্যর্থ হয়েছে, মহারাজ! কোথা থেকে যেন বিশ্বের পুঞ্জিত শক্তি ভর করেছে তাদের ওপর। উল্কার মত জ্বালাময়, ধূমকেতুর মত গতি, বজ্রের অধিক শক্তি!'

'স্তব্ধ হও'—সিংহনাদে গর্জন করে ওঠে মহামদ। সে গর্জনে শ্রুতিমূল যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়। ঈর্ষায় আরক্ত মহামদের অগ্নিময় অক্ষিগোলকে যেন বিস্ফুরিত আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। মদস্খলিত কণ্ঠে বলে সে, 'জান, কে আমি? কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অন্যের প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করছ সংবাদবাহক?

কম্পিত কণ্ঠে বলে দূত, 'জানি মহারাজ! বিশ্বের মহামদ—মহাভয়ঙ্কর! ত্রিলোক-বিজয়ী শক্তি, ত্রিলোক-আকর্ষণকারী ঐশ্বর্য! কিন্তু তার চেয়েও—

দূতের বাক্য শেষ হয় না। মহাদম্ভে হুঙ্কার করে ওঠে মহামদ, 'আমি দেখব, কত তাদের শক্তি। সৈন্য সজ্জিত কর সেনাপতি, চল, দেখি কত বিদ্রোহীদের তেজ।'

সভা ভেঙে যায়। তুমুল আস্ফালন আর উগ্র কোলাহলে পূর্ণ হয় গগনতল। বন্দীর স্তুতি মিলিয়ে যায় রণদামামার নির্ঘোষে। নিমেষে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে যাত্রা করে চতুরঙ্গ সেনা। সৈন্যদলের পুরোভাগে দুর্মদ মহামদ।

মহামদের রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় তীর্থরাজ চক্রতীর্থ। এপারে বিশাল প্রান্তর, ওপারে সেই ধর্মতীর্থ, মধ্যে খরস্রোতা নদী। শম, দম, যম ও নিয়মে শান্তিময় ধর্মনিকেতন। সেখানে মদোদ্ধতা নেই, নেই তামসিক অহঙ্কার। লোভ ও তৃষ্ণা, ক্রোধ ও হিংসা বর্জিত পুণ্যের রাজত্ব। বেদবিহিত আচরণ, ধর্মবিহিত কর্ম, শাস্ত্রবিহিত নিয়মে প্রতিষ্ঠিত তপস্যাস্থল। সেখানে রয়েছেন—আর্যা ব্রহ্মবিদ্যা, দেবী শ্রদ্ধা, রয়েছেন বিবেক, সন্তোষ। গৃহে গৃহে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দেন শান্তি, মিত্রা, অনসূয়া। মহামদ অতিমদে স্ফীত হয়ে এই রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেছিল হেতুবাদী চার্বাক আর ব্যভিচারী কাপালিকের সহায়তায়। আজ সেই অংশ বিদ্রোহী।

মহাদম্ভে বিদ্রোহ দমন করতে এল মহামদ। সৈন্যের কোলাহলে, হয়, হস্তী, রথী, পদাতির 'হং' হুঙ্কারে পূর্ণ হল আকাশ। এপারে মহামদের অজেয় বাহিনী, ওপারে ধর্মব্যূহ—শান্তিরক্ষায় তৎপর মিত্রা অনসূয়া, সন্তোষ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হতেই মহামদের সৈন্যদল ধর্মচক্র আক্রমণ করল। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড হয়ে ওঠে অসুর শক্তি। আসুরিক শক্তিই মহামদের সৈন্যদলের। ক্রোধের পীড়নে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল শান্তির নীড়। নির্মম, নির্দয় ক্ষমাহীন পীড়ন। হুঙ্কার-গর্জনে হিংসার মত্ততা। প্রান্তর বিদীর্ণ করে উঠল মর্মবিদারী আর্তনাদ। সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর মহামদ। আজ তার কালভৈরবের মূর্তি—ভ্রূকুটি-কুটিল, উগ্র, ভয়াল। রাত্রি যত গভীর হয়, তত তার প্রমত্ত দাপট। অস্থির মস্তিষ্ক। বন্ধনমুক্ত দিগ্‌গজ মুখে মদান্ধ গর্জন। ভীষণ তার আকৃতি। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—যেন অশান্ত ক্রোধান্ধ কৃতান্ত। সারারাত্রি কালরাত্রির প্রলয়—সংহার-লীলায় সংহৃত সৃষ্টি। চতুর্দিকে মহামদের জয়ধ্বনি। বিপর্যস্ত যেন ধর্মরাজ্য—মূর্ছিতা মিত্রা, শান্তির আনন্দ নীড়ে অশান্ত ক্রন্দন, অশ্রুছলছল অনসূয়ার নয়ন।

কালরাত্রি সুচিরস্থায়ী নয়। রাত্রিশেষে উষার শুভ্র রেখা দেখা দেয় পূর্ব আকাশে। জ্যোতির্ময় সূর্যের অগ্রদূতী উষা—করুণার কমকান্তি, অমৃত ও অভয়ের বাণীবাহিকা। তার চরণে মস্তক আনত করে সদোষা অন্ধকার। মহাঘোর অন্ধকারের মতই মহামদের সৈন্যদল—উদ্যত বাহু উদ্দাম ঔদ্ধত্য। তাদের সম্মুখে ধর্মব্যূহ থেকে এসে দাঁড়াল উষার মত জ্যোতির্ময়ী এক নারী! কাঞ্চনপ্রভায় ভাস্বর অঙ্গ, কুঞ্চিত কুন্তলে মহাকাশের নীলিমা, আয়ত নয়নে সুধাসাগরের পীযূষধারা। নবনীর মত কমনীয় স্নিগ্ধ কান্তি! নয়ন যেন জুড়িয়ে যায় মদোদ্ধত সৈন্যদলের। স্তব্ধ মদমত্ত গর্জন, শান্ত অস্ত্র ঝনৎকার, স্তম্ভিত শক্তি যেন মুহূর্তে মন্ত্রশান্ত সহস্র ভুজঙ্গ।

মহামদেরও কেমন যেন বিহ্বলতা! কিন্তু সে নিমেষের তরে। সৈন্যদলের ক্লীবত্ব তাকে উন্মাদ করে তোলে। আরক্ত নয়নে সে দাঁড়ায় সেই নারীর সম্মুখে, মেঘমন্দ্রে গর্জন করে বলে, 'জানো, বিশ্বত্রাস আমি মহামদ? জগতে অজেয়। ইন্দ্রের বজ্র প্রতিহত হয় আমার তেজে?'

'জানি, জানি বলেই তো এসেছি আমি—বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে বলে বরবর্ণিনী, 'আশ্চর্য তোমার শক্তি, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা। ইন্দ্রের চেয়েও অমিত তেজ, কুবেরের অধিক অমেয় ঐশ্বর্য, বরুণের চেয়েও বিরাট গাম্ভীর্য! তোমার সমকক্ষ কে? তোমার শ্রীতে বড় আনন্দ আমার!'

স্তম্ভিত মহামদ। মদে মত্ত সে, স্তুতিবাদে তার আনন্দ। কিন্তু স্তাবকদের মুখেও সে এমন স্তুতিবাদ শোনে নি। তাদের স্তুতি মহামদকে মাতাল করে তোলে, কিন্তু এ স্তুতির এ কি বিগলনস্বভাব! অরুণস্পর্শে যেমন গলনাঙ্ক সীমায় এসে পৌঁছে কঠিন তুষার, তেমনি অবস্থা মহামদের। সে মোহিত হয়ে যায় মোহন সুরের

মোহিনী মায়ায়। মিত্র সস্মিত বাক্যে বলে মঞ্জুভাষিণী, 'তোমার শ্রীতে বড় আনন্দ আমার। শুভ্র স্ফটিকের যেমন সুখ—রক্ত, নীল, জরদের রঙ গায়ে মেখে, আমার তেমনি সুখ পরের ঐশ্বর্য চিন্তায়। কি বিরাট তোমার দেহ, কি বিপুল তোমার শক্তি।'

বিস্মিত হয়ে যায় মহামদ। কে এই মধুরভাষিণী? এ কি তার শত্রু? শত্রু যদি, এর নয়নে রোষারুণ কোথায়, রণচণ্ডীর মত অট্টহাস কোথায়, মুহুর্মুহু গর্জন কোথায়? এর নয়নে অশ্রুসজল স্নিগ্ধতা, অধরে ভুবনভুলানো হাসি, কণ্ঠে মধুর মঞ্জুভাষা। কেমন যেন মোহগ্রস্ত মহামদ, যেন বাঁশীর মোহন স্বরে মুগ্ধ কালফণী।

মুদারায় মন্দ্রিত হয় বীণার তার—কঠিন অথচ সুহৃৎ-সস্মিত বাক্যে বলে লাবণ্যময়ী ললনা, 'এত পেয়েও কতটুকু পেলে তুমি? চাওয়ার কি শেষ আছে? মানুষ ইন্দ্রত্ব কামনা করে, ইন্দ্র কামনা করে ব্রহ্মত্ব, ব্রহ্মা কামনা করেন ব্রহ্মলোক। কিন্তু শান্তি কোথায়? তুমি শক্তিমান—শক্তির শেষ সীমা দেখেছ কি? তুমি ঐশ্বর্যশালী—ঐশ্বর্যের শেষ পেয়েছ কি? উগ্র মদ, বিপুল দম্ভ মানুষকে মাতাল করে তোলে—উৎকট পীড়নে পীড়িত সৃষ্টি—'

কাঁপতে থাকে বীণার তার। বেদনার অনুরণন। করুণাময়ীর নয়নে চিক-চিক করে অশ্রু। গভীর কণ্ঠে সে বলে, 'দম্ভ, দর্প, অতিমানিতায় জগতে কে স্থির প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে? গর্বিত বলিরাজ, বিশ্বত্রাস রাবণ—বলতে পার, কার পতন হয় নি? অহঙ্কারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন, মদের শেষাশ্রয় মৃত্যু।'

কাঁপছে মহামদ। ইন্দ্রের বজ্রমুখে যে স্থির, মঞ্জুভাষিণীর বাণীমুখে সে অস্থির। ভয়ে নয়, ক্রোধে। কি বলছে ওই সামান্যা নারী? অহঙ্কারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন? মদের শেষাশ্রয় মৃত্যু? বিশাল দেহ আলোড়িত করে সিরসির করে জাগে ক্রোধের প্রথম শিহরণ। সেই শিহরণকে উগ্রতর করে এবার বজ্ররবে ধ্বনিত হয় কোমল নারীকণ্ঠ, যেন বিষাণ হয়ে বাজে বীণা, 'শেষ পরিণাম স্মরণ কর মহামদ। অতিমাত্রায় বর্ধিত হয়েছ তুমি। মদে তুমি অন্ধ, ঈর্ষায় তুমি ভ্রান্ত, হিংসায় আচ্ছন্ন তোমার বুদ্ধি। তোমারও পতন আসন্ন।'

'পতন আসন্ন?' মহাক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় মহামদ। বিরাট বপুতে বিপুল কম্পন—রক্তে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ! প্রচণ্ড গর্জন করে সে অগ্রসর হয় কোমলাঙ্গীর প্রতি। নবনীর মত কোমলতার কণ্ঠ চেপে ধরবে সে।

প্রলয় মেঘের মুখে শান্ত, স্থির চন্দ্রলেখার মত মহামদের উদ্যত আক্রমণের মুখে দাঁড়ায় মোহিনী তন্বঙ্গী। কি অপরূপ লাবণ্য! দেহে স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্তি, নয়নে

সন্ধ্যার কাজল, অধরে প্রভাত অরুণের রক্তরাগ। সর্বাঙ্গে অনমনীয় শক্তি-দীপ্তি। সৌম্যা, সৌম্যতরা অথচ বজ্র-কঠিন দৃঢ়তা।

মহামদের মস্তিষ্কে যুগান্তের মেঘডম্বর, সঘন আলোড়ন। কে এই নারী? কে এই রুদ্ররূপা রূপসী? বিদ্যুতের মত চকিতে চমক দিয়ে যায় পিতামহের বাণী—বিবেক-কন্যা 'পরশ্রীভাবনা'—অদ্ভুত তার রূপ, আশ্চর্য তার শক্তি।' মরিয়ার মত চিৎকার করে ওঠে মহামদ, 'কে তুমি! কে তুমি!'

শান্ত, মধুর কণ্ঠে বলে তন্বী, 'আমি পরশ্রীভাবনা।'

'পরশ্রীভাবনা? আমাদের বংশের শত্রু? শত্রুপক্ষের কন্যা?'—উন্মাদের মত গর্জন করে ওঠে মহামদ। উচ্চৈস্বরে দ্রুত বলে পরশ্রীভাবনা, 'না—না, শত্রু নই। শত্রু কেন? তুমি আমার পর নও। তুমি যে আমারই—'

কথা শেষ হয় না। কোন কথাই শুনতে পায় না মহামদ। ক্রোধান্ধ গর্জনে শোনা যায় না কোন কথাই। একটি অতি স্থির বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেমন প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হয় চক্রনেমি, 'পরশ্রীভাবনা'কে কেন্দ্র করে তেমনি প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হয় মহামদের মস্তিষ্ক। ঘূর্ণিত মৃত্তিকা, বায়ু, ব্যোম—বিঘূর্ণিত বসুন্ধরা। ঘোর মদাতঙ্কগ্রস্তের মত সে অগ্রসর হয়। শূন্যে উত্থিত পদ, শূন্যে উদ্যত বাহু। শত্রুকন্যাকে মুষ্টিবদ্ধ করে পিষ্ট করতে চায় সে। কিন্তু লুপ্ত যেন শক্তি—বিদ্রোহী বুদ্ধি, বিদ্রোহী কর্মেন্দ্রিয়। গতিতে স্খলিত চরণ, মহাশূন্যে ব্যর্থ বাহু আস্ফালন। উৎকট মদাত্যয়। তবু ঘোর গর্জন করে সে অগ্রসর হয়, কিন্তু পদস্খলিত হয়ে আরও বিকট গর্জন করে ছিন্নমূল বনস্পতির মত ভূমিতে লুণ্ঠিত হয় সে।

অন্তরে মুক্ত করুণা-নির্ঝর, নয়নে উচ্ছল বেদনাশ্রু—'পরশ্রীভাবনা' দ্রুত এগিয়ে আসে, ত্বরিতে কোলে তুলে নেয় তার মূর্ছিত মস্তক, গভীর মমতায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেয় মহামদের সর্বাঙ্গে।

অনাদি প্রকৃতি, যার ভুবনমোহিনী মায়া আকর্ষণ করে অসঙ্গ পুরুষকে, ভোগের বিষপাত্র তুলে ধরে অধরে—সে-ই তো আবার স্নিগ্ধ সোমের মত রসধারায় সিঞ্চিত করে সাগর-বনস্পতি, মধুময় করে সংসার। সম্পদে অধরা, বিপদে অধীরা, মন্ত্রণায় কান্তবাক্, ঔদ্ধত্যে শান্তি, পরশ্রীভাবনাময় প্রেম। এই প্রেমের শৃঙ্খলে বন্দী জগৎচরাচর—তারই অরুণস্পর্শে বিগলিত মদ-তুষার। *

* মদোৎপত্তির ইতিহাস রয়েছে 'দেবী ভাগবত'এর ৭ম স্কন্ধ—৮ম অধ্যায়ে; মদ-বিনাশের কল্পনা করা হয়েছে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের ছায়ায়।

# ॥ সালকটঙ্কটা ॥

অদীনসত্ত্ব মহর্ষি অগস্ত্য রক্ষোবংশের বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটন করছিলেন। বিস্মিত, নিস্তব্ধ সভাকক্ষ—বিস্ময়-বিমুগ্ধ রঘুপতি রাম।

রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্র। অযোধ্যায় ফিরে এসে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। অন্ধকারে নিমীলিত পদ্মের মত বিমলিন অযোধ্যা, সূর্যোদয়ে অম্লান পঙ্কজের মত শোভা ধারণ করেছে। এ যেন সোনার কাঠির স্পর্শ! রাজ্যের শ্রী ফিরে গেছে। রাম-রাজ্যে তুষ্ট, পুষ্ট, নিরাময় প্রজাবর্গ—নির্ভয়, নিরাকুল দশদিক।

নানা দিগ্‌দেশ থেকে এসেছেন বেদ-বেদাঙ্গবিদ্, ভূরিতেজা ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি—কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কৌশিক, অত্রি, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ। পাদ্য-অর্ঘ্যে অভিনন্দিত হয়ে তাঁরা সভা আলো করে বসেছেন, যেন সূর্যকে ঘিরে বসেছে জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডল।

ঋষিদের লক্ষ্য রাম-রাজত্বের সর্বাঙ্গীণ ঋদ্ধি। অতুলনীয় রামচন্দ্রের কীর্তি, অতুল রামরাজ্যের বৈভব! কিন্তু ঋষিরা বলছেন—'কীর্তি ও বসুশ্রী বাইরের সম্পদ—ধর্ম ও শান্তি অন্তরের ঐশ্বর্য। অন্তরের ধনে সমৃদ্ধ হোক রাম-রাজ্য, সর্বদিক থেকে সর্ব-কল্যাণের আকর হয়ে উঠুক অযোধ্যা।'

আজকের সভার প্রধান প্রবক্তা পরম আর্য অগস্ত্য। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য-ধর্মের প্রসারকল্পে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। বিন্ধ্যপর্বতের দুরতিক্রমণীয় বাধাকে অপসারণ করে তিনি দক্ষিণাপথে আর্যসভ্যতার জ্যোতির্ময় আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, সমুদ্র শাসন করে স্বাধ্যায় ও বষট্‌কার লোপকারী কালেয় দানবকুল ধ্বংসে সহায়তা করেছেন। তিনি জানেন, অতি ভয়ঙ্কর আসুরভাবের প্রভাব। দৈবভাবকে তিলে তিলে ক্ষয় করে এই ভাব জয়ী হয়ে ওঠে, নিঃশেষে গ্রাস করে মানুষের মনুষ্যত্ব। একে জয় করবে কে?

কখনও ঋষির নেত্রে জলে উঠছে রোষাগ্নি, কখনও বা অশ্রুছলছল সজল নয়ন, কখনও করুণায় রুদ্ধ কণ্ঠ! তিনি ভাবছেন, হায়, লুব্ধ আকাঙ্ক্ষার পেষণতলে পিষ্টা ধরণীর কি সকরুণ মুখছবি! কামনা-ক্লিন্ন মানুষের জঘন্য কামনায়

মানুষের কি শোচনীয় পরিণাম! এদের কবল থেকে কি মুক্তি নেই? এমন কি নেই কোনও শক্তিমান, যিনি এদের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন?

নিবিড় অন্ধকারে যেন আশার আলো দেখতে পান ঋষি। ওই তো সম্মুখে, নবদূর্বাদল শ্যাম নয়নাভিরাম মূর্তি! কী তেজ, কী গাম্ভীর্য! দীপ্তি ও কান্তি, শক্তি ও ক্ষান্তির রুদ্রসুন্দর বিগ্রহ। ইনি পারেন, ইনি পারেন আসুরভাবকে নির্জিত করে প্রশান্ত, উদার দৈবভাবের প্রতিষ্ঠা করতে।

বুকের স্বপ্ন নয়নে প্রদীপ হয়ে জ্বলে। গম্ভীর, উদাত্ত স্বরে যেমন বেদমন্ত্র ছন্দিত হয়, তেমনি স্বরে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন মহাতেজা অগস্ত্য, 'ত্রিলোক-ত্রাস রাবণকে নিহত করে জগতকে তুমি নিরাতঙ্ক করেছ। অহঙ্কৃত, অশান্তিকর নিদারুণ রবই 'রাবণ'। জন্মকালে এই রবে, ত্রিলোক ধ্বনিত হয়েছিল, সারাজীবন এই অশান্ত ঘোর রবে ত্রিভুবনকে আকুল করেছে সে। স্বভাব-ক্রূর রাক্ষস রাবণ—কাম, ক্রোধ ও জিগীষার এক মূর্তি। তার দুরন্ত কামনার গ্রাস বেদবতী, রম্ভা; অপ্সরী, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও সতী নারীর অশ্রুতে পূর্ণ তার কাম-গতি রথ। দুর্দম তার অন্ধক্রোধ—সে ক্রোধের আহুতি হয়েছে নিজের ভগ্নীপতি বিদ্যুৎজিহ্ব, এই ক্রোধের হুঙ্কারে নির্বাসিত হয়েছে ধার্মিক বিভীষণ। কি দুর্জয় তার জয়ের নেশা! সে-নেশায় বিক্রত স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল! কাম, ক্রোধ ও জিগীষার এই ভয়ঙ্কর অশান্তিকে তুমি জয় করেছ। রাম—বিপুল, বিস্ময়কর তোমার কীর্তি! কিন্তু বৎস, তুমি বিনাশ করেছ বাইরের রাবণকে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে সুপ্ত রয়েছে রাবণ, বুকে বুকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে রাক্ষসরূপী দুর্জয় কাম, ক্রোধ, লুব্ধতা। তাদের বিনষ্ট করতে হবে। মনে রেখো, দশগ্রীব রাবণকে নিহত করে তুমি অর্ধ-রাক্ষসকে মাত্র নিহত করেছ।'

'অর্ধ রাক্ষস! তার অর্থ?'—সহস্র কৌতূহলী প্রশ্ন উঠল সভায়।

ধীরে বললেন অগস্ত্য, 'রাবণ তো পূর্ণ রাক্ষস নয়। তার পিতা ঋষি, মাতা রাক্ষসী—অর্ধরাক্ষস রাবণ। তার পিতামহ প্রজাপতি পুলস্ত্য—ব্রহ্মার মানস-সন্তান; পিতা বিশ্রবা—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। বিশ্রবার ঔরসে রাক্ষসী কৈকসীর গর্ভে রাবণের জন্ম—সে আর্য-অনার্যের সঙ্কর। পূর্ণ রাক্ষস হল আদি রক্ষোবংশ, যে বংশের দুহিতা কৈকসী। রাবণের বহু পূর্বে সেই রাক্ষস লঙ্কা অধিকার করেছিল।

বহুদর্শী ঋষির বাক্যে বিস্মিত হলেন রঘুনন্দন রাম। রাক্ষস রাবণের পূর্বেও

রাক্ষস ছিল, আর তারা ছিল লঙ্কারই অধিবাসী—এ যেন পরম বিস্ময়। কামচারী নিশাচরকে নিহত করে তিনি ভেবেছিলেন, সমগ্র রাক্ষস বংশকেই ধ্বংস করেছেন। এ ধারণা তাহলে মিথ্যা? বিনয়নম্র বচনে প্রশ্ন করলেন রক্ষো-বিজয়ী রাম, 'দ্বিজবর বিশ্রবা থেকেই কি রক্ষোবংশের সূচনা নয়?'

হেসে বললেন অগস্ত্য, 'বৈশ্রবণ রাক্ষস অনেক পরবর্তীকালের। তার পূর্বে ছিল 'সালকটঙ্কটা' বংশীয় রাক্ষস।'

'সালকটঙ্কটা! কে সে?'

'রাবণের বৃদ্ধ প্রমাতামহী। রাবণের মাতৃকুল তার নামেই পরিচিত, কারণ, 'সালকটঙ্কটা' থেকেই সে বংশের বিস্তার। সালকটঙ্কটার পুত্র সুকেশ; সুকেশের পুত্র মাল্যবান, সুমালী, মালী; সুমালী-কন্যা কৈকসীর পুত্র রাবণ। রাবণ বিশ্বের অশান্তি, অতি ভীষণ—কিন্তু তারও চেয়ে ভয়ঙ্কর আদি রক্ষোবংশ। হে রঘুনন্দন, তুমি সে-রাক্ষসকে নিহত করতে পার নি। তোমরা জান, রাক্ষস মানুষ ভক্ষণ করে—এ শুধু স্থূল দেহ-মাংস নয়। অলক্ষ্যচারী হয়ে তারা ভক্ষণ করে মানুষের সদ্‌বুদ্ধি, সদাচার। তারা যজ্ঞভুক্, শস্যভুক্, ধর্মভুক্—প্রজ্বলিত বহ্নির মত সর্বভুক্। অতি ভয়াবহ তাদের ইতিহাস।'

স্তব্ধ সভাকক্ষ। নীরব মন্ত্রী, সদস্য, ঋষি। বিস্ময়াপ্লুত ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। রঘুপতি রাম নির্বাক—তাঁর কমল-নয়নে ক্রোধ ও করুণার তরঙ্গ-ভঙ্গ। সকলের মুখেই কৌতূহলী নীরব জিজ্ঞাসা। কৌতূহলী হয়ে কাঁপছে যেন রাজ-সিংহাসনের বৈদূর্য, বিদ্রুম, পদ্মরাগ—কাঁপছে দীর্ঘোন্নত স্তম্ভাবলীর উজ্জ্বল নীলা। সে কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন পুরাণপুরুষ অগস্ত্য; শান্ত ধীরকণ্ঠে তিনি বলে চললেন পুরাপরম্পরাব্যক্ত অদ্ভুত পুরা কাহিনী।

স্বর্ণলঙ্কা নির্মিত হওয়ার বহুকাল পূর্ব থেকে, যুগযুগান্ত ধরে এই সশৈল, সসাগরা সৃষ্টি অধিকার করে রয়েছে অসুর, রাক্ষস। কমলযোনি ব্রহ্মার অবিদ্যাসম্ভব সৃষ্টির আদি সৃষ্টি তারা। জন্মলগ্ন থেকে কামনা-বুভুক্ষু, ক্ষুৎকাম। কামনা থেকেই সৃষ্টি, আবার কামনা থেকেই ক্রোধ, প্রলয়। স্বভাবের আদি বিকৃতি 'মহাশনো মহাপাপ্মা' এই কাম, এই ক্রোধ। অসুর, রাক্ষস তারই প্রতীক।

তখন কল্পের সূচনা মাত্র। রুদ্র কালাগ্নি তখনও নির্বাপিত হয় নি, তখনও থেকে থেকে গর্জন করছে সংবর্ত মেঘ! ঘোর মহাতামিস্রে সৃষ্টি করে চলেছেন প্রজা-কাম ব্রহ্মা। তাঁর সঙ্কল্প তখনও তপঃশুদ্ধ হয় নি, বিপর্যস্ত একার্ণবের মত বিপর্যস্ত

সঙ্কল্প। সহসা সকাম ব্রহ্মার জঘনদেশ থেকে সৃষ্টি হল প্রদোষ অন্ধকারের মত কৃষ্ণবর্ণ তমোঘন 'অসুর'। কুটিল কামনার বিভীষণ মূর্তি। জন্মমাত্র দ্রুতপদে অগ্রসর হল তারা পিতা ব্রহ্মার প্রতি। চোখে উন্মাদ লালসা, চরণে মদোন্মত্ত ক্ষিপ্র গতি। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন কমলযোনি, অন্ধকারে উঠল আকুল স্বর, 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'। কিন্তু অতিষ্ঠ কাম। উত্তাল সাগর-তরঙ্গের মত গর্জন করে অগ্রসর হল অসুর।

সহসা সেই মহাশূন্যে ভীত ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে উত্থিত হল এক সুগম্ভীর নাদ, 'তামসিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে তামসী সৃষ্টি করেছ তুমি। অশুচি তোমার তনু। শীঘ্র এ-তনু ত্যাগ কর।'

লজ্জায়, ভয়ে কাতর ব্রহ্মা। সর্প যেমন নির্মোক ত্যাগ করে, তেমনি ত্বরিতে তামসী তনু ত্যাগ করলেন তিনি। সেই তনুই সায়ন্তনী 'সন্ধ্যা'। অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি—দেহে সুশ্যাম শ্যামলতা, এলায়িত চূর্ণ কুন্তলে ঘনমেঘের নীলিমা, সীমন্তে তারার টিপ। তার নয়নের মদিরাবেশে অসুর মুগ্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে শান্ত হল তারা। যে-তনু থেকে অসুরের উৎপত্তি, সেই তনু-প্রতিমাই হল তাদের পত্নী। কামনার কি কুৎসিত গতি! লজ্জায় অন্ধকার-আঁচলে মুখ ঢাকল সন্ধ্যা। আজও সে লজ্জার শেষ নেই।

অসুর শান্ত হল, কিন্তু ব্রহ্মার মনোভাব নির্মল হল না। কামনার বীভৎস পরিণাম দেখে তিনি সন্ত্রস্ত, ভয়ে শুষ্ক কণ্ঠ, বক্ষ। উগ্র ক্ষুধা ও তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করলেন পদ্মসম্ভব।

মুহূর্তে ঘটল আর এক অঘটন। ব্রহ্মার অত্যুগ্র ক্ষুৎপিপাসায় তাঁর পাপাশ্রয় পায়ু থেকে সহসা ভীষণ-দর্শনা নিঋ্ঁতির উৎপত্তি হল। জগতের চির অসত্যরূপিণী নিঋ্ঁতি। নয়ননিমেষে এই নিঋ্ঁতি থেকে উৎপন্ন হল মহাভীষণ পিঙ্গলবর্ণ, ঘোরারাবী, ক্রূরস্বভাব প্রজা। তারা বৃত্তাক্ষ, মহাকায়, দীর্ঘবাহু। সভয় ক্ষুধা-তৃষ্ণার আবেগে তাদের জন্ম, যেন ক্ষুধা ও তৃষ্ণারই প্রতিমূর্তি। উগ্র ক্ষুৎপিপাসায় পাগল হয়ে তারা ছুটল ব্রহ্মার প্রতি—ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করবে তারা। কাতরকণ্ঠে প্রাণপণ চীৎকার করে উঠলেন কমলযোনি, 'ভক্ষণ কর না, রক্ষা কর। আমি তোমাদের পিতা।'

ক্ষুধার বিবেক নেই, বিচার-মূঢ় ক্ষুধা। চির অনিয়ত, বিবৃতবদন, ক্রোধবশ। 'দহ্যতে ক্ষীয়তে মূঢ়ঃ শুষ্যতে ক্ষুধয়ার্দিতঃ'। ব্রহ্মার কথায় বিকট চীৎকার করে উন্মাদের মত একদল বলে উঠল—'ভক্ষণ কর, ভক্ষণ কর।' আর একদল পিঙ্গাক্ষ

প্রজা প্রমত্ত শ্লেষে ঘোর অট্টহাস করে উঠল—'রক্ষা কর রক্ষা কর।' অতি বক্র, অতিশয় কুটিল সে শ্লেষ! তারপর ভীমবেগে অগ্রসর হল তারা।

সভয়ে আবার আর্তনাদ করে উঠলেন ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষে আবার উচ্চারিত হল অভয় বাণী—'ভয় নেই। হে ব্রাহ্মণ, তুমি অশুচিব্রত, অশুচি তোমার তনু। শীঘ্র তনু ত্যাগ কর। মনে রেখো, তামস মনোভাবে তামসী সৃষ্টিই সম্ভব হয়, সে-সৃষ্টি কল্যাণের অন্তরায়।'

লজ্জিত হলেন ব্রহ্মা। নিমেষে তামসী তনু ত্যাগ করলেন তিনি। এই তনুকে বলে রাত্রিরূপিণী 'দোষা'। দোষা কৃষ্ণবর্ণা, মদোদ্ধতা, মায়াবিনী। আশ্চর্য তার মোহিনী শক্তি! নিদুটিমন্ত্রে জীবের চোখে নিদ্রা সঞ্চার করে সে। দোষার মায়ায় ক্ষুধা ভুলে গেল ক্ষুধাতুর, তাকে গ্রহণ করে শান্ত হল উদ্যত বাহু।

ক্ষুধাবশে যারা ব্রহ্মাকে বলেছিল 'যক্ষামঃ' অর্থাৎ ভক্ষণ করব—তারা 'যক্ষ', বিশ্বের আদি যক্ষ—স্বার্থপর, কৃপণ, অর্থগৃধ্নু। আর যারা বলেছিল 'রক্ষামঃ'—রক্ষা করব, তারা 'রক্ষ'—বিশ্বের আদি রাক্ষস; কামচারী, ক্রোধকুটিল, ক্ষুধাতুর। দোষা এদের প্রিয়া, তাই এদের বলা হয় 'প্রিয়দোষ' বা নিশাচর। নির্ঋতি থেকে উৎপন্ন বলে এরা নৈর্ঋত রাক্ষস নামেও পরিচিত।'

একটু থামলেন ঋষি অগস্ত্য। আতঙ্কিত সভাতল। অতি ভয়াবহ এই তামসী সৃষ্টির ইতিহাস। বিকৃত ক্ষুধা-কামনার এ-কাহিনী যেন পুরাণের চেয়েও পুরাতনী, এ-যেন ভয়াল রোমাঞ্চ! ব্যগ্র জিজ্ঞাসায় বিস্ফারিত সকল নয়ন, মুখে শিশুর মত কৌতূহলী প্রশ্ন, 'তারপর!' প্রাচীনবেত্তা কুম্ভজন্মা অগস্ত্য। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন তারপরের ইতিহাস—'এরাই আদি রাক্ষস। 'পরদারাবমর্শিত্বং পারক্যার্থে চ লোলুপাঃ' এদের স্বভাবধর্ম। উগ্র ব্যভিচারী এদের কামনা, অতি ভীষণ এদের পরার্থলোলুপতা। এই কামনা-লুব্ধতাই রাক্ষসী ক্ষুধা। এ-ক্ষুধা শুধু দেহের নয় এ-ক্ষুধা মনের—এ ক্ষুধা প্রতিটি রক্তকণিকার। এই রক্ষোবৃত্তি কেবল রক্ষোবংশেই নয়, বিশ্বের প্রতিটি 'মোহান্ধ মানুষ এই বৃত্তির বশ। এরই বিষক্রিয়ায় দূষিত রক্ত, এরই প্ররোচনায় উদ্বেজিত জগৎ। বিশ্বের বুকে অত্যাচার ও অনাচারের দাবানল সৃষ্টি করে কে?—এই রাক্ষসী ক্ষুধা। রাম, তুমি কি শোন নি আর্তের করুণ ক্রন্দন? দেখ নি কি অনাথা নারীর, অসহায় শিশুর নয়নাশ্রু? সে ক্রন্দন, সে অশ্রু রাক্ষসী ক্ষুধার সৃষ্টি। কামান্ধ, দর্পিত রাবণ সেই ক্ষুধার করাল মূর্তি। কিন্তু তারও চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর রক্ষোবংশের আদিমাতা 'সালকটঙ্কটা'—কামনার কদর্য মূর্তি, যেন একটি বীভৎস, অতি

কুটিল কামনার গ্রাস। তার কাহিনী শুনলে আতঙ্কে, ঘৃণায় মুখ ঢাকবে তুমি।'

ঘৃণায় নিজেই দেহ কুঞ্চিত করেন স্থিতধী অগস্ত্য। সভাকক্ষে ওঠে সহস্র কণ্ঠের কলগুঞ্জন। সেই গুঞ্জনকে স্তব্ধ করে ঋষি বলে চলেন রাক্ষসী 'সালকটঙ্কটা'র কাহিনী।

নিবিড়, নির্জন বনতলে তৃণাস্তৃত শ্যামল ভূমিতে শঙ্খ ধরেছে একটি কালনাগ ও একটি কালনাগিনী। নিকষ-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ যেমন পরস্পর বেষ্টন করে একবেণী রচনা করে, তেমনি নাগ-নাগিনীর আবদ্ধ পুচ্ছভাগ একবেণী রচনা করে চক্রাকারে ভূমিতল আশ্রয় করেছে। উর্ধ্বে মুখোমুখি দুটি উন্নত ফণা, আবেশ-বিহ্বল নির্নিমেষ নয়ন। কি সুগভীর প্রীতির আলোকন! কি সুখকর মৃদুমন্দ আনন্দ-দোলা! অন্য কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিলনে নিখিলহারা নায়ক-নায়িকা, সম্ভোগ-বাসরে লুপ্ত বিশ্ব।

নাগ-নাগিনীর এই সানন্দ-সম্ভোগ অত্যুগ্র তৃষিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে কালনাগিনীর মতই কৃষ্ণবর্ণা এক কুমারী নারী। ঘন নীলবরণী কামিনী—বিস্রস্ত কুন্তলে সুনীল আনন, যেন নীলজলে প্রস্ফুটিত নীলোৎপল। কেমন যেন একটা রোমাঞ্চমক তারও দেহে! সিরসির অঙ্গবিধূনন, রোমমুখে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। তারও পলকহীন নয়নে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে—তৃণ, বৃক্ষ, বনভূমি, লুপ্ত সমগ্র বিশ্ব।

সহসা তন্ময়তা ভেঙে যায়। কিসের শব্দে চমকিত হয়ে বরুথিনী পিছন ফিরে তাকায়, অবাক বিস্ময়ে দেখে—পাশে দাঁড়িয়ে এক বিশালদেহ যুবক। প্রাবৃট-কালের রঞ্জিত সন্ধ্যাভ্রের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, দেহভরা পূর্ণ যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গ। করিকর সদৃশ উরু, লৌহভীম বাহু, প্রশস্ত বক্ষ। দীপ্ত নয়নে সুতীব্র সকাম চাহনি।

মুগ্ধা বিহ্বলা কুমারী কন্যা। চকিতে এদিকে তাকিয়েই আবার ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে। কখন যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে সম্ভোগী ভোগিযুগল। নির্জন অরণ্যে একা পুরুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একা কামিনী। লজ্জাই এস্থলে স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু সে-নিয়মের ব্যতিক্রম স্মরাতুরা নারী। পুরুষের দেহ-দর্পণে নির্নিমেষ নয়নে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করে আত্মভোলা কামিনী। তন্ময় হয়ে সে ভাবে—মেরুমন্দর সদৃশ এমন বলিষ্ঠ, কে এই পুরুষ?

পুরুষও উদাসীন নয়। দৃষ্টিভোগে সুতীব্র উত্তেজনা। উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সেও ভাবে—অঙ্গে প্রদোষের ছায়া, নয়নে মায়ার আঁধার-কাজল, ত্রিবলিতরঙ্গে অলঙ্কৃত নাভি—কে এই সুন্দরী?

'কে তুমি !'

'কে তুমি !'

একই সঙ্গে দুই সোৎসুক কণ্ঠের দুই পূর্বপক্ষ, যেন কড়ি ও কোমলে ঝঙ্কৃত দুইটি বীণা-তন্ত্রী। মদবিহ্বল কণ্ঠে বলে কামদর্পিত পুরুষ, 'অমিতপ্রভ রক্ষোবংশে পরাক্রান্ত হেতি-পুত্র আমি—বিক্রান্ত বিদ্যুৎকেশ!'

বিদ্যুৎকেশ! রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ! যার দুর্জয় প্রতাপে তটস্থ ত্রিভুবন! শাসনে ও শোষণে অদ্বিতীয় সেই বিদ্যুৎকেশ!—বিদ্যুৎ-চাঞ্চল্য খেলে যায় কুমারীর দেহে, আশার আলো চমক দিয়ে যায় নয়নে। পুষ্পধনুর মত ভ্রূ দুটি বাঁকিয়ে, কটাক্ষে পুষ্পশর নিক্ষেপ করে, সহাস্যে মদস্খলিত কণ্ঠে সে বলে, 'অসুরপ্রিয়া প্রতাপশালিনী সন্ধ্যার নন্দিনী আমি—সালকটঙ্কটা।'

সালকটঙ্কটা! মেঘদ্যুতি সন্ধ্যা-নন্দিনী সালকটঙ্কটা! রূপসী মায়াবিনী—অসুরসমাজে যে দ্বিতীয়া রতি?—অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে অমিতপ্রভ রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ। সহসা কি মাতাল হয়ে উঠল পলাশের বন?

শক্তিদর্পে দর্পিত রাক্ষস। সে জানে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—বীরভোগ্যা যে-কোন কামিনী। ইচ্ছাই শক্তের প্রাপ্তি। স্বয়ং প্রতিগ্রাহী হলে, তাকে প্রত্যাখ্যান করবে কে? উগ্র কামের ভূমিকা নেই, দুর্জয় দম্ভের নেই ধৈয। শালীনতা, সৌজন্য ভীরুর ভূষণ। সুদীর্ঘ লোলুপ বাহু প্রসারিত করে বলে কামার্ত রাক্ষস, 'আমি তোমার পাণি-প্রার্থী।'

অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করে সালকটঙ্কটা। অদ্ভুত শক্তিমানের যাচ্ঞা! বুকভরা পুলক, সর্বদেহে রোমাঞ্চ! কেমন যেন সভয় আনন্দ-কম্পন! ধীরে এক পা এক পা করে পিছিয়ে যায় সে—যেমন আক্রমণোদ্যত মহামুখ ব্যাঘ্রের চোখে সুতীক্ষ্ণ, স্থির দৃষ্টি রেখে সতর্কতার সঙ্গে পিছিয়ে যায় কুশলী শিকারী। তারপর সহসা অতর্কিতে বিদ্যুৎগতিতে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায় চঞ্চলা। বিশাল অরণ্য অনুরণিত হয় এক অদ্ভুত চপল কলহাস্যে।

অস্থির হয়ে ওঠে বিদ্যুৎকেশ। আশ্চর্য মায়াবিনী! উন্মাদের মত সে ডাকে, 'সালকটঙ্কটা!'

অদৃশ্য বনতলে ধ্বনিত হয় আবেগকম্পিত মায়াকণ্ঠ, 'আমিও তোমাকে কামনা করি বিদ্যুৎকেশ। কুমারী স্বাধীন নয়। মাতা সন্ধ্যার কাছে আমাকে প্রার্থনা কর তুমি।'

নির্জন অরণ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে, 'আমাকে প্রার্থনা কর তুমি...'

আর্যেতর জাতির সংসারের নেত্রী জননী। জননীই সেখানে সমাজের নিয়ন্ত্রীশক্তি, মাতৃগোত্রেই বংশের পরিচয়। কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ স্বয়ং এসে দাঁড়াল সায়ন্তনী সন্ধ্যার দ্বারে। আড়ালে কান পেতে শুনল সালকটঙ্কটা, বিদ্যুৎকেশ বলছে, 'হেতিপুত্র আমি, বিদ্যুৎকেশ। আমি, আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।'

দুরুদুরু কাঁপছে সালকটঙ্কটার বুক—আশা, উদ্বেগ আশঙ্কা! মায়ের কি অভিমত? পূর্ণ কি হবে না তার মনস্কাম?

গভীরভাবে মনে মনে বিচার করছেন বিদুষী সন্ধ্যা। তিনিই একাধারে কন্যার পিতা, মাতা, বান্ধবী। পিতা বরের গুণাগুণ বিচার করেন, মাতা কামনা করেন বরের বিত্ত। পিতার মতই ভাবলেন তিনি: বংশমর্যাদায় অতুল রক্ষোবংশ। বিদ্যুৎকেশের পিতা হেতি, সপ্তাশ্ববাহিত সূর্যের রথে তার অবস্থান। মানব, দানব, এমন কি রুদ্রশূল, বিষ্ণুচক্রেরও অবধ্য তিনি। মাতা 'ভয়া'ও কালের ভগিনী। দুই কূলে ধন্য বিদ্যুৎকেশ। সে নিজেও অমিতবিক্রম। কন্যাকে তো অপরের হস্তে সম্প্রদান করতে হবেই। সৎপাত্রেই তাকে অর্পণ করা সঙ্গত। বিদ্যুৎকেশ অবশ্যই সৎপাত্র।

আবার মাতার মত চিন্তা করলেন ব্রহ্ম-তনুজা: ঐশ্বর্য ও সম্পদে প্রতিষ্ঠিত রাক্ষসকুল। বিদ্যুৎকেশে কন্যা সমর্পিতা হলে, কন্যা অদীনা হয়ে রাজৈশ্বর্য ভোগের অধিকারিণী হবে। মাতার চিরকালের কামনা, কন্যা আমার রাজরাণী হোক। আবার একটু ভয়ও হল তাঁর। শক্তিদর্পে উদ্ধত রাক্ষস। প্রার্থনা পূর্ণ না হলে, হয়তো বলপূর্বক বীর্যশুল্কেই এ-কন্যাকে হরণ করে নেবে।

—নানাদিক থেকে বিচার করে বিদ্যুৎকেশের হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করবেন স্থির করলেন সন্ধ্যা, মুখে বললেন, 'আমার কন্যা তোমার পাণিগৃহীতা হবে—এ অসুর কুলের পরম সৌভাগ্য! তুমি কুলীন, রক্ষোবংশের গৌরব। আমি সানন্দে এ-বিবাহে সম্মতি দিচ্ছি।'

মাতার বাক্যে উল্লাসে উল্লসিত হয় সালকটঙ্কটা। মনে মনে আশার আনন্দ-বাসর রচনা করে সে। বরের রূপ-চিন্তায় বিভোর ভাবী বধূ, অন্তরভরা রূপানুরাগ। 'অহো রূপম্ অহো ধৈর্যম্ অহো সত্ত্বম্ অহো দ্যুতিঃ'—আহা, কি অপরূপ রূপ-মাধুরী, আহা কি ধৈর্য, আহা কি অসীম শৌর্য! কি অমেয় দ্যুতি, কি প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যুৎকেশে! এই শৌর্যের নিয়ন্ত্রী হবে সে। বিরাট মন্দর বাধা পড়বে তারই ভুজবন্ধনে! কী সুখ, কী তৃপ্তি!

কামনার রঙ যার বুকে, কামনার নেশা যার চোখে তার কাছে চিররঙীন ভুবন। সেই ভুবনে কল্পনায় রাঙা হয়ে ওঠে কৃষ্ণা অসুর-কন্যা। এও একপ্রকার রাজ-যোটক। লগ্ন-রাশি মিলিয়েই শুধু রাজযোটক হয় না। বর যেখানে স্বয়ং যাচক, কন্যা যেখানে স্বয়ং যাচিকা, অভিভাবক যেখানে অনুকূল—সেখানে মহা রাজযোটক। এ-যেন যুক্ত-বেণীর মধুর সঙ্গম। যোগ্যের সঙ্গেই মিলিত হল যোগ্যা। বিদ্যুৎকেশের সহিত মিলিত হল সালকটঙ্কটা, রাক্ষস-শক্তির সহিত যুক্ত হল আসুরিক তেজ। ক্ষুধা ও কাম একবেণীতে মিলিত হল, যেন অনলের সহিত যুক্ত হল অনিল, যেন উন্মত্ত সিন্ধুতরঙ্গ বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করে ঊর্মির সঙ্গে হাত মিলাল প্রলয়-ঝটিকা।

দৈবভাবের আজন্ম শত্রু আসুর ভাব। অসুর, রাক্ষস দেবত্বের চিরবৈরী। দম্ভ, দর্প, মদ—ক্রোধ, পারুষ্য, অতিদ্রোহিতা—যা কিছু আসুরিক ভাব, তাদের মূল কদর্য কাম। কাম আর ক্ষুধা ভিন্ন নয়, ভিন্ন নয় অসুর ও রাক্ষস। এক পাপের দুই মূর্তি, এক বিষবৃক্ষের দুই বিষফল। বিশ্বের যাবতীয় অনাচার এই ক্ষুধা-কামনার সৃষ্টি। ক্ষুধাতুর বিবৃতবদন, উগ্র, উদ্যতবাহু—ক্ষুধাকাতর জীব অন্ধ, বধির। তার পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঊর্ধ্ব-অধঃ—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই। শুধু কি তাই? মায়া, মমতা, স্নেহ—সব ভুলিয়ে দেয় ক্ষুধা:

জনকং জননীং পুত্রান্ ভার্যাং দুহিতরং তথা।
ভ্রাতরং স্বজনং বাপি ত্যজতি ক্ষুধয়ার্দিতঃ॥

যেমন ক্ষুধা, তেমনি কাম। কামনাও অন্ধ, বধির, নিষ্ঠুর।

দুর্দান্ত ক্ষুধা-কামনার ভীষণ মূর্তি রাক্ষস বিদ্যুৎকেশ, অসুর-নন্দিনী সালকটঙ্কটা। মানুষের ভাষা সে-ক্ষুধাকে বর্ণনা করতে পারে না। নির্দয় রতিবুভুক্ষা, অতি নির্মম তার রূপ! মনে হয়, জগতে আর কেউ নেই, আর কিছু নেই—আছে শুধু সম্ভোগ আর সম্ভোগ।

এই সম্ভোগেই প্রবৃত্ত হল নবদম্পতী। নববধূ তুলসীমূলে প্রদীপ জ্বালাল না, সন্ধ্যায় বাজাল না শুভ শঙ্খ: বর পঞ্চযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গৃহকে পবিত্র করল না, শোধ করল না পঞ্চ ঋণ। রাজপ্রাসাদ পূর্ণ হল ভোগের নাট-গীতে। সম্ভোগের রসদ অর্থ। প্রজার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে চরিতার্থ হল রাজার ভোগ। ক্রন্দন করে উঠল ধর্ম, ক্রন্দন করে উঠল আর্ত প্রকৃতিপুঞ্জ। করগ্রাহীর রুদ্র কর আগুন জ্বালিয়ে দিল প্রজার গৃহে। চতুর্দিকে অগ্নি, চতুর্দিকে হাহাকার। বিদ্যুৎকেশ-সালকটঙ্কটার প্রমোদ-ভবনে তখন মদনোৎসব।

প্রমোদের তরঙ্গ কেবল প্রাসাদ-সীমায় আবদ্ধ রইল না, বিস্তৃত হল সরিতে, সরোবরে, সাগরে ; বিস্তৃত হল কুঞ্জকাননে ও নির্জন অরণ্যে। আলোড়িত হল শৈলের শিখর, সানুদেশ, কন্দর। দিন নেই, ক্ষণ নেই, পর্বকালাকাল বিচার নেই। উষায়-পূর্বাহ্নে-মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে-ভরসন্ধ্যায়, গভীর নিশীথে—কামনার বহ্নিতে বরবধূর মুখচন্দ্রিকা।

অরণ্যের সুন্দর শোভার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে সালকটঙ্কটা, 'ওই দেখ, কী মনোরম সরোবর, কী সুন্দর হংসলীলা, কী নয়ন-হরণ শ্যাম দূর্বাদল, কী চমৎকার বেতসী লতার বন্ধন।'

হেসে উত্তর দেয় বিদ্যুৎকেশ, 'শোভনাঙ্গি ! তোমার নয়নের অচ্ছোদপটলই সরোবর, কটাক্ষ হংসলীলা ; তোমার সবুজ মেখলা শ্যামল দূর্বাচটি, কোমল বাহুই বেতসী-লতার বন্ধন।'

খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে সালকটঙ্কটা, প্রতি অঙ্গরেখায় যেন কিন্নরীর নৃত্য। বিদ্যুৎকেশের রক্তে উত্তপ্ত উন্মাদনা।

মাতালের মত উন্মাদনা! উন্মাদ রাক্ষস, উন্মাদিনী অসুরনন্দিনী। প্রমত্তা বুঝি সমগ্র প্রকৃতি। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ বেলাবলয়ে বেষ্টিত হয়—চঞ্চল হয়ে ওঠে বিদ্যুৎকেশ ; সাগর-দিগন্তে দিগ্‌বধূ আলিঙ্গন করে সমুদ্র-কটি—চঞ্চলা হয়ে ওঠে সালকটঙ্কটা। সমীরণ এসে স্পর্শ করে নদীজল, শিউরে ওঠে সরিৎ-তরঙ্গ—শিউরে ওঠে বিদ্যুৎকেশ ; কলমুখর হয়ে স্রোতস্বিনী নটিনীর মত নেচে নেচে সাগরে প্রবেশ করে—অস্থির হয়ে ওঠে সালকটঙ্কটা। সরোবরে চক্রবাক-চক্রবাকী, রাজহংস-রাজহংসীর মিথুন-চেষ্টা ওদের পাগল করে তোলে।

গিরিশিখরে এসে দাঁড়ায় ওরা—দেখে, উষার পশ্চাতে সবেগে ছুটেছে অরুণ। রাঙা অরুণের কামনার রঙে রক্তমুখী শুভ্রা উষা। আনন্দের ভয়ে শিথিল তার সঙ্কোচ-আবরণ, তর্জনী-হেলনে প্রণয়-রোষের ভান, বাঁকানো মুখে আত্মনিবেদনের ত্রাস। কোথায় উষা? অরুণ বক্ষে আনন্দলীনা অরুণ-প্রিয়া।

কখনও দেখে—মত্ত দিগ্‌গজের মত ছুটেছে মেঘ! উত্তাল হয়ে উঠেছে সিন্ধুতরঙ্গ। প্রলয় মেঘ সবলে আকর্ষণ করছে সিন্ধুকে, উত্তরঙ্গ সাগর প্রচণ্ডবেগে আকর্ষণ করছে মেঘকে। জলস্তম্ভ সৃষ্টি হয়েছে সাগরে। একাকার মেঘ ও জলধি।

নিদ্রাহীন উদগ্র কাম, তন্দ্রাহীন উদ্দাম সম্ভোগ। কোথা দিয়ে চলে যায় দিন, কোথা দিয়ে চলে যায় রাত্রি। এক যুগ যেন একটি নিমেষ। তৃপ্তিহীন,

শ্রান্তিহীন, শান্তিহীন ক্ষুধা। প্রমত্ত বিদ্যুৎকেশ যেন তপ্তসলিল সাগর—চির-ক্ষুভিত, চিরতরঙ্গিত, চিরগর্জিত! তার নয়ন রক্তবর্ণ, বিঘূর্ণিত মস্তক, মুখে গজ-রাজের মত মদস্রাব। অনঙ্গরঙ্গে মত্তা অসুর-কন্যা যেন বহ্নির লেলিহান শিখা—কৃষ্ণকুটিল, গর্জমুখর, সর্বগ্রাসী। তার লোচন মদঘূর্ণিত, আরক্ত—বিপর্যস্ত বিভূষণ, বক্ষে ঘনশ্বাস!

অগ্নি-উচ্ছ্বাসে গর্জন করে ওঠে আগ্নেয় পর্বত, মাতাল ঝড় ওঠে বনে, নদীর বুকে জাগে রাক্ষসী বন্যা। কত আগুন আর যতুগৃহ! প্রলয়ে কি এত উদ্দাম হয় ঝড়? বৃক্ষে বৃক্ষে সঘন ঘর্ষণ, মাটির বুকে অনলশ্বাস। বন্যার জল লাল হয়ে ওঠে কামিনীর অঙ্গরাগে।

নিষ্ফলা নয় উদ্দণ্ড ক্ষুধা, ব্যর্থ হয় না মত্ত ঝড়ের আবেগ। তারা রিক্ত করে, পূর্ণও করে। রিক্ত করে পরকে, পূর্ণ হয় নিজে। অগ্নি যেমন হবি থেকে অমোঘ রুদ্রতেজ গ্রহণ করে, ঊর্মিমুখে সংজ্ঞা যেমন গ্রহণ করে সূর্যের শক্তি—তেমনি বিদ্যুৎকেশের রাক্ষসী তেজ ধারণ করল অসুরনন্দিনী সালকটঙ্কটা। ক্রমে প্রকাশিত হল দৌহৃদ লক্ষণ। ক্ষীণ দেহ, পাণ্ডুর বদন—আবার দিনে দিনে সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর কান্তি।

আর্যধর্মে গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের দশবিধ সংস্কার—প্রত্যেকটি ক্রিয়া ধর্মের সংযত শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। সেখানে অতি কঠিন গর্ভিনীর দায়িত্ব, অতি কঠোর স্বামীর কর্তব্য। সন্তান—সে তো সম্ভোগের গরল নয়, নয় উদ্ধত কামনার বড়বা। সন্তান ধর্মযজ্ঞের পুণ্যফল, অলকনন্দার আনন্দধারা। সে যজ্ঞফল লাভের নিয়ম আছে, সংযম আছে, মন্ত্র আছে।

কিন্তু ক্ষুধাতুর রাক্ষস, কামাতুরা অসুরনন্দিনী। নিয়মে তারা অনিয়ম, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম। আসঙ্গ লিপ্সায় আরও উদ্দাম হয়ে উঠল তারা। অন্ধ ইন্দ্রিয়সেবায় যারা নিত্য প্রমত্ত, তাদের পান-ভোজন, হাস্য-রোদন, অবস্থান-গমন একসূত্রে গাথা—তেমনি একসূত্রে বাধা বিদ্যুৎকেশ-সালকটঙ্কটা। ক্ষণেকের তরে বিদ্যুৎ মেঘমুক্ত হলে যেমন গভীরভাবে গর্জন করে ওঠে মেঘ, তেমনি মুহূর্তের তরে ভার্যা চোখের আড়াল হলে ঘোর গর্জন করে ওঠে বিদ্যুৎকেশ। সালকটঙ্কটা মদিরা পান করে বিদ্যুৎকেশকে প্রসাদ দেয়, বিদ্যুৎকেশ সেই সুধা পান করে খল-খল হেসে ওঠে: বিদ্যুৎকেশ তাম্বুল চর্বণ করে অর্ধচর্বিত তাম্বুল সালকটঙ্কটার মুখে অর্পণ করে—সেই তাম্বুল-রাগে মদমত্তা করিণীর মত ভীষণা হয়ে ওঠে মুক্তকেশী। তারায় বাজে মেঘমল্লার।

জলভারে নমিত বর্ষার ঘন মেঘ, জলভারে পূর্ণা বর্ষার তরঙ্গিণী। কি উত্তাল ঝড়ের আবেগ! সে-ঝড়ে চঞ্চল হয় মেঘ, চঞ্চলা হয়ে ওঠে পূর্ণা তটিনী। জল-ঝরানো তার প্রমত্ততা, তীর-ছাপানো তার উন্মত্ত উচ্ছ্বাস। ঝড়ের বুকে আরও উচ্চগ্রামে দ্রুতলয়ে বাজে যেন মল্লার রাগ।

সেদিন রুদ্রাধিকারভুক্ত রাক্ষসী মুহূর্তে সালকটঙ্কটা বদ্ধ ছিল বিদ্যুৎকেশেরই বাহুপাশে। সহসা ত্রস্তে আলিঙ্গন-মুক্ত হল সে। ভীতা, চকিতা যেন বন-করিণী। অবাক হয়ে গেল বিদ্যুৎকেশ, সভয়ে দেখল, ঘননীল হয়ে গেছে সালকটঙ্কটা। গভীর এক অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন চোখে-মুখে, মুহুর্মুহু কুঁকড়ে যাচ্ছে দেহ। কোন কথা বলার পূর্বেই, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে শৈল কাননান্তরালে অদৃশ্যা হয়ে গেল সে।

উন্মাদের মত ডাকল বিদ্যুৎকেশ, 'সালকটঙ্কটা!'—আহ্বান যেন প্রমত্ত বৃংহণ। বনতলে রিরি করে উঠল সেই নিখাদ নির্ঘোষ।

শৈল-সানুদেশ থেকে ধ্বনিত হল বেদনাখিন্ন বিহ্বল প্রত্যুত্তর, 'মুহূর্ত অপেক্ষা কর।' প্রস্তরশৈলের আঘাতে প্রতিধ্বনিত-হল বিকট সেই রাসভী ধ্বনি।

মদাতঙ্কিতের মত অস্থির বিদ্যুৎকেশ। চঞ্চল চিত্ত, চঞ্চল স্নায়ু—যেন সহস্র বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলছে তার দেহে। শঙ্কাব্যাকুল উতলা প্রতীক্ষা। মুহুর্মুহু ব্যাকুলতর গর্জিত আহ্বান, 'সালকটঙ্কটা! সালকটঙ্কটা!'

অলক্ষ্য শৈলকাননে তেমনি উত্থিত হয় বেদনাকাতর, কামবিহ্বল কণ্ঠস্বর, 'একটু অপেক্ষা কর বিদ্যুৎকেশ।'

বনবন করে ঘোরে যেন সারা বন! ভীষণ কম্পন! ব্যগ্র প্রতীক্ষার আবেগ-কম্পন, অব্যক্ত বেদনার আকুল কম্পন! বুকের অতলে কম্পিত রক্তসিন্ধুর রক্তবিন্দু, নয়নের অচ্ছোদপটলে কম্পিত তারারন্ধ্র। বিপুল সম্ভাবনায় সভয়ে স্পন্দিত সুকঠিন বেদনা! কম্পিত শৈল, সরোবর, কানন, কন্দর। গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় কাঁপছে সহস্র ত্রসরেণু, প্রদোষের ছায়ায় কাঁপছে আবছা অন্ধকার।

সহসা দেখা যায়, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আলোড়িত করে বিজয়িনীর মত কলহাস্যে ছুটে আসছে কামোন্মত্তা সালকটঙ্কটা, আলিঙ্গন-লিপ্সু হয়ে ছুটে আসছে মদপ্লুতা করিণীর মত রজঃপ্লুতা সত্যপ্রসূতি—যেন উগ্রভীষণ ক্ষুধার গ্রাস আর একটা নিষ্ঠুর অন্ধ ক্ষুধা।

তখন শৈল-সানুদেশ প্রকম্পিত করে প্রাণপণে ভৈরবরবে চিৎকার করছে একটি পরিত্যক্ত, অসহায়, সদ্যোজাত শিশু—মমতাহীন কুৎসিত কামনার বিষফল সে—রাক্ষস সুকেশ, রাবণের প্রমাতামহ।

নীরব হলেন অগস্ত্য—নীরব হল একটি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট কম্পিত কণ্ঠ। বজ্রাহতের মত শুব্ধ সভাকক্ষ। রত্নসিংহাসনে নিস্তব্ধ রক্ষোবিজয়ী রাম—বেদনায় সজল কমলনয়ন, ক্ষোভে স্ফুরিত কোমল ওষ্ঠাধর। তিনি ভাবছেন, 'এই উৎকট ক্ষুধা-কামনারূপী নির্দয় রাক্ষসের বুভুক্ষা-গ্রাস থেকে রামরাজত্ব মুক্ত হতে পেরেছে কী?'

ভবিষ্যোত্তর কালের কণ্ঠেও জাগে যেন একই প্রশ্ন, 'উৎকট ক্ষুধা-কামনারূপী রাক্ষসের কবল থেকে রামরাজ্য মুক্ত হতে পেরেছে কি?'*

* রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৩য়, ৪র্থ সর্গ।

# ॥ চার্বাক ॥

প্রিয়দর্শন সুকুমার চার্বাক। তার কষিতকাঞ্চন অঙ্গবর্ণে সুচারু-সুষমা, চারু অঙ্গে চারুতার চারুচিত্র। চারু চাঁচর চিকুর, চারু ভ্রূলেখা। চারু নেত্রে চারু চাহনি, অধরে চারু হাস্যরেখা। যেমন মধুর হাসি, তেমনি মধুর ভাষী। চারুবাক্ চার্বাক।

তার জীবনে দুঃখ নেই, যেন দুঃখকে নিঃশেষে জয় করেছে সে, নীলকণ্ঠের মত পান করেছে বিশ্বমথিত বিষ। সদাশিবের মত সদানন্দ, যেন চিরমুক্ত সুখের নির্ঝর, যেন স্বতঃস্ফূর্ত একটা স্ফূর্তি। সে বিশ্বের আনন্দমেলায় দুঃখী মানুষকে আহ্বান করে বলে, 'সুখময় এই সাগরমেখলা শ্যামাঞ্চলা ধরণী, সুখে পূর্ণ বিশ্বের হৃদয়পাত্র। কেন মিথ্যা দেহের বিড়ম্বনা, কেন মিথ্যা বৈরাগ্যের সাধনা? তোমার ইন্দ্রিয় আছে—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা, ত্বক্—পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রদীপে দেখ এই ভোগবতী বসুন্ধরা, আকণ্ঠ পান কর তার রূপ, রস। দেহকে সুখভোগ করাও—'দেহ এব আত্মা ন চাপরঃ'।

চার্বাকের মোহন বাক্য প্রভাতে-সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে-মধ্যরাত্রে দ্বন্দ্বমথিত অন্তরে সুধা বর্ষণ করে। দুঃখক্লান্ত জীবনে এ-যেন কিন্নর কণ্ঠের গান, লোভীর জীবনে দীপ্ত সুরা। চার্বাককে ঘিরে সমবেত হয় সহস্র লোক। ভোগীরা চার্বাককে লুফে নেয়। যদৃচ্ছাবাদী মহামোহ ও মহামদ তার অজ্ঞাতসারে তাকে গুরুপদে বরণ করে। সবচেয়ে আকৃষ্ট হয় সর্বহারা সাধারণ মানুষ। তারা যুগ-যুগান্তরের বহ্নিগ্রাসের অবশেষ। ধর্ম তারা বোঝে না, অধর্মকেও ভয় পায়; মিতাচারী তারা নয়, অমিতাচারেও তাদের ভয়; দুঃখের জগতে তারা সুখ কামনা করে, পায় না। চার্বাককে ভালবাসে তারা, প্রশ্নও করে অনেক। চার্বাকের মধুর হাসি ওদের জীবনের ক্ষণিক আলো, সংশয়াকুল চিত্তে খ-ধূপের মত তার মধুরাক্ষরা বাণী।

উদার অবিচল জ্ঞানী পুরুষ চার্বাককে দেখে উদাস হাসি হাসেন—তাঁদের নিকট যথা চতুর্বেদ, তথা চার্বাক। কিন্তু চার্বাকের প্রতি কঠিন হয়ে ওঠেন তার্কিক বৈদান্তিক, সাংখ্যযোগী, নৈয়ায়িক। তর্কে তর্কে তাঁরা চার্বাক-বাক্য খণ্ডন

করেন। চার্বাকের ওপর খড়্গহস্ত যাজক ব্রাহ্মণ। তাঁরা বলেন, 'অকাটমূ পাষণ্ড।' কেউ মন্তব্য করেন, 'নাস্তিক, ঘোর নাস্তিক।' কেউ-বা তিক্তকণ্ঠে বলেন, 'কামুক লম্পট—তাই দুঃখের সংসারেও মিথ্যা সুখের মদির স্বপ্ন দেখে।'

নিন্দাবাদে ক্ষুণ্ণ হয় না চার্বাক। তার ভুবন-মোহন হাসি যেন আবর্তসঙ্কুল তরঙ্গশীর্ষে শুভ্র ফেনা। হেতুবাদী তার্কিক সে, ক্ষুরধার বুদ্ধি—অকাট্য যুক্তি। সহাস্যে সে প্রত্যুত্তর করে, 'মূর্খ কে? যে প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী, না যে কল্পনা-বিলাসী? আমার দর্শন মিথ্যা স্বপ্ন নয়—এর প্রণেতা স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা বৃহস্পতি।'

গুরুকে ভাল মনে পড়ে না চার্বাকের। অনেক কালের অনেক প্রলেপ পড়েছে স্মৃতির ওপর। স্বপ্নের মত মনে হয় সুদূর অতীতের কথা। স্বপ্ন যেমন সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—তেমনই সত্য-মিথ্যায় গড়া তার জীবন-পঞ্জি। এ যেন তার জীবনের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী। কিছু স্মৃতির কঙ্কাল, কিছু কিংবদন্তী, কিছু কল্পনায় রচিত ইতি-স্মৃতি।

অনাদি অতীতের কথা। মরুত্তের যজ্ঞে পৌরোহিত্যে ব্যর্থকাম বৃহস্পতি আশ্রম বেঁধেছিলেন মর্ত্যে—নন্দীপুরে। চার্বাক উপস্থিত হয়েছিল তাঁরই আশ্রমে। নিরাশ্রয়, অনাথ, কৈশোর-অতিক্রান্ত স্ফুটনোন্মুখ এক মৃণালচ্যুত পদ্মকলিকা। আয়ত আননে ভীরু উৎসুক দৃষ্টি, যেন পথহারা হরিণ-শাবক। সে জানে না—কী তার পরিচয়, কোন্ গোত্রে তার জন্ম। সারাদিন সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে সে দেখেছিল ঋষির আশ্রম। এখানে উদাত্ত সামগান, ওখানে হুতহবির সৌরভ। কোথাও আশ্রমবটুদের কলকলা, কোথাও আচার্যের সুগভীর কণ্ঠ—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা', 'অথাতো কর্ম-জিজ্ঞাসা'। কিশোর প্রাণে কৌতূহল, অন্তরে সহস্র প্রশ্ন—কে এই ব্রহ্ম, কী এই কর্ম, কি এদের ফলশ্রুতি?

দিনান্তে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে এসেছিল। ক্লান্ত চার্বাক ঘুমিয়ে পড়েছিল এক কুটীরের পাশে। সহসা ঘুম ভেঙে গেল। মধূখ প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে সবিস্ময়ে দেখল চার্বাক, সম্মুখে হিরণ্যবর্ণ এক ঋষি। জ্যোতির্ময় দ্যুতি তাঁর দেহে। স্নিগ্ধ অথচ মর্মভেদী দৃষ্টি। আশ্রয় প্রার্থনা করে তাঁরই চরণমূলে লুটিয়ে পড়েছিল চার্বাক।

আর্থবান্ আঙ্গিরস বৃহস্পতি। তিনি ঋক্‌মন্ত্রের বরণীয় দেবতা, অমেয় তাঁর তপোবল। তিনি গণপতি, সত্যনিষ্ঠ তাঁর দৃষ্টি। সত্যের সন্ধানী-আলো ফেলে কি যেন দেখলেন তিনি ওই কমল-নয়নে, কি যেন আবিষ্কার করলেন তিনি

ওই কোমল পদ্ম-কলিকায়। সস্নেহে বালককে উঠিয়ে পরম আগ্রহে মস্তক আঘ্রাণ করলেন। অন্তর জুড়িয়ে গেল চার্বাকের। কি স্নেহের স্পর্শ!

আজন্ম স্নেহের কাঙাল চার্বাক—অনাথ যাযাবর। কতবার মাতাপিতার জন্য হৃদয় কেঁদে উঠেছে। কেউ বলেছেন, প্রেতলোক থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ নিয়ে তাঁরা চার্বাককে দেখছেন। সে ভেবেছে, প্রেতলোক থেকে তাহলে কেন ফিরে আসেন না জননী? কেন স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দেন না তাকে? মৃত্যুর পর সত্যিই মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে কী? কত মাথা কুটেছে সে দেবতার পায়ে। কোনও দেবতা কর্ণপাত করেন নি। মনে জেগেছে সংশয়—দেবতা যদি জগৎপিতা, সন্তান কেন নিরাশ্রয়? দেবতা যদি জগন্মাতা, সন্তান কেন স্নেহবঞ্চিত?

আজ এই প্রথম স্নেহের আস্বাদন, এই প্রথম সুখের অনুভূতি। চার্বাকের মনে হয়—মিথ্যা দেবতা, মিথ্যা পরলোক। সত্য এই পৃথিবী, প্রত্যক্ষ সত্য এই মাটির মমতা। স্নেহের গঙ্গোত্রী ধরণী, বুকে তার সোহাগের সহস্রধারা।

আশ্রমে দ্বিতীয় প্রভাতের কথা। রজনী অতিবাহিত হয়েছিল এক স্বপ্নময় বিভোরতায়। শুভ ব্রাহ্ম-মুহূর্তে তাঁকে ডেকে সস্নেহে বললেন কুলপতি বৃহস্পতি, 'যাও চার্বাক, ক্রৌঞ্চ-সরোবরে স্নান করে এস। শুচি হও, শুদ্ধ হও। হোমাগ্নিতে যজ্ঞপুরুষের আবাহন করে আজ তোমায় গায়ত্রী দীক্ষা দেব।'

সবিস্ময়ে নীল আয়ত দুটি নয়ন মেলে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল চার্বাক। গায়ত্রী দীক্ষা! কার গায়ত্রী? দেবতার বরণীয় শক্তিতে তার সংশয়। কোথায় যজ্ঞ-পুরুষ? হোমাগ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য রেখে সে দেখেছে—নীললোহিত অগ্নিশিখা অগ্নিশিখাই মাত্র। যজ্ঞপুরুষের কল্পনা অনুমান।

গম্ভীরকণ্ঠে বৃহস্পতি বললেন, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত অতীত হয়ে যায়। ওই দেখ, পূর্বদিগন্তে প্রত্যূষেব পূর্বাভাস। যাও, শুচি-স্নান করে এস।'

নিশ্চল চার্বাক, যেন নিশ্চল একখানি কোমল কচি দার্ঢ্য, যেন অচল বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ। অহীনদ্যুতি নয়নে দৃঢ়তাব্যঞ্জক দৃষ্টি। অকম্প্রকণ্ঠে সে বলে, 'আমি বিশ্বাস করি না গায়ত্রী মন্ত্র, হোমাগ্নিতে হিরণ্ময় পুরুষের আবির্ভাবে আমি আস্থাহীন।'

কি বলছে এই বালক! জড়তাহীন কণ্ঠ, দ্বিধাহীন উক্তি। দেবগুরুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেবশক্তিতে সংশয় প্রকাশ করছে এক অর্বাচীন শিশু! শিশুর মত তো কথা নয় তার? বিস্ময়ে হতবাক্ হন সুরগুরু। কোপ নয়নে নয়, অমৃত নয়নে

তিনি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকেন সেই চারু নয়ন-শোভিত চারু অঙ্গের প্রতি। কে এই বালক! কার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তাঁরই অন্তরের গোপন এক প্রত্যক্ষ সত্যের অনুভূতি? ধীরে প্রশ্ন করেন তিনি, 'দেবতায় বিশ্বাস নেই তোমার?'

দৃঢ়স্বরে বলে চার্বাক, 'পরোক্ষ সত্যে বিশ্বাস নেই আমার। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যক্ষ এই ভূস্বর্গ, বিশ্বাস করি—আপনার মত প্রত্যক্ষ দেবতায়। যদি এমন কোন শাস্ত্র থাকে, যা এই জগতকে ভালবাসতে শেখায়, আমায় তাই উপদেশ করুন।'

নিষ্ঠাবান আস্তিক বৃহস্পতি। বালকের এই নাস্তিকতায় ক্রুদ্ধ হলেন না, ক্ষুব্ধও হলেন না। স্বীয় অন্তরের রহস্যময় জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি এই বালকের ওপর তিনি নিঃশেষে ঢেলে দিলেন হৃদয়ের স্নেহভাণ্ড। সুরগুরুর আশ্রমেই শিষ্যরূপে আশ্রয় পেল চার্বাক।

আশ্রমের অন্যান্য বালক থেকে পৃথক ছিল তার আবাস। সহস্র সশঙ্ক কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্র সে—স্বতন্ত্র। তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও পৃথক। না ছিল কঠোর কর্মের বন্ধন, না ছিল গুরু দায়িত্ব। কঠিন ব্রহ্মচর্যের পথে তার তপশ্চর্যা নয়। তাকে ব্রতভিক্ষা করতে হয় না, ধারণ করতে হয় না বল্কল। তার পরিধেয় কার্পাস বস্ত্র বা চীনাংশুক। আহার-বিহারেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলমূল আতপান্ন নয়, চার্বাকের রাজসিক আহার।

মুক্ত বিহঙ্গের মত ইচ্ছাপক্ষ বিস্তার করে চার্বাক ভ্রমণ করে আশ্রমে, অরণ্যে। সে হৃদয় পূর্ণ করে পান করে নিসর্গ-সৌন্দর্য। আশ্চর্য সুন্দর এই তুচ্ছ ধূলিকণা! কোথায় কোন্ সহকারে আলোকলতার বন্ধন, কোথায় কোন্ পুষ্পে কোন্ রঙ্গিলা প্রজাপতির সঞ্চরণ—সব তার কণ্ঠস্থ। বন-তটিনীর মত লীলাচঞ্চল তার জীবন প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা।

আশ্রমের বহির্ভাগে থাকেন স্নেহময়ী জননীর মত এক যোগিনী। তাঁর রহস্যময় জীবন চার্বাকের পরম বিস্ময়। কাঞ্চনদীপ্ত দেহবর্ণ, পরিধানে রক্তগৈরিক, আলুলায়িত কেশভার। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল! প্রদীপ্ত নয়নে স্নেহের তরলতা। মাতৃহারা হরিণ, ময়ূর, করভ-শিশুর তিনি ধাত্রী, যেন জীবধাত্রী জননী।

মধুর এই প্রীতির পৃথিবীতে চার্বাকের অত্যন্ত বিশ্রী মনে হয়, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের বর্ণগত ভেদজ্ঞান। ইনি ব্রাহ্মণ, উনি ক্ষত্রিয়, এ বৈশ্য—তাদের পৃথক পৃথক ব্রহ্মচারীর বেশ। শিক্ষার বিষয়, এমন কি আশীর্বাদের বচনটি পর্যন্ত স্বতন্ত্র।

শূদ্রের প্রতি আশ্রমবাসীর উন্নাসিক আচরণে মর্মাহত হয় চার্বাক। একপ্রকার অবয়ব, দেহে একই শোণিত প্রবাহ—তবু ওরা অস্পৃশ্য, বেদাধ্যয়নে বঞ্চিত। চিরকালের মূর্খত্বের চিহ্ন ওদের মুখে, চিরকালের অবজ্ঞার আতঙ্ক ওদের চোখে। শায়কবিদ্ধ বিহঙ্গমের মত চার্বাকের আহত হৃদয় অরুন্তুদ বেদনায় ক্রন্দন করে ওঠে। মানুষের অধিকারে এ-বঞ্চনা কার বিধান? একটা ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ প্রধূমিত হয় অন্তরে।

এই বিদ্রোহেরই একটি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল আশ্রমে, যেদিন চার্বাক ইচ্ছা করেই প্রবেশ করল সন্নিহিত শবরপল্লীতে। মৃগয়াজীবী শবর—ঋষির আশ্রমে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আশ্রমের বহির্দ্বারে তারা সেবার অর্ঘ্য রেখে যায়—শ্বেতলোধ্র, বদরীফল, গণ্ডারশৃঙ্গ—কখন বা ময়ূরপুচ্ছ, কৃষ্ণাজিন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু স্পর্শ করেন না তাদের। তারা নাকি অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ! অথচ চার্বাক লক্ষ্য করে—স্নেহশীলা যোগিনী নির্বিচারে ভ্রমণ করেন শবর-পল্লীতে, তাঁর মধুর হাসি মিলিয়ে দেন ওদের মাদল-ধ্বনির সঙ্গে। অন্ত্যজের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী তিনি।

চার্বাককেও আকর্ষণ করে শবরশবরীর মুক্ত জীবন, যেন আকাশে সঞ্চরমান মুক্ত কালো মেঘ। শবরী বালিকা—অঙ্গে সুঠাম স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ সুষমা, কণ্ঠে গুঞ্জাহার, কুটিল-কুন্তলে পিঞ্ছচূড়া। ওদের ভাষা বোঝে না চার্বাক, কিন্তু ওদের ঝঙ্কার-মুখর অনুকারধ্বনি শ্রুতিমূলে সুধা বর্ষণ করে। অনেকদিন সে ধরতে চেষ্টা করেছে, পারে নি। সর্পগতি ওদের চরণে, চঞ্চল প্রাণ-প্রবাহ ওদের দেহে। চকিতে চমক সৃষ্টি করে নিবিড় বনে অদৃশ্য হয়ে যায়। নির্জন অরণ্য স্পন্দিত হয় অদ্ভুত এক হাস্যতরঙ্গে।

সেদিন ধরে ফেলল সে, যেন হাতের মুঠোয় ধরা পড়ল ছোট্ট একটি নীলাকাশ! আয়ত কাজল নয়ন, চঞ্চল সভয় দৃষ্টি, বক্ষে ঘনশ্বাস! কি নাম? চার্বাক শুনেছিল, ওর নাম নন্দা। নন্দাই বটে। দেহ-রেখায় নন্দিত ঝরনার কিন্নরীলীলা। এ এক নূতন অনুভূতি! স্পর্শে সহস্র বিদ্যুতের তরঙ্গ একসঙ্গে নৃত্য করে চার্বাকের অঙ্গে। মোহময় আকর্ষণ ওই অয়স্কান্ত তনুদেহে।

তার অন্যমনস্কতার সুযোগে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল চঞ্চলা বন-হরিণী। চার্বাক দ্রুত ছুটতে উদ্যত হয়েছিল তার পশ্চাতে। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! নন্দা নয়, সম্মুখে সেই আনন্দ-ভৈরবী—ত্রিশূলধারিণী স্নেহময়ী জননী; নয়নে করুণাধারা, অধরে রহস্যময় হাসি! স্নেহস্নানে অভিস্নাত চার্বাক। এত সুন্দর, এত মধুর এই পৃথিবী!

আশ্রমে ছি-ছি রব উঠল। চার্বাক সম্পর্কে ধিক্কারে প্রকাশ্য গুঞ্জন উঠল নন্দীপুরে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শাসন-সীমা লঙ্ঘণ করে সে শবরীকে স্পর্শ করেছে। যজ্ঞহীন চার্বাক, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যও বোধ নেই তার। আশ্রমবটুদের মধ্যে চলল জল্পনা, নিক্ষিপ্ত হল বক্র কটাক্ষ। একজন বলল, 'নিশ্চয় আসন্ন ঘোর কলি, নইলে এমন করে কি লোপ পায় বর্ণাশ্রম ধর্ম?' কেউ-বা বক্র শ্লেষে বলল, 'দুরাচার বিতণ্ডাবাদী ধূর্ত! আবার বলে, আমরা সুশিক্ষিত!' কেউ-বা নাসিকা কুঞ্চিত করে মন্তব্য করল—'কাম এষ—এ-হল আদিমতম পশুবৃত্তি। আশ্রমে তো সুযোগ নেই তার, তাই বাছাধন গিয়েছেন শবরপল্লীতে।'

মন্তব্য শুনে বিমূঢ় হয়ে যায় চার্বাক। বিচারহীন এ কি কুৎসিত সমালোচনা! ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় অন্তর পূর্ণ হয়। পাণ্ডিত্যের এই কদর্য হীনতা? এরাই শম-দম-নিয়মাধীন ব্রহ্মচারী? ক্ষুব্ধচিত্তে চার্বাক আসে গুরু বৃহস্পতির কুটিরে—

'গুরুদেব!'

'কি চার্বাক?'

'শবর-কন্যা নন্দাকে স্পর্শ করেছি আমি।

'তাতে কি হয়েছে?'

'ওরা নাকি অস্পৃশ্য!'

প্রশান্ত হাস্যরেখা ফুটে ওঠে গুরুর আননে। তিনি বলেন, 'একই উপাদানে নির্মিত মানুষ। ক্ষিতি অপ তেজ-মরুৎ—চতুর্ভূতের সমষ্টি জীবদেহ। এতে ভেদজ্ঞান করে তারাই, যারা মূর্খ। তুমি কোন অন্যায় কর নি বৎস! মানুষ—মানুষ। এর চেয়ে বড় পরিচয় কিছু নেই।'

গুরুর বাক্যে মেঘের ছায়া কেটে যায় চার্বাকের। কি মুক্ত দৃষ্টি! কি উদার মনোভাব! স্বচ্ছ দর্পণের মত নির্মল হৃদয়! তবু আরও একটা পর্বতপ্রমাণ পুঞ্জিত অভিযোগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চার্বাক। ফুল্লযৌবনা শবরীর স্পর্শে যে নূতন অনুভূতি, তাকে কেন্দ্র করে আশ্রমবাসীদের যে কুশ্রী ইঙ্গিত—তা জানানো হয় না গুরুকে।

অন্তর্দ্রষ্টা ঋষি বৃহস্পতি। ক্ষুব্ধ নীরব অভিযোগের উত্তর ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে, 'সবই আমি শুনেছি,—বৎস! প্রকৃতির প্রথম স্পর্শে পুরুষদেহে যে নব পুলক-রোমাঞ্চ, তা তো মিথ্যা নয়। দোষেরও নয় এ-অনুভূতি। চিরন্তন এ সৃজন-চুম্বক। ভাগীরথীর উত্তাল প্রবাহের মত এ-আবেগ মত্ত দিগ্‌গজকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আবার এরই প্রভাবে সৃষ্টি মধুময় হয়ে ওঠে। অসত্য, অস্বাভাবিক

বলে যারা একে অস্বীকার করে, তারা ভণ্ড। ভণ্ডের কুতর্কে বিচলিত হয়ো না বৎস!'

অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হয়ে যায় চার্বাক। গুরু কি শিষ্যেরই দ্বিতীয় অন্তর? সার্থক তার জীবন, এমন গুরুর শিষ্য সে! পরম তৃপ্তিতে বেরিয়ে আসে চার্বাক। লোক-জীবনের এই গূঢ় সত্যের সংবাদ ভৈরবী ও নন্দাকে শোনাতে হবে।

সারাদিন চার্বাকের অবাধ স্বাধীনতা। নিশান্তে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে বৃহস্পতির আশ্রম কলমুখর হয়, চার্বাক তখন দিব্য আরামে নিদ্রার আরাধনা করে। কখনও কোলাহলে ঘুম ভেঙে যায়, বিরক্ত হয় চার্বাক। কি নির্বোধ এই তাপস, যাজ্ঞিক! যজ্ঞ থেকে নাকি পর্জন্যের সম্ভব! ইন্দ্র নাকি পর্জন্যের অধিদেবতা! স্বাভাবিক কারণেই মেঘ বারিবর্ষণ করে। তার জন্য ইন্দ্রযাগের প্রয়োজন কি? কে এই ইন্দ্র? যজ্ঞাগ্নিতে মিথ্যা হবির অপব্যবহার। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি না দিয়ে মূর্খেরা যদি ঘৃত সেবন করত—তাহলে পুষ্ট হত ওদের শীর্ণ দেহ, সুস্থ হত বিকৃত মস্তিষ্ক।

নিজের মনেই বিচার করে চার্বাক। আত্মা আর পরলোকের চিন্তায় এরা অবসর নষ্ট করে। অনুমানে ভ্রান্ত জগৎ। দেহের অতিরিক্ত আত্মা কোথায়? পুং-প্রকৃতিযোগে শুক্রশোণিতে দেহের জন্ম; চতুর্ভূতের সংযোগে মদে মাদক-শক্তির ন্যায় চৈতন্যের আবির্ভাব। যতদিন দেহ, ততদিন চৈতন্য। তবু এরা ভাবে, মৃত্যুর পর দেহ থাকে, চৈতন্য থাকে। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'—তাহলে তো দগ্ধ বৃক্ষেও ফলোৎপত্তির কল্পনা করতে হয়।

উত্তেজিত হয়ে ওঠে চার্বাক! জীবনযুদ্ধে পরাঙ্মুখ ধূর্ত ব্রাহ্মণের অবাস্তব কল্পনায় কোন্ পথে চলেছে বিচার-মূঢ় মানুষ! মিথ্যা এই প্রত্যক্ষ দেহ? মিথ্যা এই সংসার? চার্বাকের ইচ্ছা হয়, বেদ-ব্রাহ্মণকে সে ভস্মসাৎ করে।

ভৈরবীর কথা মনে করে ঈষৎ শান্ত হয় সে। ভৈরবী আস্তিক, রহস্যময় তাঁর সাধন। তিনি বলেন, 'দেহের মত দুর্লভ সামগ্রী ত্রিভুবনে অন্য কিছু নেই; তিনি বলেন, 'ন গৃহং বন্ধনাগারম্'। সংসার মিথ্যা নয়, ভোগদেহ মিথ্যা নয়। দেহতত্ত্বের সাধন কর, ত্রিভুবনকে ভালবাস।' কি জ্যোতির্ময় দুটি নয়ন! কি স্নেহপূর্ণ মধুক্ষরা বাণী! শ্রদ্ধায় আনত হয় চার্বাকের মস্তক।

শয্যা ত্যাগ করে ওঠে সে। অতিক্রান্ত প্রভাতবেলা। সূর্যরশ্মিপাতে আলোকিত পৃথিবী, যেন শুচিস্নাতা পতিব্রতা। কি সুন্দর তার নয়ন-মোহন

রূপ! হায়, মূর্খ মানুষ এই রূপ-রস হৃদয় পূর্ণ করে পান করে না। প্রত্যক্ষ সত্য এই ভোগ, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এই সুখ। মানুষেয় আসক্তি মরীচিকার প্রতি। হায় রে বিরক্ত নিবর্ত সাধক!

অবশ্য এ সকলই গুরু বৃহস্পতির বাক্য, যাকে লোকে বলে 'বার্হস্পত্য দর্শন'। দিনমানে গুরু ব্যস্ত থাকেন আশ্রমিক পর্বে। সন্ধ্যাকালেও অবসর নেই তাঁর। কিন্তু গভীর নিশীথে যখন নিদ্রার উৎসঙ্গে আশ্রয় নেয় আশ্রম, বেদমন্ত্রের শেষ অনুরণন নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, তখন মধুখ প্রদীপের উজ্জ্বল দীপালোকে উটজাভ্যন্তরে মুখোমুখি বসেন গুরু ও শিষ্য—বৃহস্পতি ও চার্বাক; বৈদিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের দুই জ্বলন্ত প্রতিবাদ। বৃহস্পতি তখন সুরগুরু নন, যেন কপট অ-সুরগুরু—ঘোর সংশয়বাদী, ঘোর নাস্তিক। অনুমান-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিনাদিত হয় তাঁর রোষাকুল সুগভীর কণ্ঠ:

'ন স্বর্গো নাপবর্গো নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥'

চার্বাক তখন পূর্বপক্ষ করে, 'স্বর্গ, নবক, আত্মা, পরলোক যদি মিথ্যা হয়, যদি মিথ্যা হয় বর্ণাশ্রম, ক্রিয়াযজ্ঞ—তাহলে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ক্রিয়া করে কেন?'

ক্রোধে আরক্ত হয়ে বলেন অমিততেজা বৃহস্পতি, 'ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ'—ত্রিবেদের কর্তা ভণ্ড, ধূর্ত, বাক্ষস। অবোধ সন্তানকে মোদকের আশা দিয়ে যেমন ছলনা করেন অনেক অভিভাবক, তেমনই স্বর্গ-নরকের মিথ্যা বাক্য দিয়ে নির্বোধ যজমানকে প্রতারণা করে এই স্বার্থলোভী ধূর্তের দল। শ্রাদ্ধ-তর্পণের নির্দেশও ওদের। হা রে মূর্খ, 'নির্বাণ-দীপে কিমু তৈলদানম?'—শ্রাদ্ধেই যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি, তাহলে বিদেশগামী পথিককে পাথেয় না দিয়ে গৃহে বসে শ্রাদ্ধ করলেই তো তার ক্ষুধা নিবৃত্তি হতে পারে! যজ্ঞে পশু বলি দিলে যদি পশুর মুক্তি হয়, যজমান নিজ পিতাকে বলি দেয় না কেন?'

আক্রোশে গর্জন কবতে থাকেন লোকায়ত বৃহস্পতি। উৎসাহিত হয়ে চার্বাক প্রশ্ন করে, 'তাহলে পুরুষার্থ কি? মোক্ষ কি?

উত্তর করেন গণপতি আঙ্গিরস, 'সুখমেব পুরুষার্থঃ, কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ। —প্রত্যক্ষ গোচর সুখ, ইন্দ্রিয়জ ভোগের সার্থকতাই পুরুষার্থ। চেয়ে দেখ লোকসিদ্ধ রাজার জীবন, ধরাতলে মূর্তিমান ঈশ্বর—যেমন ঐশ্বর্য, তেমনি ভোগ।

এই রাজোচিত ভোগই কাম্য। 'ভূমিবার্যনলানিলাঃ'—চতুর্ভূতের সমষ্টি দেহ। দেহই আত্মা! দেহের সুখেই আত্মার সুখ। দেহোচ্ছেদে মৃত্যু। এই মৃত্যুই মোক্ষ। যতদিন মোক্ষ না হয়, বাঁচার মত বাঁচ, জীবনে সুখ-সম্ভোগ কর, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।'

চার্বাক প্রতিবাদ করে, বিশুদ্ধ সুখ জগতে কোথায়? সুখের অন্তরায় দুঃখ, যেন মৃণালে কণ্টক। দুঃখে মিশ্রিত এই সুখভোগে আগ্রহ হবে কেন?'

সিংহগর্জনে উত্তর করেন লৌক্য বৃহস্পতি, 'হা রে অর্বাচীন, দুঃখ-মিশ্রিত বলে যারা সুখকে পরিহার করে, তারা পশুবৎ মূর্খ। মৎস্য কণ্টক ও শল্কযুক্ত বলে যারা মৎস্য ভোজনে বিরত হয়, তারা নির্বোধ। শোন বৎস, সুখের সঙ্গে কিঞ্চিৎ দুঃখ মিশ্রিত থাকেই। 'দুঃখভয়াৎ ন অনুকূলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম।' পুরুষকার দিয়ে দুঃখকে জয় করতে হবে, অর্থ দিয়ে আহরণ করতে হবে কাম্য সুখ। অর্থ অর্জনের সময় মনে রাখবে, জরা নেই, মৃত্যু নেই—আছে শুধু এক লক্ষ্য—'অর্থকামৌ পুরুষার্থৌ।' সকল সত্যের চরম এই সত্য—জগৎ দুঃখময় নয়, অনন্ত সুখের নিলয় ধরণী।'

পরিতৃপ্ত হয় চার্বাক। ধ্রুবতারার মত প্রত্যক্ষ, সত্য মনে হয় গুরুর বাক্য। কথায় কি তেজ! যেন অনুভূত সত্যের বাঙ্ময় প্রকাশ। গুরুর চরণে প্রণাম করে যখন বাইরে আসে 'সুশিক্ষিত' চার্বাক, তখন রজনীর মধ্যযাম অতীত হয়ে যায়। নিস্তব্ধ চরাচর, নীরব ঘনকৃষ্ণ রাত্রির আকাশতল। ঊর্ধ্বে সহস্র নক্ষত্রের সভা। উদ্যান-পুষ্পের মত কাঞ্চনবর্ণা তারকারাজি। ওরা রাতের ফুল। কি বিচিত্র এই ভূলোক! লোকচক্ষুর অন্তরালেও এত শোভা এত আনন্দের আয়োজন আর কোথায়? সুন্দরী ধরণী, প্রাণময়ী নন্দা, স্নেহময়ী ভৈরবী। অন্তঃকর্ণে বাজে যেন গুরুর শেষ কথা কয়টি—'জগৎ দুঃখময় নয়, অনন্ত সুখের নিলয় ধরণী।'

একটি বিষয়ে সংশয় ঘোচে না চার্বাকের। যজ্ঞক্রিয়ার বিরোধী হলেও গুরুর আশ্রমে যাগ-যজ্ঞের এত বাহুল্য কেন? কথায় ও কর্মে কোথায় সামঞ্জস্য? গুরুর লোকায়ত দর্শন কি সত্যের উপলব্ধিজাত নয়? কতদিন মনে করেছে সে, এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে, প্রশ্নও করেছে। কিন্তু গুরু প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। এদিকে সমাপ্তপ্রায় চার্বাকের শিক্ষা। গুরুদেব বলেছেন, এবার জগতে প্রচার করতে হবে তাঁর দর্শন। কিন্তু যে সত্যোপলব্ধি থেকে দর্শনের উৎপত্তি, তা যদি অজ্ঞাত থাকে, চার্বাক প্রেরণা পাবে কোথা থেকে?

সেদিন সন্ধ্যার ছায়ায় বনান্তরালে দাঁড়িয়েছিল চার্বাক—প্রশ্নব্যাকুল হৃদয়। অদূরে চলেছে আশ্রমবটুদের আলোচনা, আস্ফালন, পাণ্ডিত্যের দম্ভোক্তি, পরচর্চা। সহসা সে শুনল, প্রসঙ্গ উঠেছে তাকে নিয়েই। উৎকর্ণ হল চার্বাক।

একজন বলছে, 'ওহে, সুশিক্ষিত চার্বাকের ভালই শিক্ষা' হয়েছে। পাষণ্ডকে পাষণ্ড ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন গুরু। চার্বাক হল পাষণ্ড পণ্ডিত।' আর একজন বলল, 'মূর্খ বিচার করল না, বৃহস্পতি সুরগুরু—স্বর্গের পুরোহিত। তিনি নাস্তিবাদার্থ শিক্ষা দেবেন কেন? সুর ও স্বর্গ যদি মিথ্যা, সুরগুরু নামটাও অলীক!'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে আর একজন বলে উঠল, 'নির্বোধ বোঝেও না কিছু, জানেও না কিছু। ইন্দ্রের প্রার্থনায় দেবগুরু এ দর্শন রচনা করেছিলেন দানব মোহনার্থ। 'ইন্দ্রস্য অভয়ায়, অসুরানাং ক্ষয়ায়' এর সৃষ্টি। সেই দর্শন তিনি বেছে বেছে শিক্ষা দিয়েছেন গণ্ডমূর্খকে।'

উত্তেজিত হয়ে ওঠে চার্বাক। গুরু কি তাহলে কপটতা করে তাকে কপট শিক্ষা দিয়েছেন? দানব-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে সে? দ্রুতপদে সে অগ্রসর হয় গুরুর কুটিরের দিকে। অন্তরে অশান্ত বিক্ষোভ-প্রশ্ন! আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলেও কি সেই প্রশ্ন?

কুটির প্রাঙ্গণে পদচারণ করছেন দেবাচার্য বৃহস্পতি। দীর্ঘদর্শন সৌম্যশান্ত, ঊর্ধ্বাকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি তাঁর নয়নে। সত্যকে কি গোপন করেছেন সত্যদ্রষ্টা? ত্বরিতে সোজা প্রশ্ন করল চার্বাক, 'যে লোকায়ত দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন আমায়, তা কি আপনার পরীক্ষিত সত্য? সত্য কি আপনার অর্থশাস্ত্র?'

গভীর রাত্রি। কার ইঙ্গিতে যেন কোলাহল-মুখর বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেছে। কুটিরের দ্বারপথে বিচ্ছুরিত আলোর ম্লান দীপ্তি গুরুর মুখে। শিষ্যের প্রশ্নে একটু বিব্রত বোধ করেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করে প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'নির্বিশেষ নিরঞ্জন সত্যের মুখ কে দেখেছে, বৎস! 'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্?' জগতে যেমন অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ নেই, তেমনি নেই নির্বিশেষ সত্য বা মিথ্যা। সংশয় পরিত্যাগ কর। যা শিখিয়েছি, সেই শিক্ষাকে ধ্রুব বলে গ্রহণ কর।'

'আমি গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু লোকে বলে—

'কি বলে বৎস।'

'বলে, গণপতি বৃহস্পতির লোকায়ত দর্শন কপট দর্শন। বেদ-বিরোধী এ দর্শন মিথ্যা—দানব ও অসুরকে বিভ্রান্ত করার একটা অপকৌশল।'

নীরব হয় চার্বাক—একটু নীরব থাকেন বৃহস্পতি! তারপর ধীর-গম্ভীর স্বরে তিনি বলেন 'লোকে একথা বলতে পারে চার্বাক, কারণ, এর পৌরাণিক প্রমাণ রয়েছে। ইন্দ্রের প্রার্থনায় আমি এই মতবাদ বীর্যবান রজিপুত্রদের নিকট প্রচার করেছিলাম। রজি ছিলেন মহাপরাক্রান্ত নৃপতি। তাঁরই পুত্রদের বিক্রমে স্বর্গভ্রষ্ট ইন্দ্র অতি কাতরভাবে আমার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেছিল। সে যে কি কাতর প্রার্থনা!—চমকে উঠলাম আমি। এই ইন্দ্র? স্বর্গের অধীশ্বর?—তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলাম, বেশ, এর প্রতিকার করব আমি। তারপর আমার এই অর্থশাস্ত্র রজিপুত্রদের নিকট প্রচার করেছিলাম। তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল, পরাজয়ও হয়েছিল তাদের। দেবতাদের অনুরোধে শুক্রাচার্যের অনুপস্থিতিতে ছদ্ম শুক্রাচার্যের বেশ ধারণ করে আমি দানবদের কাছেও এই শাস্ত্র প্রচার করেছিলাম। তার ফলে দানবেরাও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল। দৈত্যপ্রধান অরুণ ছিল গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসক—ত্রিভুবনে অজেয়। আমারই হেতুবাদে সে গায়ত্রীমন্ত্র ত্যাগ করে হীনবীর্য হয়েছিল। বহুবার এই দর্শন দানব-অসুরদের বিভ্রান্ত করেছে—তাই লোকে প্রচারিত হয়েছে, দেবাচার্য বৃহস্পতি দানব-মোহনার্থ এই লোকায়ত দর্শন রচনা করেছেন।'

'তাহলে সত্যি এ পাষণ্ডের শাস্ত্র?'—ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধ্বনিত হয় যৌবনের অভিযোগ: 'পরম সত্য থেকে বঞ্চিত করে আপনি কেন মিথ্যা অর্থবাদ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন? কেন এক সরলমতি শিশুকে ছলনা করেছেন আকাশ-কুসুমের, স্বপ্ন দিয়ে?

"অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষাৎ
মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
তদা কঃ সত্যবক্তা স্যাৎ
রাজসস্তামসঃ পুনঃ॥

সুরগুরু যদি মিথ্যাবাদী, তাহলে সত্যবাদী কে? পরম সাত্ত্বিক হয়েও তাঁর যদি এই ছলনা, তবে অন্যের মৃষাভাষণে দোষ কি?'

উত্তেজিত চার্বাককে শান্ত করতে চেষ্টা করেন বৃহস্পতি। তাকে স্পর্শ করে ধীরকণ্ঠে বলেন, 'মিথ্যা অভিমান করো না বৎস! তুমি উপযুক্ত বলেই জীবনের এক অনুভূত সত্যকে তোমার কাছে তুলে ধরেছি। যে-কোন দর্শনই হোক, জীবনের সত্য উপলব্ধি থেকে তার জন্ম না হলে, কোন যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিমানকে তা আকর্ষণ করতে পারে না। দানব বিরোচন, মহর্ষি জাবালি, রজিপুত্র বা দৈত্য অরুণ মূর্খ

ছিলেন না বৎস! তাঁদের মত ধীমানদের যে দর্শন মুগ্ধ করে, তা মৃষাগর্ভ বাকচাতুরি মাত্র নয়। চন্দ্র-স্থর্যের মত প্রত্যক্ষ জন্ম-মৃত্যুর মত সত্য আমার দর্শন। এ দর্শন দুঃখী মানুষকে বিশ্বের আনন্দ-নিকেতনে আনন্দ-আস্বাদনে আহ্বান জানায়। একে ভুল বুঝে কেউ যদি বিপথে চালিত হয়, সে দোষ দর্শনের নয়, দ্রষ্টারও নয়। একই কুসুম থেকে উর্ণনাভ আহরণ করে বিষ, মধুমক্ষিকা সঞ্চয় করে মধু। যার উর্ণনাভ-বৃত্তি সে বিষই সংগ্রহ করবে, যার মাধুকরী স্বভাব সে এ দর্শন দিয়ে রচনা করবে মধুচক্র।'

স্থরগুরুর মুখে কাঁপছে যেন রহস্যময় আলো-আঁধার। চার্বাক লক্ষ্য করে যেমন স্থর্যমণ্ডলে মুহূর্তে মুহূর্তে নানা রঙের খেলা চলে—নীল, সবুজ, লাল—তেমনি ঋষির আননে চকিতে ফুটে ফুটে উঠছে উদ্বেগ, ঘৃণা, ক্রোধ। গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, 'একই প্রকৃতিতে কখনও বসন্তের হাস্য, কখনও বর্ষার অশ্রু—একই মানুষ কখনও ধীর-গম্ভীর, কখনও লঘু-চপল। শুভাশুভ মিশ্রিত জগৎ, সুখ দুঃখ মিশ্রিত অনুভূতি। যে-কোন অবস্থায় মানুষের এক একটি বিরাট অভ্রান্ত উপলব্ধি হতে পারে। সে উপলব্ধি মিথ্যা নয়। সকলে জানে—বৃহস্পতি স্থরগুরু, পরম আস্তিক। কিন্তু, এই আস্তিক্যবুদ্ধি ও স্থরত্বের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুঞ্জিত হয়ে আছে—তা তো কেউ জানে না বৎস! সে বিক্ষোভ যে কি প্রচণ্ড, কি ভীষণ তার উন্মত্ততা—কেউ তা বোঝে না! তুমি বোধ হয় জান, তোমার গুরুপত্নী 'তারা' সোম কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিল?'

'শুনেছি সে কাহিনী।'

'কাহিনী শুনেছ, কাহিনীর মর্মসত্য বোঝ নি। সাধ্বী, সংক্রিয়াবতী আমার ভার্যা 'তারা'। একদিন পুষ্পাভরণে সজ্জিতা হয়ে আমারই উদ্যানে ভ্রমণ করছিল। ঠিক সেই সময়েই সে ওবাধপতি সোমের দৃষ্টি পথে পতিত হল। একে অম্লান পঙ্কজের মত রূপ, তার ওপর মনোহর অঙ্গসজ্জা। মুহূর্তে কামার্ত হল নিশাপতি, পাত্রাপাত্র জ্ঞানশূন্য হয়ে তারাকে হরণ করল। শুনেছি, আর্তস্বরে অনুযোগ অনুনয় করেছিল 'তারা', কিন্তু চেতনহারা চন্দ্র সে অনুনয়ে কর্ণপাত করে নি।'

উচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠ ক্ষণেকের তরে নীরব হয়। সংযত হয়ে আবার বলেন স্থরগুরু, 'তারা অপহৃতা হল। দেবতার দুয়ারে আমি অভিযোগ করলাম। মর্মাহত হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। চন্দ্রকে অনুরোধও করলেন তাঁরা। কারও কথা শুনল না সকাম সোম। সোমের বিরুদ্ধে সজ্জিত হল স্থর-চমূ—ঐরাবতে ইন্দ্র, শ্বেতাশ্বে ধর্ম, দিব্যরথে কুবের-বরুণ নাগবাহনে অনন্ত, মহিষপৃষ্ঠে স্বয়ং যম

ত্রিলোকের ধারণা, অপরাজেয় সুর-শক্তি। কিন্তু আমি বুঝেছি বৎস, সুরের শক্তি-কল্পনা দুর্বল স্তাবকের। শক্তিহীন দেববীর্য। যেমন নিঃসার শারদীয় মেঘ, তেমনই নিঃসার দৈবশক্তি। কে বলে, মানুষের ভাগ্যবিধাতা দেবতা?—মিথ্যা কল্পনা। ভাগ্যের নির্মাতা স্বয়ং মানুষ। অপরাজেয় পুরুষকার। 'দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।'

সুরগুরুর নয়নে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সরোষে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন আকাশস্থ সোমপ্রিয়া নক্ষত্র-সঙ্ঘের প্রতি। ক্ষুব্ধ আক্রোশ যেন অস্থির করে তোলে তাঁকে। হতবাক্ চার্বাকের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণিত হয় গুরুর কণ্ঠ, 'দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।' সেই তন্ত্রীতে কঠিন আঘাত হেনে বলেন বৃহস্পতি, 'ভেবেছিলাম, যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়া হয়তো নিষ্ফল নয়। তারাকে সোম-কবলমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শ্যেন যাগ করেছি, প্রয়োগ করেছি আভিচারিক মন্ত্র। ব্যর্থ হয়েছে সব। তাহলে কি ফল যজ্ঞে হবি-হবনে?—ভস্মে ঘৃতাহুতি; কি ফল মারণ-উচ্চাটন ক্রিয়ায়?—নিষ্ফল ক্রিয়াকলাপ; কি ফল বেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণে?—শক্তিহীন মন্ত্র। বৈদিক কর্মমীমাংসা লোভাতুর, ধূর্ত ব্রাহ্মণের রচনা।'

উত্তেজিত তপোধীর বৃহস্পতি। রুদ্ধ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন তাঁর কণ্ঠে, যেন পাষাণরুদ্ধ বেগবতী স্রোতস্বতী। স্রোতস্বিনী বাধামুক্ত হয়, তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় যেমন মিথ্যা মনে হয়েছিল যজ্ঞক্রিয়া, তেমনি একটি রূঢ় সত্য অনুভব করেছিলাম—অবার্যবীর্য কাম। অনাদি নিত্য কামনা—অনিরুদ্ধ তার গতি। বিশ্বে শাশ্বতী নারী-পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা। সোম কামনাবশে তারাকে অপহরণ করেছিল। কিসের অভাব ছিল তার? সপ্তলোকের রসাধার সোম, সপ্তবিংশ নক্ষত্র তার পত্নী। তবুও কামতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নি তার। অনঙ্গমোহে মোহিত মহীতল। এ বিষয়ে সোমই কেবল অপরাধী নয়, 'তারা'কেও নির্দোষ বলা চলে না। তারারও অন্তরে প্রসুপ্ত ছিল লালসা, মোহিনী নিজেও মোহিতা হয়েছিল চন্দ্রের কান্তিচ্ছটায়। মুখে সে বলেছিল, 'ত্যজ মাং ত্যজ মাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুলঃ'—কিন্তু 'সাপি স্মরার্তা।' নইলে কে কোথায় শুনেছে বৎস, অকামা নারী উগ্র কামনার গ্রাসে আত্মসমর্পণ করে? পলায়ন করে না, প্রাণত্যাগ করে না? বিষাঙ্গুরীয় কি তার হাতে ছিল না? শুনেছি, সোমসহ সে বিহার করেছে রম্যশৈলে, পিকোক্ত পুষ্পোদ্যানে, মলয়ে মলয়ারণ্যে, ত্রিকূটে, বিন্দু-সরোবরে। অকামা নারীতে এত ভোগ সম্ভব?'

স্তম্ভিত চার্বাক। কামনার একি দুরন্ত, কুটিল গতি! তাকে অধিকতর

বিস্মিত করে বলেন যাচস্পতি বৃহস্পতি, 'এই শাশ্বত কামনা থেকে আমিও মুক্ত নই বৎস।'

'আপনি!'—আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করে চার্বাক। তার চোখে অন্ধকারের ওপর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বৃহস্পতি বলে চলেন, 'সকাম সোম, সকামা তারা। কি মোহময় আকর্ষণ কামনার! তারাকে পরগৃহীতা জেনেও, আমি তো তার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারি নি। অনঙ্গ-তপ্ত হয়ে তাকেই কামনা করেছি, ক্ষুধিত ভিক্ষুকের মত ভিক্ষার্থী হয়ে সোমের দুয়ারে গিয়ে তাকে যাচ্ঞা করেছি!'

সত্যমূর্তি ব্রহ্মণস্পতি বৃহস্পতি। কোন কথাই তিনি গোপন করেন না। সত্যের শিব-সুন্দর মুখকে তিনি শিষ্যের নিকট উন্মোচন করেন, বলেন, 'শুধু তাই নয়। মাত্র নিজের ভার্যার প্রতিই আসক্ত হই নি আমি। আমি জানি, এ ব্যভিচার, এ অসামাজিক—তবু স্বীকার করি, অনাদি অনিরুদ্ধ কামনার কবল থেকে মুক্তি নেই কারো। গভীরভাবে মর্মে মুদ্রিত হয়েছিল এ সত্য, যেদিন প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে চঞ্চল আমি। প্রাণের উন্মাদ নৃত্য শিরায় শিরায়। নয়নের রাগে রাগ-রঞ্জিত ভুবন। সেই ভুবনে মূর্তিমতী ভুবনমোহিনীর রূপে উদিত হলেন জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ উতথ্য-পত্নী অন্তর্বত্নী দেবী 'মমতা'—মমত্বে ভরা হৃদয়-ভাণ্ড, চারুত্বে ভরা অঙ্গ-সুষমা। পরিধানে রক্তাম্বর, কণ্ঠে রত্নমালা, ভালে রক্তসিন্দূর, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তোদ্যুতি কামনার রক্তকমল! কে ভুলাল আমায়? কে আকর্ষণ করল আমায়? কার মায়ায় পরকীয়ার আশ্লেষে বিহ্বল, আত্মহারা হলাম আমি?—সে এই কামনা, জীব-হৃদয়ের চিরন্তন স্থায়ী ভাব-সত্য। এই কামনাই বিশ্ববাসীর পুরুষার্থ।'

নিস্তব্ধ চার্বাক! এই সত্যমূর্তি গুরুকে সে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করেছে! লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যায় সে। তাকে উদ্দেশ্য করে বজ্ররবে বলেন বৃহস্পতি, 'কিন্তু সাবধান চার্বাক, এ আগুন নিয়ে খেলা। শাশ্বতী কামনা—তার অর্থ এ নয়, কাম হবে সমাজ-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম: ভোগসুখই পুরুষার্থ—তার অর্থ এ নয়—ভোগী ভঙ্গ করবে বিশ্বের শান্তি। প্রজার প্রতিনিধি মর্ত্যের রাজাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—আমার দর্শনের আদর্শ। রাজার সম্মুখে অবারিত ভোগ-পাত্র, কিন্তু তাঁর হাতে দণ্ড। তিনি দণ্ডধর। এই দণ্ড স্বেচ্ছাচারের মহাভয়, 'দণ্ডো রক্ষতি ভূতানি দণ্ডঃ পালয়তে প্রজাঃ'। পুরুষার্থ-সম্ভোগে এই দণ্ড যেন হস্তচ্যুত না হয়।'

বজ্ররব নরম হয়, ধীরভাবে বলেন গণপতি বৃহস্পতি, 'জীবনে অনুভূত এই

প্রত্যক্ষ সত্য থেকেই আমার দর্শনের জন্ম। যুগ যুগ ধরে 'লোকেষু আয়তঃ 'এই দর্শন, তাই এর নাম 'লোকায়ত দর্শন'। দানবমোহন নয়, লোক-কল্যাণই এর লক্ষ্য। সুন্দর এই পৃথিবী, সুন্দর এই মানুষ! মিথ্যা দিয়ে একে মলিন করো না, সত্যের আলো দিয়ে একে আলোময় কর। মধুময় সুখে ভরা নিখিল বিশ্বের হৃদয়-ভাণ্ড। শিল্পীর মত রুচিসম্পন্ন হয়ে, রাজার মত দণ্ডধর হয়ে এই সুখ সম্ভোগ কর। মধুকরের মত মধু দিয়ে রচনা কর সুখের মধুচক্র।'

নীরব হলেন বৃহস্পতি। তখন রজনীর শেষ যাম। পূর্বাকাশে সমুদিত অতি-উজ্জ্বল শুকতারা। চার্বাকের মনে হয়, আনন্দলোকের দূত ওই শুকতারা যেন বৃহস্পতি-বাক্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। তারও পরে দিক্-সীমান্তে সুশুভ্র এক জ্যোতির্লেখা—তাতে যেন সিতাক্ষরে মুদ্রিত বার্হস্পত্য দর্শনের সূচিপত্র—'সুখমেব পুরুষার্থঃ'।

বিশ্বভুবনে গুরু বৃহস্পতির উদ্দেশ্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিল চার্বাক। তারও সাধের স্বপ্ন—অসুন্দরের হাত থেকে মুক্ত করে সে সুন্দর ধরণীকে সুন্দরতর করবে; মিথ্যায় বিভ্রান্ত জগতে প্রত্যক্ষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে জগতকে সে যুক্তিহীন বিচারের কবলমুক্ত করবে; দিশাহারা মনুষ্যকে সে দেখাবে সুখময় আলোকের পথ। সেদিন বিশ্বে অসাম্য থাকবে না, থাকবে না অস্পৃশ্যতা; স্বার্থপরতার ক্লিন্নতা থাকবে না, থাকবে না লোভীর শোষণ। প্রেমপূর্ণ ধরায় সকল মানুষ হবে প্রেমিক, দুঃখের ঘরে জ্বলবে সুখের আনন্দদীপ। সুখ সম্ভোগই হবে পুরুষার্থ, কিন্তু সে ভোগ স্বৈরাচার নয়: সুশিক্ষিত চার্বাক—সুশিক্ষায় সংযত, শিল্পীর মত সৌন্দর্য সম্ভোগই হবে তার লক্ষ্য।

কিন্তু তাকে ভুল বুঝলেন আস্তিক ধার্মিক, ভুল বুঝল দানবধর্মী মানুষ। আচমনীয় জলে চার্বাকের সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব তরুণ তাপসকে সন্ধ্যার মন্ত্র ভুলিয়ে দিল। তার্কিক বৈদান্তিক, সাংখ্যযোগী, নৈয়ায়িক ছুটে এলেন তর্কাস্ত্র নিয়ে, 'বেদ-বিরোধী এ শাস্ত্র—অশাস্ত্র, এ সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল।'

হৃদয়ে সত্যের বল নিয়ে, যুক্তিনিষ্ঠ বিচার নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল চার্বাক—'এ অশাস্ত্র নয়, বিশ্বমানবের আদি দর্শন, বিশ্বকে সত্য-সুন্দর করে তোলার সাধনা।'

'এ বিশ্বকে ধ্বংসের মুখে তুলে দেওয়ার কৌশল'—কুটিল ভ্রূকুটি করে উঠলেন যাজক ব্রাহ্মণ: 'এ পাপ, এ অনাচার! অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে তোমায়।'

এ কি অভিশাপ! সত্যি এ কি হল জগতে! চার্বাককে কী ভাবে গ্রহণ

করল মানুষ! ওগো মানুষ ভাই, এ কী করলে তোমরা? সুখই পুরুষার্থ—কামই সুখ—দর্শনের এই মূল সূত্র দানবধর্মী মানুষকে মাতাল করে তুলল; 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' বাক্যের অনুসরণে ভয়ঙ্কর শোষণ মূর্তি নিয়ে জাগল মহামোহ, মহামদ; 'ন স্বর্গো নাপবর্গঃ' সূত্রের প্রতিক্রিয়ায় বহ্ন্যুৎসব শুরু হল জগতে।

সত্যি শুরু হল বহ্ন্যুৎসব। কামোন্মত্ত, মদান্ধের মত্ততায় কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নির প্রলয়শিখা প্রজ্বলিত হল। আকাশে সপ্তহেতি সূর্য, সপ্তপেতি সাগরে বিভীষণ বড়বা, মর্ত্যের বনে বনে সহস্রজিহ্ব দাবানল। সাগর-মেখলা সুন্দরী ধরণীর শ্যামাঞ্চলে আগুন!

আগুন! আগুন! সর্বগ্রাসী লেলিহ তার রসনা। কুটিব থেকে গৃহ, গৃহ থেকে অট্টালিকা জ্বলে উঠল; জ্বলে উঠল পল্লী, নগর, জনপদ, মহাদেশ। অগ্নি-জঠরে চণ্ড ক্ষুধার অগ্নিমান্দ্য। ত্রিলোক গ্রাস করেও ক্ষান্তি নেই, কোটি কোটি আর্ত মানুষের অশ্রু পান করেও তার শান্তি নেই। ক্রন্দনে পূর্ণ ধরণী, তপ্তশ্বাসে বিষাক্ত বাতাস। চতুর্দিকে 'হায় হায়' হাহাকার, চতুর্দিকে অভিশাপ।

অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত চার্বাক। এ অগ্নি তাকেই স্পর্শ করেছে, তারই দেহে লেগেছে এ আগুন। পাগলের মত এদিক ওদিক ছুটছে সে। তার চারু দেহ চমরীর মত কৃষ্ণবর্ণ, জটিল হয়ে গেছে কুটিল কেশ, নীল নয়নে মরুর মত রুক্ষতা—কণ্ঠে অনন্ত শুষ্কতা। তবু প্রাণপণে চিৎকার করছে সে, 'ওগো মানুষ, ক্ষান্ত হও—শান্ত হও। আমার কথা ভাল করে শোন।'

কেউ তার কথা শোনে না। হুঙ্কারে, গর্জনে, ক্রন্দনে, দীর্ঘশ্বাসে তুমুল কোলাহল। সে কোলাহলে মত্ত তুফানে তুচ্ছ তুলার মত চার্বাকের কথা কোথায় মিলিয়ে যায়। হায় চার্বাক-দর্শনের পরিণাম! হায় কল্যাণী ইচ্ছার দুর্গতি!

ভৈরব মূর্তি নিয়ে অগ্নিভীত চার্বাকের দিকে ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসেন রক্তচক্ষু তার্কিক, নৈয়ায়িক। বজ্ররবে গর্জন করে ওঠেন যাজক ব্রাহ্মণ:

'এ তোমার পাপের ফল! ধ্বংস হও, ধ্বংস হও তুমি!'

'তোমার চতুর্ভূতাত্মক দেহ চতুর্ভূতে বিলীন হোক।'

'কামনার অনন্দ অসূর্যলোকে মৃত্যুতে মোক্ষ লাভ কর চার্বাক।'

প্রচণ্ড বাগ্‌বজ্র। সম্মুখে, পশ্চাতে, ঊর্ধ্বে, অধোদেশে লেলিহান অগ্নিশিখা। চার্বাকের চোখে অন্ধকার, মস্তিষ্কে অসহ্য প্রদাহ। ঘোর উন্মাদের মত তবু সে শেষ

চেষ্টা করে, প্রলয় বহ্নির মুখে পাগলের মত এসে সে দাঁড়ায়। নিষ্ফল চেষ্টা।

আগুন জ্বলে—জ্বলে! তারই স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চার্বাকের দেহে। কম্পিত অঙ্গ, স্খলিত চরণ, ভূমিতলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে চার্বাক, যেন ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ে খাণ্ডব দাহে গাণ্ডীবি-বিদ্ধ বিহঙ্গম।

সহসা দেখা যায়, সুতীব্র বেগে ছুটে আসছেন সেই স্নেহশীলা যোগিনীর মত এক জননী মূর্তি—রক্তাম্বরা, এলায়িতকুন্তলা—তাঁর সিঁথায় রক্তসিন্দূর, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে সুদীর্ঘ ত্রিশূল। প্রাণপণে বলছেন তিনি, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে'—তাঁর নয়নে সহস্রধার অশ্রু। তাঁর পশ্চাতে পাগলিনীর মত ছুটে আসছে সেই অস্পৃশ্যা নন্দার মত একটি শবর-কন্যা—নব জলদের মত স্নিগ্ধশ্যাম. পরিধানে পর্ণবাস, চিকুরে পিঞ্ছচূড়া। তার কণ্ঠেও অমনি একটা দুর্বোধ্য কথা, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে।' তার পিছনে শায়ক-বিদ্ধ পাখির মত ছুটে আসছে দগ্ধ অঙ্গার সদৃশ কঙ্কালসার কোটি মানুষ—তাদেরও দাবি, 'চার্বাককে বাঁচাতে হবে।'

ওদের সকলের বেদনাঘন সজল চোখে—অনাগতকালের সুখময় সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন!*

* চার্বাকের উল্লেখযোগ্য কোন জীবনী নেই; জনশ্রুতি—চার্বাক দেবগুরু বৃহস্পতির শিষ্য। দেবাচার্য বৃহস্পতির উপাখ্যান গৃহীত হয়েছে দেবী পুরাণ (৪।১৩) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (কৃঃ জঃ খঃ ৮০-৮১ অঃ) থেকে। চার্বাক দর্শনের মূল সূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য (১) মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ।

(২) History of Philosophy Eastern & Western. Vol. I. Chap. vii.

(৩) চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

# ॥ দুর্ভগা ॥

প্রতপ্ত মধ্যাহ্নে মরুবক্ষে উত্থিত বিশুষ্ক ঘূর্ণির মত সে পথ চলে। অতি শুষ্ক, অতিশয় রুক্ষ দেহ—নাসায় নিদাঘ সূর্যের অগ্নিজ্বালা। সতত কম্পিত অঙ্গ, কম্পিত চরণ। নাভিতে, বক্ষে, কণ্ঠে ঘনশ্বাস। কালচক্রের অধিকর্তা কালের কন্যা। নাম তার দুর্ভগা।

সত্যি দুর্ভাগা দুর্ভগা। দুর্ভাগ্য তার আজন্ম সহচর। কালের অবৈধ সঙ্করণে তার জন্ম। জন্ম থেকেই বিশ্রী বিবর্ণ দেহ, জীর্ণ শীর্ণ—অতি কদাকার। মনে হয়, পেষণ-যন্ত্রে নিষ্পিষ্ট রসহীন ইক্ষুত্বক। কোটরগত চক্ষু, নিষ্প্রভ তার জ্যোতি। পলিত জটিল কেশ, স্খলিত দন্ত, লোলিত চর্ম। দেহও শক্তিহীন। পিতৃদত্ত একটা ত্রিবক্র যষ্টি ভর করে কুঁজো হয়ে সে পথ চলে।

যেমন আকার, তেমনি স্বভাব। কুটিল আচরণ, লোলাঙ্গে ক্রোধের অস্থির কম্পন। ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চির অসহিষ্ণু—নূতনকে কোন মতেই সহ্য করতে পারে না। যৌবনের প্রাণ-উন্মাদনা ওর চক্ষের বিষ। বসন্তে যখন প্রকৃতির বুকে সবুজ প্রাণের সাড়া জাগে, তখন ওর হৃদয় নিদাঘের তপ্তশ্বাস ফেলে; শরতে যখন ফোটে চন্দ্রিকা-স্নাত কুমুদ কহ্লার—তখন ও ভাবে শীতের ঘন কুহেলিকার কথা। নিজে রিক্ত, বিগতশ্রী—দুর্ভগার উল্লাস তাই রিক্ততায় আর শ্রীহীনতায়।

ক্ষুৎকাম, কামনা-বুভুক্ষু সমাজে তার জন্ম। দুর্দম ভোগেচ্ছা। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি তার জীবনে। চির অধবা দুর্ভগা। আপনার অনুরূপ পতি সে কামনা করেছে, পায় নি। ত্রিজগতে কাউকে আকর্ষণ করতে পারে নি সে। তার রুক্ষ, ধূসর, বীভৎস মূর্তি দেখে সকলেই শিউরে ওঠে। বন্ধ্যা নারীত্ব নিজের মধ্যে জলভ্রমির মত গুমরে মরে। ক্ষুব্ধ আক্রোশে দন্তহীন দন্তবেষ্ট দিয়ে সে ওষ্ঠাধর দংশন করে। সর্বাঙ্গে যেন বিস্ফোটকের জ্বালা।

যুগযুগান্তের অনন্ত নৈরাশ্যের ভারে নমিত দুর্ভগার দেহ। অঙ্গের অসংখ্য বলিত রেখা, ললাটের বহুকুঞ্চিত মাংসবলয় যেন সহস্র ভগ্নাশার স্বাক্ষর। রূঢ় প্রত্যাখ্যানের আঘাতে আঘাতে সে ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত ভোগবাসনার বহ্নিদাহে সে রুক্ষ। তিক্ত

স্মৃতির ভাণ্ডার তার হৃদয়। নিঃসীম শূন্যে অজস্র উল্কাপিণ্ডের মত, বিরাট শূন্যতায় ভরা হৃদয়ে সেই স্মৃতি জ্বালা হয়ে জ্বলে। উপেক্ষায়, উপহাসে, লাঞ্ছনায়, গঞ্জনায় জর্জর তার অস্থি-পঞ্জর।

কুরূপা সে, কালের অকাল সংক্রমণের ফল। কিন্তু আশা, আবেগ তারও ছিল। হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল প্রচণ্ড কামনা। হয়তো তা প্রেম নয়, হয়তো তা উদগ্র ভোগেচ্ছা সে দোষ তার নিজের নয়। বংশপরম্পরায় স্বভাবে সংক্রমিত দূষিত রক্তকণিকা তারই উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠেছিল সে। মিথুন-স্বভাব সমাজের চিরাচরিত নিয়মে ভ্রাতার নিকট কামনা নিবেদন করেছিল দুর্ভগা।

কালের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ মৃত্যু; কালের কৃতক পুত্র। লোক-সংহারক মহাভয়, জীবের জীবনান্তকারী—তার আর এক নাম অন্তক। প্রচণ্ড তার শক্তি। দুর্ভগা তার মধ্যে দেখেছিল নিজের প্রতিরূপ। মৃত্যু সর্বান্তক, দুর্ভগা সন্ত্রাস; মৃত্যু সর্বহর, দুর্ভগা নিদারুণ সন্তাপ। দুর্ভগার স্তিমিত-জ্যোতি নয়নে মৃত্যুর মহামেঘপ্রভ কৃষ্ণবর্ণ সুতীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করত, তার উৎকট লালসাকে উদ্দীপিত করত অন্তকের সংহারলীলা। লোলিত অঙ্গের বলিত রেখায় ব্রণের মত কাম-রোমাঞ্চ। সে ভাবত, সর্বহর এই মৃত্যুকে যদি জীবন-সঙ্গীরূপে পায়, সার্থক হয় তার জীবন।

উৎকট কামনার আবেগে একদিন সে এসে দাঁড়াল কালপুত্র মৃত্যুর প্রকোষ্ঠে। চিরনির্লজ্জা দুর্ভগা, কিন্তু আজ যেন কেমন সঙ্কোচ। বুকে অশান্ত উচ্ছ্বাস, রসনায় পাষাণ-জড়তা; মদনের মাদনবাণে সে উন্মাদ, কিন্তু শোষণবাণে শুষ্ক। তবু স্খলিত বচনে সম্মোহিতের মত সে প্রকাশ করল তার কামনা—নরের নিকট সকামা নারীর লজ্জোদ্ভিন্ন প্রথম অভিলাষ, 'রতিকাম আমি, আমার পতি হও তুমি।'

সম্মুখে সহসা সর্প দর্শন করে যেমন চমকে ওঠে মানুষ, দুর্ভগার কথায় তেমনি চমকে উঠল অন্তক। মৃত্যু নির্মম, কিন্তু আশ্চর্য তার নীতিবোধ। কামনার অসামাজিক রূপ দেখে শিউরে উঠল সে! কি কদর্য! লালসার নিকট তুচ্ছ নিয়মের শৃঙ্খলা, নীতির অনুশাসন? প্রথমে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হল তার আনন, পরমুহূর্তে ক্রোধের ত্রিবলি-কুঞ্চন দেখা দিল ললাটে। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে সে দমন করল রোষারুণ। দুর্ভগা কালকন্যা, আর সে কালের আজ্ঞাবহ অনুচর। যথাসম্ভব সংযত কণ্ঠেই বলল সে, 'একি বলছ দুর্ভগা! সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নী। নিয়মের রাজত্বে ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন অবৈধ। সমাজ-শাসন লঙ্ঘন করা অনুচিত।'

'মিথুন-সম্ভব সমাজে এ তো অনিয়ম নয়, অন্তক! স্বামী-স্ত্রীরূপে সহোদর সহোদরার মিলন সেখানে বিধি-সঙ্গত।'—নম্রকণ্ঠেই বলে কামমোহিতা দুর্ভগা।

ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যেতে চায়। শাস্ত্রবিদ্, নীতিধর মৃত্যু। গর্জন করে উঠতে চায় তার কণ্ঠ। দুর্ভগাও জানে, কৃতান্ত কালানুচর হলেও কামানুচর নয়। শাস্ত্রের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাই শাস্ত্রানুসারেই বলে দুর্ভগা, 'তুমি নীতিবিদ্, শাস্ত্র তোমার নখদর্পণে। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করা শাস্ত্রজ্ঞেরই কর্তব্য। রতিকাম আমি, আমাকে রতিদান কর।'

মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে দুর্ভগা। তার কুব্জ দেহ আরও নত হয়। শক্তকেও দুর্বল করে কাম। দুর্বলার মত কাতরকণ্ঠে সে বলে, 'আমি কামমোহিত, আমি আর্ত। আর্তকে রক্ষা করা ধার্মিকের ধর্ম। তুমি ধর্মধীর, আমাকে রক্ষা কর।'

দুর্ভগার বাক্যে ঈষৎ চঞ্চল হয় মৃত্যু। এ শাস্ত্র কোথা থেকে শিখল কালকন্যা? আজন্ম দুর্বিনীতা, দুর্নীতিপরায়ণা দুর্ভগা। তার মুখে আর্তত্রাণের নীতিবাক্য! কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝে অন্তক, বৈড়াল-ব্রতিক অধর্ম। ধর্মের ছদ্মবেশে সে প্রতারণা করে, নীতির মোহন মূর্তি ধরে ছলনা করে পাপাচার। তাই দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করল মৃত্যু, 'কামনায় ভ্রান্তবুদ্ধি তুমি। কদর্য লালসা-লিপ্সা পূর্ণ করার জন্যই তোমার শাস্ত্রের দোহাই। বিধাতার নিয়ম-বিচারের পদ্ধতি এ নয়।'

'নিয়ম!' দুর্ভগার মদবিহ্বল কণ্ঠে ব্যঙ্গ প্রধূমিত হয়, খুলে যায় দুষ্টার ছদ্ম আবরণ। কুঞ্চিত শুভ্র ভ্রূরেখা, ওষ্ঠে বক্রকুটিল শ্লেষ: 'কামনা নিয়ম মানে না অন্তক। তার আর এক নাম অনিরুদ্ধ, অ-নিরুদ্ধ তার গতি। ওগো নীতিধর, তোমার বিধাতাও এই কামনার অধীন হয়ে স্বীয় কন্যার পশ্চাৎ ধাবন করেন।'

শেষ হয় না দুর্ভগার উক্তি। বিধাতার প্রতি কটাক্ষে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে অন্তকের বিশাল কৃষ্ণ বপু। ললাটে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি, রক্তাক্তলোচনে বহ্নিদৃষ্টি, যুগাবসানের সংবর্ত মেঘের মত ক্রোধে গর্জন করে ওঠে সর্বহর মৃত্যু, 'আসঙ্গলিপ্সু ললনা তুমি, অতি অশ্লীল—জঘন্য তোমার ইঙ্গিত।'

চলে যেতে উদ্যত হয় তিক্ত-বিরক্ত অন্তক। বাধা দিয়ে বলে কামপ্রমত্তা কাল-কন্যা, 'রতার্থিনী আমি, আমাকে গ্রহণ কর।'

'অতি অভদ্র তুমি'—বিরক্তিভরে দৃপ্তকণ্ঠে বলে অন্তক। সুদীর্ঘ, বলবাহু দিয়ে সম্মুখের বাধা অপসারণ করতে চেষ্টা করে সে। উৎকট লালসা—ঘৃণ্য

আসঙ্গ-কামনায় আলিঙ্গন লিপ্সু হয়ে ছুটে আসে, যেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসে হিংস্র কামোন্মত্ততা। কামিনী যেন ক্ষুধিতা বাঘিনী। প্রাণপণ শক্তিতে তার আক্রমণ প্রতিহত করে ঘৃণায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় চলে যায় অমিত শক্তিধর, কামরিপু কালানুচর।

পুঞ্জিত রোষে ফুলে ওঠে দুর্ভগা। মৃত্যুশ্চর কালের নন্দিনী সে, কালকন্যা। আস্থংস্তে আবাল্য স্বেচ্ছাচারিণী। তিনশত ষাট সহোদর, তিনশত উনষাট সহোদরা তার স্বেচ্ছার দাস-দাসী। জীবনের প্রথম কামনা অন্তর মন্থন করে মহাতরঙ্গের মত উত্তাল হয়ে উঠেছে, উদ্দাম তার গতি, বিপুল তার আবেগ। সেই প্রোদ্দাম গতিমুখে কঠিন বাধা। নিজের মনেই গর্জন করে উঠল প্রত্যাহত লালসা। সম্ভোগের প্রথম কামনা, কালনাগিনীর শঙ্খধরার প্রথম অভিলাষ যে ব্যর্থ করেছে, তার ওপর শঙ্খবিষ ঢেলে দেবার জন্য উদ্যত হল শঙ্খিনী।

বিষোদ্গারে ত্রুটি করে নি বিষকন্যা। প্রমাদ ও মোহসৃষ্টিতে সে নিপুণা। সে প্রমাদ সৃষ্টি করেছে, মোহ সৃষ্টি করেছে—কিন্তু প্রমত্ত বা মোহিত হয় নি নির্মোহ মৃত্যু। কামোন্মত্তা উদগ্র কামনায় প্রয়োগ করেছে অথর্ববেদোক্ত আভিচারিক বিদ্যা। ব্যর্থ হয়েছে মন্ত্র। দুর্ভগার দুর্ভাগ্য, মৃত্যুকে সে স্বামী-রূপে পায় নি।

অভিচার মন্ত্রের অপাধারণ শক্তি, ত্রৈলোক্য-আকর্ষণকারী তার ক্ষমতা। কিন্তু প্রয়োগ কৌশলে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে মন্ত্রীকেই তা প্রত্যাঘাত করে। অতি ভীষণ ব্যর্থ মন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। দুর্ভগার ব্যর্থ আভিচারিক মন্ত্র তেমনি নিজের দুর্ভাগ্যেরই পরিপোষক হয়েছে। দুর্দম কামনা, আরও দুর্দম ব্যর্থ কামনার বেগ। একাকে না পেয়ে অন্যকে কামনা করে, সে কামনা ব্যর্থ হলে আরেক। এমনি করে সে ত্রিভুবনগ্রাসী হয়ে ওঠে। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—শুধু চাওয়া আর চাওয়া। মৃত্যুকে পতিরূপে না পেয়ে, তেমনি উন্মাদ হয়েছে দুর্ভগা। অতৃপ্ত কামনা অন্য পতিলাভে প্ররোচিত করেছে তাকে। অদম্য লালসা বিস্তৃত হয়েছে স্বর্গে দেবসঙ্ঘে মর্ত্যে মনুষ্যসমাজে, পাতালে দানবদলে। পতি খুঁজে পায় নি দুর্ভগা। বিকৃত, কদাকার তার দেহ—রূপহীনা জরতী: কুটিল তার গতি, অতি কুটিল প্রকৃতি। সর্বত্রই প্রত্যাখ্যান, গঞ্জনা, বিদ্রূপ। 'আমার পতি হও তুমি'—এই প্রার্থনা নিয়ে দুর্ভগা উপস্থিত হয়েছে স্বর্গে। স্থির যৌবন, সুশ্রী দেবতা তার বীভৎস রূপ দেখে ঘৃণায়, উপহাসে দূর করে দিয়েছে। সোৎসুক আগ্রহে সে উপস্থিত হয়েছে দানবরাজ্যে. যাকে দেখেছে, তাকেই

নিবেদন করেছে, 'আমার পতি হও তুমি।' যৌবনমত্ত ভোগপিপাসু দানব রোষ-কষায়িত লোচনে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। পাতালেও প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে কালকন্যা। মর্ত্যের মানুষ তাকে দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে, দেখলেই দূর থেকে পালিয়ে যায়। 'আমার পতি হও তুমি'—একথা বলবারই সুযোগ পায় না দুর্ভগা।

দুর্বহ যেন দুর্ভগার জীবন। কোটরগত চক্ষু, চোখের কোণে কালিমা, লুলিত গণ্ড, কুঞ্চিত বলি, বিবর্ণ বিবশ অঙ্গ। দেহে যুগান্তের শ্রান্তি। পিতৃদত্ত ত্রিবক্র যষ্টি ভর করে নিঃসঙ্গ সে ত্রিভুবনে ঘুরে বেড়ায়, মুখে শুধু একটি উৎসুক প্রার্থনা, 'আমার পতি হও তুমি।' কেউ তার পতি হয় না, কেউ তাকে গ্রহণ করে না। কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না সে। ব্যর্থতায় কম্পিত অঙ্গ, ক্রোধে স্খলিত চরণ। অতৃপ্ত কামনার বহ্নিদাহে সে রুক্ষ, শুষ্ক—যেন শুষ্কাতিভৈরব মরুভূমি। জীবন শূন্য হাহাকার। পতি সে পায় না।

নৈরাশ্যের স্তূপ পুঞ্জীভূত হয়, তবু সে আশা পরিত্যাগ করে না। অনির্বাণ আশার দীপ, স্তিমিতজ্যোতি নয়নেও আশার সন্ধানী আলো। সেই আলো নিয়ে পতির অন্বেষণে ভুবন পরিক্রমণ করে পতিংবরা দুর্ভগা। শ্যামল ভূতল ভাল লাগে না তার, শ্যামলতায় বিরক্তি—ধূসরতায় আসক্তি। বিশ্বের আনন্দনিকেতনে সে শান্তি পায় না। সে জানে, আনন্দ-নিকেতনে সুদুর্লভ তার স্বামী। জীবনের মত্ত কোলাহলে সে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে

দুর্ভগা পতি খুঁজে ফিরে শীতের নীহারময় তমসায়। নিষ্পত্র, শুষ্ক শীতের ধূসর প্রকৃতি, বুকে তার সীমাহীন রিক্ততা। সে-ও যেন দুর্ভগার মত পতিহীনা। সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে দুর্ভগার অন্তর। প্রদোষের থমথমে রহস্যঘন আধো আলো, আধো ছায়ায় সে ক্ষণেক থমকে দাঁড়ায়। অসুরপ্রিয়া সন্ধ্যা, বুকে যেন তার কিসের অভিযোগ—মুখে বিষাদের ছায়া। পতিমতী হয়েও সন্ধ্যা কি সুখী নয়? স্বামীর সোহাগে কি বঞ্চিতা সন্ধ্যা? কেমন যেন মায়া হয় দুর্ভগার।

শিথিল গতিতে সে কখনও এসে উপস্থিত হয় নির্জন শ্মশানভূমিতে। নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে কয়েকটি চিতা। গলিত স্বর্ণপিণ্ডের মত ক্রব্যাদ অগ্নি যেন শ্মশানের রাঙা নয়ন। কোন চিতা নিবন্তপ্রায়, অগ্নিকুণ্ডে আলোহিত দীপ্তি। প্রিয়জনের সদ্য শোকের অশ্রু মুছে গেছে, বক্ষে বক্ষে নিবন্ত চিতার তপ্তশ্বাস। কোথাও বা ধূমে আচ্ছন্ন মরুদাহ। শ্মশান-ধৌত জল থেকে ওঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দূরে হরিধ্বনির সঙ্গে শিবাধ্বনি—কাদের যেন অভিশাপ!

অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে রিক্ত শ্মশান, নিবন্ত চিতা, ধূম্রাচ্ছন্ন সমীরণ—অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে প্রিয়-বিরহিত শোকার্ত মানুষ। মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দিচ্ছে নিখিল ভুবন, 'এমনি চিতা জ্বলুক তোমার বুকে, এমনি রিক্ত হও তুমি!' নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনে উল্লসিত হয় দুর্ভগা। এই ভয়াবহ স্থানে একটু আশার আলোও দেখতে পায় সে। সে শুনেছে শ্মশান-নিবাসী অসংখ্য প্রেতপিশাচ। তারা হয়তো দুর্ভগাকে গ্রহণ করতে পাবে। শঙ্খচূর্ণী প্রেতিনী কোন্ দিকে? সধবা স্ত্রীর প্রেতাত্মা শঙ্খচূর্ণী। সে-ও সৌভাগ্যবতী—তার স্বামী ছিল। দুর্ভগা স্বামী-হীনা। ক্ষীণ দৃষ্টি তীব্রতর করে সে সৌভাগ্যবতী শাঁকচুন্নীকে দেখতে চায়। তার সিঁথায় এখনও কি এয়োতিচিহ্ন জ্বল জ্বল করছে?

তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে দুর্ভগার বুক থেকে। সে রূপহীনা, কদাকার, তাই কেউ তাকে গ্রহণ করে না। মৃত্যু বলেছে, সে অভব্য—অভদ্র তার আচরণ। সে ভেবে পায় না, আচরণে কোথায় তার অভদ্রতা। রূপ বংশগত, আচরণ স্বভাবগত। হয়তো বক্রকুটিল দেহের মত বক্রকুটিল তার আচরণ। এ জগতে নির্দোষ কে? ওই তো এখন কৃষ্ণবসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বসেছে অনেক কুক্রিয়ায় লীনা পৃথিবী। সেও পতিমতি, দৌষ্পিতার পত্নী। দূরে দুশ্চরিত্রা মঘা, অশ্লেষা। পাপ নক্ষত্র তারা, তবু পরিত্যক্তা নয়—স্বামী-হীনা নয়। কুচরিত্রা হোক, নির্লজ্জা হোক, পুংশ্চলী হোক বা হোক স্বৈরিণী—এ জগতে কে পতিবঞ্চিতা? দুর্ভগার মত দুর্ভাগ্য কার? বিধাতার দুয়ারে সে অভিযোগ করে—কেন, কেন এই অভিশাপ?

আর যেন ভাবতে পারে না দুর্ভগা। ক্লান্ত, অতিশয় ক্লান্ত সে। শ্রান্তিতে লাঠিতে ভর করে সে বসে। দু চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, মাথা ঘোরে। সোজা হয়ে বসতে পারে না, বসলেই মাথাটা নুয়ে পড়ে। দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে সে ভাবে। দেখলে মনে হয়, অনাদিকাল ধরে ভাবছে যেন একটা নির্জন তেমাথা। একটু ঘুম হলে কিছুটা শান্তি পেত সে, কিন্তু ঘুম তার চোখে নেই। সুযোগ পেয়ে নিদ্রাও পরিত্যাগ করেছে তাকে। মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোর—তাও মুহূর্ত মাত্র।

কালচক্র আবর্তিত হয়। কোথা দিয়ে চলে যায় দিন—ব্রহ্মার সত্ত্বময় তনুর বিগ্রহ; কোথা দিয়ে চলে যায় রাত্রি—কমলযোনির তমোময় তনুর প্রতিমা। আবর্তিত হয়—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। ঋতুর অয়নে ফুল ফোটে, ফুল শুকিয়ে যায়—হরিৎ হয় হরিদ্রাবরণ। দুর্ভগা তবু খোঁজে, তবু প্রতীক্ষা করে—জরতীর নয়নে পতির স্বপ্ন।

সহসা সেদিন নিশীথ রাত্রে কিসের শব্দে সচকিত হয় দুর্ভগা। কানে সে ভাল শোনে না। তবু একহাতে বাঁ কান ঢেকে, ডান কানে সে শুনতে চেষ্টা করে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ ধ্বনি। অনেক দূরে যেন দেখা যাচ্ছে একটি জ্যোতিরেখা। সেই জ্যোতিশ্চক্রে অস্পষ্ট শব্দঝঙ্কার! দুর্ভগা শুনেছে, সূক্ষ্ম ঘন জ্যোতির স্থূল বিকীরণ ধ্বনিরূপ নাদ। বহির্বিশ্বে ওই নাদই শব্দব্রহ্ম। তাহলে কি ধ্বনিরূপে নেমে আসছেন স্বয়ং ব্রহ্মা? তার আবেদন তাহলে পৌঁছেছে বিধাতার দ্বারে? সোৎকণ্ঠ দুর্ভগা।

তখন সপ্তর্ষিলোক থেকে নেমে আসছিলেন দেবর্ষি নারদ। মুখে সুমধুর হরিগুণ গান। ঋষির দেহ-বিচ্ছুরিত দীপ্তি ঠিকরে পড়ছিল মর্ত্যে—তাঁর কণ্ঠোচ্চারিত মধুর গীতের অস্পষ্ট ঝঙ্কার সুধা বর্ষণ করছিল অশান্ত হৃদয়ে। ছায়াপথ বেয়ে লঘু পদসঞ্চারে তিনি এসে দাঁড়ালেন দুর্ভগার সম্মুখে।

বিস্মিত দুর্ভগা। কেউ তার কাছে আসে না, কেউ তাকে চায় না। বিশ্বসংসারে সে পরিত্যক্তা। করুণার আশীর্বাদ কে এই করুণাময়—তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন? জ্যোতির্মণ্ডিত দেহ, নবনীর মত কমনীয় অঙ্গ। পরিধানে শ্বেতশুভ্র বসন, স্কন্ধে লম্বিত দুগ্ধধবল উত্তরীয়। চোখে-মুখে প্রশান্ত হাসির ছটা। ইনিই কি তার বিধিনির্দিষ্ট পতি?

উত্তেজনায় কম্পিত শিথিল দেহ, অন্তরতলে অনির্বচনীয় পুলক। আবেগে যষ্টি ভর করে উঠে দাঁড়ায় দুর্ভগা। তার গণ্ডে যেন রক্তের ছোপ লাগে, বিশুষ্ক ওষ্ঠে হাসির রেখা, কম্প্রকণ্ঠে গদগদ ভাষ, 'তুমি কি আমার পতি হবে ঋষি?'

প্রথমে বিব্রতবোধ করেন তপোধন নারদ। তিনি জানেন দুর্মুখা দুর্ভগার স্বভাব। অতি নির্লজ্জ, অভদ্র তার আচরণ। ব্যর্থ হলেই অভিশাপ বর্ষণ করে। প্রথমে একটা কৌতুক শ্লেষ উচ্চারিত হতে চায় নারদবাক্যে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করেন তিনি। করুণার প্রতিমূর্তি—স্নেহপ্রবাহে আপ্লুত তাঁর অন্তর। বেদনার্ত হৃদয়, অশ্রু-ছলছল নয়ন—তিনি ভাবেন, সত্যিই তো অনাথ দুর্ভগা। ত্রিজগতে সে প্রত্যাখ্যাতা, স্বামিবঞ্চিতা। তার মত হতভাগিনী কে?—নীরব, নিস্পন্দ ভক্ত নারদ, নয়নে করুণাধারা।

ঋষিকে নীরব দেখে আবার নিরাশার আঁধার ঘনীভূত হয় দুর্ভগার মনে। তবে কি ইনিও প্রত্যাখ্যান করবেন তাকে? শক্তি সঞ্চয় করে শেষ চেষ্টা করে দুর্ভগা, মুখে বলে, 'রতিকাম নারী আমি, জগতে কেউ আমার পতি হতে চায় নি, রূপহীনা বলে কেউ গ্রহণ করে নি আমাকে। কৃপালু ঋষির করুণা থেকেও কি বঞ্চিত হব আমি?'

সকাতর কণ্ঠপ্রকণ্ঠ। বিশ্বের হতাশা-বেদনায় মথিত করুণ আবেদন। অধীর হলেন তপোধন। স্বভাব-কোমল যাঁদের হৃদয়, সামান্য কাতর প্রার্থনাতেও সহজে বিগলিত হন তাঁরা। সুধামাখা কণ্ঠে বলেন করুণকান্ত দেবর্ষি, 'আমি তোমার পতি হব না, তবে পতি নিশ্চয়ই পাবে তুমি। সৃষ্টির অভিশাপ হলেও বিধাতার সৃষ্টিতে তুমি অবাঞ্ছিত নও। প্রবল তোমার সম্ভোগকামনা, ব্যর্থতায় তুমি ক্লান্ত। পাঞ্চালপুরী আক্রমণ করতে আসছে দুর্ধর্ষ যবনসেনা। অধ্যক্ষ তার যবনেশ্বর। তুমি তাঁর কাছে যাও, তাঁর কাছেই আশ্রয় পাবে তুমি। আমি বর দিচ্ছি, অতৃপ্ত সম্ভোগ-বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হবে তোমার।'

দুর্ভগার অন্তরের হতাশার আলো আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যেমন স্তিমিত-প্রায় প্রদীপ মাঝে মাঝে নিবতে নিবতেও জ্বলজ্বল করে। দুর্বল দেহে সে অনুভব করে নূতন উত্তেজনা, নির্জীব রক্তকণায় নবচাঞ্চল্য। যষ্টি তুলে সে নমস্কার জানায় ঋষিকে, স্পর্শ করে না। দেবতা ও ধৃতব্রত যোগীকে স্পর্শ করার অধিকার নেই তার।

অন্তরীক্ষপথে অন্তর্ধান করেন পরমহংস নারদ। কালদত্ত যষ্টি ভর করে আবার পতির সন্ধানে অগ্রসর হয় পতিংবর কালকন্যা। নবোষার আলোক তখন দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে।

সারাদিন ঘুরেছে দুর্ভগা। সে ঘুরেছে কঙ্করময় পার্বত্যপথে—উপলে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে চরণ; সে ঘুরেছে জনশূন্য, জলশূন্য মরুর উপর দিয়ে। মধ্যাহ্ন সূর্যের খর কিরণে দগ্ধ হয়েছে পদতল। পিপাসায় শুষ্ক তালু, রসনায় দারুণ তৃষা। সে বিভ্রান্ত হয়েছে মরুর বুকে মরীচিকা দেখে। তবু সে চলেছে। বুকে স্বামী-সঙ্গ লাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। অবশেষে সে এসে দাঁড়িয়েছে ভবাটবীর বিশাল প্রান্তরে। এর পরেই পাঞ্চালরাজ্য পুরঞ্জনপুরী। কিন্তু কোথায় যবনেশ্বর? কোথায় তার সৈন্যদল? সম্মুখে খাঁখাঁ করছে অপরাহ্নের নির্জন প্রান্তর। আর চলতে পারে না সে। নাসায় শ্রান্তির অগ্নিজ্বালা, নাভিমূল কাঁপিয়ে উঠছে তপ্তশ্বাস, নিঃশেষ যেন সমস্ত উদ্যম। সত্যের বাঙ্‌মূর্তি ঋতদ্রষ্টা ঋষি—তাঁর বাক্য তো মিথ্যা হতে পারে না। নিশ্চয় পাঞ্চাল নগর আক্রমণ করতে আসবে তার পতি। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা করতে থাকে দুর্ভগা।

সহসা প্রান্তর কাঁপিয়ে এল কার কটক। বিভীষণ মূর্তি সব সেনা। কারও মুখে অট্টহাস্য, কারও মুখে চিৎকার। বৃক-উলুকের মত কারও বদন, কেউ বা তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রা ঘোরদর্শন। কারও হাতে জ্বলন্ত অনলের মত সমুজ্জ্বল খড়্গ, কারও হাতে বজ্র

দণ্ড। রথের ঘর্ঘর, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ, অস্ত্রের ঝনৎকার—সব মিলিয়ে মুখর মূক প্রান্তর।

দুর্ভগার অন্তরে নববিবাহের বধূর মত পুলককম্পন। পাঞ্চাল পুরবাসীর পক্ষে যা দুর্নিমিত্ত, দুর্ভগার নিকট তাই শুভ মাঙ্গলিক। বাদ্যভাণ্ডের সমারোহে সমাগত বরযাত্রী। নবউৎসাহে উঠে দাঁড়ায় দুর্ভগা। সত্যমূর্তি ঋষি, সত্যময় তাঁর বচন। দুর্ভগার স্তিমিত নয়নে খর সন্ধানী দৃষ্টি—কোথায় সৈন্যাধ্যক্ষ যবনেশ্বর?

ওই যে অদূরে দেখা যাচ্ছে—নীলগিরির মত কৃষ্ণকায় মহিষ, তারই পৃষ্ঠে পর্বতের মত বিশালকায় এক মূর্তি। উনিই যবনেশ্বর—দুর্ভগার বিধি-নির্দিষ্ট পতি। বিবাহের কন্যার মত দুর্ভগার হৃদয়ে দুরুদুরু কম্পন, একটা অবশ-করা আনন্দানুভূতি। বহুকালের ন্যুব্জ দেহ ঈষৎ ঋজু হয়ে ওঠে। মুহূর্তে মলিন চীর সম্বৃত করে নেয় দুর্ভগা। কতকালের জটিল কেশ! কম্পিত হস্তে স্পর্শ করে সে। তারপর যষ্টি ভর করে বিহ্বলার মত অগ্রসর হয়, চিরকালের অভিসারিকা—চকিতা, উৎকণ্ঠিতা, আনন্দকম্পিতা।

মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে, যেন চিরন্তনী নববধূ। হৃদয়ে সভয় আনন্দস্পন্দন, যেন নাগরদোলায় আন্দোলিতা নাগরী। আনত চিবুক উঁচু করে, অনেক কালের বিবর্ণ মুখ, ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে উপরের দিকে তাকাল দুর্ভগা। সলজ্জ নববধূর মুখ-চন্দ্রিকা: কম্পিত ব্রীড়াকুঞ্চিত নেত্রপল্লব—আবেশময় চাহনি। স্খলিত বচনে দুর্ভগার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে নিখিল নারীহৃদয়ের চরম কামনা, 'তুমি কি আমার—

কথা শেষ হল না, নিমেষে নিবে গেল বাসরকক্ষের উজ্জ্বল আলো। নববধূর চোখে কালরাত্রির অন্ধকার! কে এ? এ যে কালের কুতকপুত্র সেই মৃত্যু! যে ব্যর্থ করে দিয়েছে দুর্ভগার জীবনের রঙিন স্বপ্ন, জীবনের সর্বপ্রথম কামনা; যার জন্য দুর্ভগার এত দুর্ভোগ—ত্রিলোকে সে পতিবঞ্চিতা!

'মিথ্যা ঋষিবাক্য!'—বুকভাঙ্গা আর্তনাদ করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল দুর্ভগা। মনে হল, ঋষির বাক্য যেন বজ্র হয়ে নেমেছে তার বুকে; মনে হল, প্রবল ভূমিকম্পে সরে যাচ্ছে নীচেকার মাটি; মনে হল, বিদেহী প্রেতিনীর মত দুর্ভগা আশ্রয় নিয়েছে মহাশ্মশানের অনন্ত শূন্যতলে।

সম্মুখে স্তব্ধ কালের দত্তক মৃত্যু—দুর্ভগার সম্পর্কিত ভ্রাতা। নিশ্চল পুঞ্জিত মেঘের মত ঘোর বিশালাকার দেহ। তার রক্তনয়নে অশ্রু ছল ছল করে, করুণ দৃষ্টিতে সে তাকায় ভগ্নীর মূর্ছাহত দেহের প্রতি। ভগ্নী দুর্ভগা—বঞ্চিতা, আশাহতা। ত্রিভুবনে পতি খুঁজে পায় নি সে।

তখন বিদায়ী অমিতবিক্রম আদিত্যদেব। ওপরের আকাশটা ঘননীল। অসীম নীলায় জমেছে যেন কতকালের কত বেদনা! দিগন্তে, রক্তরঞ্জিত সন্ধ্যাভ্র—যেন কত রূঢ় আঘাতের রক্তচিহ্ন! হুহু করে বয়ে যাচ্ছে বেলাশেষের সমীরণ—বুকে যেন অন্তহীন নৈরাশ্যের হাহাকার! সূর্যের শেষ রশ্মিজালে অসংখ্য ত্রসরেণুর আবর্ত—যেন ঘনকম্পনে স্পন্দিত ব্যর্থতার সহস্র শুষ্ক অশ্রুকণা!

সহানুভূতিতে করুণায় কঠিন হৃদয় মৃত্যুর রক্তান্তলোচনে অশ্রু-সাগর টলমল করে। ভূমিতে লুটিয়ে কাঁদছে চির-লাঞ্ছিতা তারই ভগ্নী—তার শূন্য হৃদয়ে স্বামীর স্বপ্ন। ধীরে মহিষপৃষ্ঠ থেকে নেমে আসে, ধীরে দাঁড়ায় ভূপতিতা দুর্ভগার দেহের সামনে—অতি ক্ষীণ, অতি শুষ্ক, কঙ্কালসার তনু। অশ্রু-সজল, স্নেহদ্রব কণ্ঠে বলে মৃত্যু, 'ওঠ দুর্ভগা, ঋষিবাক্য কোনদিন ব্যর্থ হয় নি, ব্যর্থ হয় না। পতি নিশ্চয় লাভ করবে তুমি। তামসী বিদ্যা তোমার আয়ত্ত: সেই বিদ্যাবলে অলক্ষ্যচারী হয়ে মর্ত্যের প্রত্যেক প্রাণীকে তুমি সম্ভোগ করতে পারবে। পতিরূপে তোমার ভোগ্য হবে যৌবন-অতিক্রান্ত যে-কোন জীব। সংযত, মিতাচারী, ধর্মপর ধার্মিককে বশ করতে তোমার বিলম্ব হবে, কিন্তু কামাসক্ত যারা কামকিঙ্কর, অমিতাচার ভোগে যারা আকণ্ঠ লিপ্ত—তাদের অতি সহজে আয়ত্ত করতে পারবে তুমি। তোমার আর এক নাম হবে 'জরা'। কালের অবাধ সংক্রমণে প্রত্যেক প্রাণী জরার বশ হবে। তোমার ভোগ পূর্ণ হলে তারা আসবে আমার অধিকারে। আমার অগ্রদূতী বলে ত্রিলোকে মৃত্যুদূতী নামেও বিখ্যাত হবে তুমি। যাও, আমারই সৈন্যদলে আছে প্রজ্বার আর স্মৃতিহরা। তাদের সহায়ে সৃষ্টির রাজ্যে পতিসম্ভোগ কর, পাঞ্চালরাজ্যে বিস্তার কর তোমার অধিকার।

এই কথা বলে ধীরে চলে যায় মহিষ-বাহন মৃত্যু। গোধূলির শেষ আলোয় উৎসাহে ঈষৎ ঋজু হয়ে দাঁড়ায় কুব্জা দুর্ভগা। গোধূলির বসুমতী যেন জরারই প্রতিমূর্তি: স্তিমিত প্রদীপের শেষ দীপ্তির মত তৃপ্তির হাসি তার ম্লান মুখে। দুর্ভগার লুলিত ওষ্ঠেও সেই হাসি। আর সে পতি-বঞ্চিতা নয়, সকল প্রাণীর ওপর তার পত্নীত্বের অধিকার। সেই অধিকার গ্রহণ করার জন্য যষ্টি ভর করে অগ্রসর হয় মৃত্যুদূতী।

তখন পাঞ্চাল পুরী থেকে বেরিয়ে আসছেন পাঞ্চালরাজ অমিত-বিক্রম পুরঞ্জন। ভোগবতী সদৃশ মনোরম পুরীতে এতদিন অতি সুখে তিনি রাজত্ব করেছেন। আজ শত্রু আক্রমণ করতে এসেছে সেই পুরী! সহসা যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তিনি: বিদ্রোহী পঞ্চ মন্ত্রী, পঞ্চ সেনাপতি। ম্লান নয়নদীপ্তি, চোখের কোণে গাঢ়

কালিমা রেখা। সহস্র বলিকুঞ্চিত তার সতেজ দেহ—পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত, শিথিল অস্থি-গ্রন্থি। দুর্বল দেহে ক্রোধের অস্থির কম্পন, মুহুর্মুহু স্খলিত চরণ। কে যেন তার হাতে তুলে দিয়েছে একটি যষ্টি। সেই যষ্টি ভর করে আসছেন তিনি —অসহিষ্ণু, বিরক্ত, ক্রোধান্বিত।

দূরে মহিষ-পৃষ্ঠে বসে তৃপ্তির হাসি হাসছে অন্তক মৃত্যু। দুর্ভগার পতিসম্ভোগ শুরু হয়েছে তাহলে? অদ্ভুত তার পতিপ্রাণতা, আশ্চর্য পতিচর্যা। মনের সাধ মিটিয়ে গভীর প্রেমে, পরম যত্নে নিজের রূপে তিল তিল করে পতিকে সাজিয়ে দিয়েছে মৃত্যুদূতী জরতী দুর্ভগা।*

* শ্রীমদ্ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ, ২৭-২৮ অধ্যায়।

## ॥ অন্তক ॥

ত্রিলোকীর দক্ষিণদিকে অন্ধকারের উদ্যত গ্রাসের মত ভয়ঙ্কর সেই গুহা-গহ্বর। তারই ভিতর দিয়ে বহুদূর প্রসারিত সৃষ্টির পুরাতনী পথ। বিশ্বমানবের শাশ্বতী ধ্রুবা গতি। কিন্তু পরমাশ্চর্য! সে পথের পরিচয় কেউ জানে না। বিস্মৃতির আঁধারঘেরা নীহার-শীতল পথ—ঘন কুহেলিকাময়, গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, নক্ষত্র নেই। নিরগ্নি, নিষ্প্রদীপ—জ্যোতিঃলেশশূন্য মহাতমিস্রা। তমিস্রার জ্যোতি শব্দ। সেখানে নিস্তব্ধ শব্দতরঙ্গ। অন্ধ শুষ্ক ব্রাহ্মীনিশার মত অনন্ত শূন্যতা, অনন্ত নৈঃশব্দ—যেন এক অনন্ত অনুত্তর জিজ্ঞাসা।

অজ্ঞাতপরিচয় সেই নির্গম নিগূঢ় পথের সন্ধান জানে শুধু সে। পুরাণ পথের অগ্র-পথিক—অনাদি কাল থেকে সে সেই পথের পথ-প্রদর্শক। ওই পথের মতই সে রহস্যময়। সে অদৃশ্য, অলক্ষ্য—চির-অচেনা, চির-অজানা। কে বলতে পারে, কে তাকে দেখেছে? কে তার সন্ধান জেনেছে?

কিন্তু সে আছে। জগতের বুকে সে এক নির্মম, কঠিন সত্য। মমতা-বর্জিত মহাভয়াল। তার অমোঘ পদক্ষেপে মর্ত্যলোক আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কলহাস্যে সে করুণ ক্রন্দন, সুখের নীড়ে মহা দুঃখ, বসুপূর্ণা বসুন্ধরায় বসুহা বর্ষোপল। সে মৌন কিন্তু অমোঘ তার হস্তসঙ্কেত। প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড বেগ। তারই প্রবল আকর্ষণে সম্মোহিতের মত তার পশ্চাতে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়—কষিত রুক্ষ ছায়ার মত অশরীরী সত্তা, যেন ঘোর ছায়ার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ সুসূক্ষ্ম ছায়ার বীজাণু। তারা পাশবদ্ধ, লুপ্তস্মৃতি। তারা জানে না, কেমন করে পথ অতিবাহিত হয়—কোন স্মৃতিহরা হরণ করে স্মৃতি, কোন স্বয়ংহারিকা হরণ করে জ্ঞান।

সেই ভীষণ বিস্মৃতির পথে একমাত্র স্থির বুদ্ধি, স্থিরদৃষ্টি সে। ধ্রুবা স্মৃতি, ধ্রুব লক্ষ্য। যে পথে পদাঙ্ক পড়ে না—তমিস্রায় নিশ্চিহ্ন পদচিহ্ন, যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন দৃষ্টি, সে অন্ধকারে সে অতন্দ্র, অভ্রান্ত—যেন অকূল অন্ধকার সাগরে এক অভ্রান্ত দিগ্‌-দর্শন। প্রলয়ের প্রাক্কালের মত অটল গাম্ভীর্য নিয়ে সে নিঃশব্দে অতি দ্রুতবেগে সেই গুহাহিত ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করে।

তার জীবনের আর-এক গূঢ় রহস্য তার একাকিত্ব — বহুর মধ্যে সে একা। কোটি কোটি সত্তার নিয়ন্তা, কিন্তু সঙ্গীহীন। সে নিঃসঙ্গতা ধারণার অতীত। উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে তপ্তঘোর মরুভূমির নির্জনতা ধারণা করা সম্ভব, আসন্ন সমেঘ সন্ধ্যায় বিশাল প্রান্তরের বিপুল বিরলতাও বোধের অতীত নয়, গভীর অমাবস্যার রাত্রিতে পরিত্যক্ত শ্মশানের ভয়াবহ একাকিত্বও কল্পনা করা যায়—কিন্তু সকল বোধের অতীত, অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য তার একাকিত্ব। সেই ভীষণ একাকিত্ব নিয়ে গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে সে পথ চলে।

সুদীর্ঘ সেই গুপ্ত পথের দুই প্রান্ত কোলাহলমুখর। যে প্রান্তে অন্ধকারের মত রহস্যময় সেই গহ্বর, সেই প্রান্তে গুহার গ্রাসস্বরূপ প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ হাসি-কান্নার সংসার—অপর প্রান্তে ক্রন্দনে-উতরোলে উত্তাল ভয়ঙ্করী, সংযমনী পুরী। সংযমনী পুরীর প্রত্যন্ত সীমায় এসে পথ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে: ঊর্ধ্বে দেবযান, নিম্নে পিতৃযান। ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে আলো—আলো—শুধু আলোর ঝরণা। ওই আকাশগঙ্গা অলকনন্দা, ওই সুশুভ্র ছায়াপথ ওই দিব্য হিরণ্ময় আদিত্যলোক, —আলোকস্নাত উত্তরায়ণ। আর নিম্নে অন্ধকার—নিদারুণ অন্ধকার, ঘন নিভাঁজ তমিস্রার পুঞ্জিত স্তূপ। সেদিকে পাতালগঙ্গা ভোগবতীর উত্তরঙ্গ গর্জন, কাদের যেন হুহুঙ্কার, কাদের যেন বুকভাঙা আর্তনাদ, সেদিকে পিতৃলোক, নিরন্ধ্র—দক্ষিণায়নে গ্রথিত ভবচক্র। 'শুক্ল কৃষ্ণে গতীহ্যেতে'—বিশ্বের শাশ্বতী দুই গতি।

এই দ্বিপথের সংযোগস্থলে কখনও কখনও সে এসে দাঁড়ায়, উগ্রদৃষ্টিতে তাকায় চতুর্দিকে। জীবনের একাকিত্ব যেন বিভীষিকার মত তাকে অধিকার করে। পৃথিবীতে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি। কৌমুদী-ধৌত অনন্ত নীরবতা। উপরে অসীম শূন্য আকাশ, আকাশের বুকে কালচক্রে গ্রথিত অগণিত নক্ষত্র। শূন্যতার বুকের আনন্দ এই নক্ষত্ররাজি। আরও দূরে অস্পষ্ট নীহারিকা—নটিনীর মত নৃত্যচপল। ওদের নিঃশব্দ চপল চরণ স্পর্শে শিহরিত শুভ্রাংশু। আকাশের শেষ সীমায় দিগ্বলয়—বলয়বেষ্টনে আনন্দনিলীন দিগ্বধূ। সঙ্গী সহ সুখী নিখিল আকাশ—শূন্যতায় পূর্ণতার আনন্দ। কিন্তু সে? সে একা, অসংলগ্ন—যেন সৃষ্টির বিরাট ব্যতিক্রম।

হুহু করে হৃদয়। আপিঙ্গল অশ্রুহীন নয়ন। অতি শুষ্ক, অতিশয় রুক্ষদৃষ্টি। আনন্দপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অসহ বোধ হয় ভীষণ একাকিত্ব। সে জানে, সংযমনী পুরীর ওপারে—ওই আলোক-লোকে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। ওই নক্ষত্র, ওই নীহারিকা, ওই ছায়াপথ, ওই দিগঙ্গনা—তার নিরাশার স্বপ্ন।

নিঃশব্দে আপন কক্ষপথে পদক্ষেপ করে সে। সে পথ অনন্দ, অসূর্য। 'অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা'। কিন্তু সেই পথটিই বুঝি তার একমাত্র আপন, একান্ত পরিচিত। তারই মত ঘোর কৃষ্ণ, তারই মত গহন-গভীর, তারই মত রহস্যময়। অপলক দৃষ্টিতে খানিক সেই পথের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। শূন্য জীবনের প্রিয়তম বন্ধু ওই পথ—বিশ্বলোকের মহাভয়, ঘোর কুটিল—কিন্তু তার প্রিয় বান্ধব। চির নীরব বন্ধু, চির নীরবতাময় বন্ধুত্ব। মৌন সখ্যে সুখ আছে কি ?—দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সে পথের এ-প্রান্তে এসে দাঁড়ায়।

পথের এ-প্রান্তে প্রাণময়ী পৃথিবী, উচ্ছল জীবন নদী। কি মত্ততা, কি উচ্ছ্বাস, কি আনন্দ চাঞ্চল্য ! মৌনব্রত ভঙ্গ করেছে মমতাময়ী ধরণী। সঙ্গীতমুখর সমীরণ, কলমুখর কল্লোলিনী পিককূজিত কুঞ্জবন। পঞ্চযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণী প্রজা। গৃহে গৃহে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, পতি-পত্নীর কলকোলাহল। বাৎসল্যে, প্রীতিতে, প্রেমে—মিলন-সুখের আনন্দ-গুঞ্জনে আত্মহারা স্নেহময়ী বসুন্ধরা।

ধরণীর এ-মিলনযজ্ঞে সে অনাহূত, অবাঞ্ছিত। জগতে কেউ তাকে প্রার্থনা করে না। সঙ্গাত্মক সম্ভোগের জগতে সে একা, সৃষ্টির বুকে এক মহাশূন্য। উদাসীন সাক্ষীর মত সে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় নিখিলের আনন্দ-উৎসব, ইচ্ছা করলে নিমেষে নীরব করে দিতে পারে সমস্ত কোলাহল—কিন্তু যোগ দিতে পারে না। জগতের আনন্দ-জোয়ারে অবগাহন করার অধিকার তার নেই।

বক্ষ ভেদ করে জাগে শুষ্ক ক্রন্দন ! কেন এই অভিশাপ ? কেন সে একা ? সে তো একা ছিল না। মিথুন-সম্ভব সমাজে তার জন্ম—মাতা ছিল, পিতা ছিল, ছিল ভ্রাতা ও ভগ্নী। অধর্মপ্রভব মহাভয় 'অনৃত' তার জনক, নিকৃতি-নিপুণা 'নির্ঋতি' তার জননী। কামনা-কুটিল সমাজ, অত্যুগ্র ক্ষুধা। সে ক্ষুধা ন্যায়-অন্যায় বিচারহীন। চিরলোভী, চিরমদান্ধ অধর্মের কুল। ইচ্ছা করলে এই জীবনকে গ্রহণ করে সে সুখী হতে পারত। কিন্তু পারে নি। কোথা থেকে যেন তার ভিতরে দেখা দিয়েছিল অদ্ভুত ধর্মবোধ। দুর্নীতির রাজত্বে সে হয়েছিল নীতির ধারক। সে-ও উগ্র, উদ্ধত, ক্রোধবশ—নিরঙ্কুশ তার ক্ষমতা, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার।

ন্যায়াধীশ বিধাতাপুরুষ তারই হাতে ন্যস্ত করেছিলেন সুকঠিন এক কর্মভার। অধর্মের বংশধর হয়েও সে হয়েছিল ধর্মরাজের অনুচর। যেমন সৃষ্টি, তেমনি প্রলয় ; যেমন আনন্দ, তেমনি বেদনা। প্রলয়-বেদনার ন্যায়দণ্ড বিধাতা তার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন ; বলেছিলেন, 'দুঃখের আঘাতে ধরণীতে সুখের শতদল

ফুটিয়ে তোল তুমি, শ্মশানের চিতাধূম মেঘ সঞ্চার করে নবসৃষ্টির সহায়ক হও তুমি! নাও এই প্রাণ ও অপান বায়ুর বিশ্লেষকারী 'উৎক্রান্তিদা শক্তি', নাও এই অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। নবজীবনের অভ্যুদয় সূচিত হোক তোমার 'প্রাণঘ্নী-বেদনায়', নীতির নিয়ম রক্ষা কর প্রলয়-বেদন হাতে রেখে। কণ্টক-মুকুটে তোমায় অভিষেক করলাম।'

সে এক বিস্ময়কর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। তখন আদ্যকল্প। প্রজাপতি ব্রহ্মার ঋতাভিধ্যানে প্রজায় পূর্ণ সপ্তলোক, পরিপূর্ণা সৃষ্টি। সুন্দর নিয়ম, সুন্দর শৃঙ্খলা। কিন্তু সৃষ্টি চলল অব্যাহত-গতিতে, দেখা দিল স্থানাভাব। ভূরি-সৃজনে শ্বাসরুদ্ধ ত্রিভুবন। চিন্তিত হলেন প্রজাপতি। তিনি লক্ষ্য করলেন, শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একদল প্রজা হয়ে উঠেছে স্বার্থান্ধ, স্বাধিকারপ্রমত্ত। উদগ্র তাদের লালসা, উৎকট দম্ভ। তাদের হুঙ্কারে-গর্জনে, শাসনে-শোষণে পীড়িতা কল্যাণী সৃষ্টি। অবাঞ্ছিত এই জীবনের ভারেই ভারাক্রান্ত ধরণী।

ক্রুদ্ধ হলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। শান্তির রাজ্যে একি অশান্তি! কল্যাণী সৃষ্টিতে একি বিপর্যয়!

সহসা সংক্রুদ্ধ ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়রন্ধ্রে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল। আকুঞ্চিত ভ্রূফলক ভেদ করে দক্ষিণাবর্তে বহির্গত হল সেই কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নিশিখা! নীল-লোহিত বর্ণ, পুঞ্জিত প্রগাঢ় ক্রোধের ভীষণ সংহার মূর্তি। নীললোহিত সেই অগ্নি দ্রুত অগ্রসর হল উচ্ছৃঙ্খল প্রজার প্রতি। পলকে প্রলয়। ক্রন্দন করে উঠল অত্যাচারী স্বার্থপর। 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্তবাণী উচ্চারিত হতে না হতেই ভস্মীকৃত হল কামুক, লম্পট। রুদ্র কালাগ্নি তাদের ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হল না, প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হল সমগ্র সৃষ্টির দিকে। স্বর্গে, মর্ত্যে, পাতালে ব্যাপ্ত ক্রোধবহ্নি। করুণ ক্রন্দনে পূর্ণ চতুর্দশ ভুবন।

মহাপ্রলয়ের অধিকর্তা মহাকাল রুদ্র, কিন্তু তিনি শিব, তিনি শঙ্কর। তাঁর বামপদের নৃত্যে রুদ্রবীণায় অগ্নি ঝরে, দক্ষিণ পদের নৃত্যে সুন্দর হয়ে ফোটে, সৃষ্টির শতদল! ত্রিলোকের এই অশিব অকাল প্রলয়ে তিনি ব্যথিত হলেন। দেব-সঙ্ঘের পুরোবর্তী হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ক্রোধান্ধ ব্রহ্মার নিকট, কাতরকণ্ঠে বললেন, 'ক্রোধবহ্নি সংহরণ করুন, সংহরণ করুন। সৃষ্টির উপর এ উপদ্রব অশিবজনক।'

শুভঙ্কর শঙ্করের প্রার্থনায় প্রজাপতি প্রকৃতিস্থ হলেন। দেখলেন, মুহূর্তের ক্রোধে প্রলয় ঘটে গেছে। দ্রুত রুদ্রবহ্নি সংহরণ করলেন তিনি। স্বীয় দেহেই

সংরুদ্ধ হল তেজ, শান্ত হল সৃষ্টি। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল, 'কার এই প্রলয়ঙ্করী শক্তি? কে এই মহাভয়ঙ্কর লোক সংহারক?'

সহসা দেখা গেল ব্রহ্মার দক্ষিণদিকে প্রজ্জ্বলিত বহ্নির মত আবির্ভূত হয়েছে—অতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মহাকায় উর্ধ্বরোমা, জলজ্জটা ক্রোধভীষণ এক উগ্র মূর্তি! একি নারী, না পুরুষ? ইচ্ছানুরূপ বেশধারী আশ্চর্য শক্তি। ক্ষণকাল পরে আরো স্পষ্ট হল মূর্তি! সাতঙ্কে সবিস্ময়ে সকলে দেখল, সে আর কেউ নয়—সেই উগ্রভীষণ নীতিধর নির্ঋতি-নন্দন।

সে-ও বিস্মিত! বুঝতে পারে নি, কোন্ শক্তিবলে সে উপস্থিত হল ব্রহ্মার সম্মুখে। মুহূর্তে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সে। প্রচণ্ড বহ্নিরূপে সে প্রত্যক্ষ করেছে নিজের প্রলয়ঙ্কর তেজ, প্রত্যক্ষ করেছে স্ব-শক্তির বিভীষণ রূপ। ধ্বংসের রুদ্র মূর্তিতে অগ্রসর হয়েছে সে। তার পদার্পণে পৃথিবীতে জেগেছে আকুল ক্রন্দন! কী কাতর মিনতি। তবু সে ক্ষান্ত হতে পারে নি। মাতা-পিতা-পত্নীর প্রার্থনা উপেক্ষা করে নির্মমভাবে সে আকর্ষণ করেছে প্রাণীর প্রাণ! শুধু আকর্ষণ নয়, আরও বিস্ময়কর তার অভিজ্ঞতা। নিদারুণ অন্ধকার—সেই অন্ধকারে গুহাহিত এক রন্ধ্রপথ। বায়ুহীন, নিষ্কম্প, হিমশীতল, স্তব্ধ। সেই পথে প্রচণ্ডবেগে সে অগ্রসর হচ্ছে—পশ্চাতে ছায়ার মত অসংখ্য সুসূক্ষ্ম জীবাণু। আলোহীন সেই মহাতমিস্রায় কেমন করে সে অগ্রসর হল?—তা সে জানে না। শুধু এইমাত্র জানে, নিমেষের প্রখর দৃষ্টিতে সে সে-পথ দেখেছে—স্পষ্ট দেখেছে পথের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি অস্থিসন্ধি। অতি ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ সে পথ।

সপ্রশংস নয়নে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মহাকাল মহাদেব, 'এই সেই?' সগর্বে স্মিতহাস্যে চতুর্মুখে উত্তর করলেন স্রষ্টা ব্রহ্মা, 'এই সেই।' তারপর আপন ক্রোধমূর্তিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'অধর্মের বংশে অনৃত-নির্ঋতির নন্দন তুমি, আমার ক্রোধাংশে নবজন্ম হল তোমার। আজ থেকে জীব-জগতের মৃতি-শক্তির অধিকারী হলে তুমি, তোমার নাম হল 'মৃত্যু'। তুমি জীবনের অন্তকারী 'অন্তক', পাঞ্চভৌতিক দেহের 'পঞ্চত্ব'—তুমিই 'অবসান' তুমিই 'নিমীলন'। হে ভয়ঙ্কর, যাও, ইচ্ছানুরূপ মূর্তি ধারণ করে, কর্মের বিধান অনুসারে, পুরুষরূপে পুরুষের—নারীরূপে নারীর প্রাণ সংহার কর।'

নীরবে দাঁড়িয়ে রইল অন্তক। একেই সে গম্ভীর, স্বল্পভাষী। দুঃখে কণ্ঠ রুদ্ধ হল তার। এ কি পুরস্কার, না অভিশাপ?

অধর্মের বংশধর বলে বিধাতা কি কঠিন শাস্তি দিলেন তাকে ? কি নির্দয় এই লোক-সংহার কর্ম। প্রীতির জগতে প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, স্নেহের নীড় থেকে হরণ করতে হবে প্রাণময় জীবন। অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক এই সংহার-ক্রিয়া!

বেদনায় কম্পিত হয় অন্তকের আয়ত রক্তলোচন। অন্তকের অন্তর্ভাব বোঝেন অন্তর্যামী ব্রহ্মা। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমার বাক্য অসত্য হয় না। জগতে তুমিই প্রথম রহস্যময় নিমীলনের পথ সন্দর্শন করেছ। গুহাহিত নিগূঢ় পথের সন্ধান জেনেছ তুমি। তোমাকেই এ দুরূহ কর্তব্য গ্রহণ করতে হবে।'

তবু পাষাণের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে অন্তক। হায়, প্রিয় পিতা, প্রিয় মাতা, প্রিয় পতি, প্রিয় পত্নীর মিলন-ডোর কেমন করে ছিন্ন করবে সে! মহা ভয়ঙ্কর এই নিমীলন, অতি ভৈরব এই মৃত্যু! শান্তির জগতে এ অশান্তি, এ অকল্যাণ! মনে মনে প্রার্থনা করে অন্তক—স্নেহ-প্রীতির জগতে অক্ষয় হোক প্রীতির বন্ধন, মৃত্যুর কবলমুক্ত হয়ে কল্যাণ লাভ করুক মানুষ।

গম্ভীর স্বরে বলেন বিধাতাপুরুষ, 'জগতের পক্ষে মৃত্যু অকল্যাণকর নয়। জাতমাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু। সত্য যেমন জন্ম, তেমনি সত্য মৃত্যু:

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।

অদ্য বা অব্দ শতান্তে মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥

মৃত্যু সনাতন। মৃত্যু আছে, তাই অবাঞ্ছিত বস্তুর ভারে সৃষ্টি দুর্বহ হয় না। মৃত্যু আছে, তাই রক্ষা হয় সৃষ্টির ভাবসাম্য। অন্তক, তুমি এই সনাতন সত্যকে স্বীকার কর, আমার বাক্য রক্ষা কর। আমার ক্রোধই লোক-সংহার করবে, তুমি হবে নিমিত্তমাত্র।'

তবু বিধাতার বাক্য স্বীকার করতে পারে না অন্তক। মানুষের অভিশাপ-ভয়ে সে ভীত হয়। বিচ্ছেদ-কাতর সংসার অভিশাপ দিতে তাকেই দেবে! অন্যদিকে মানুষের প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তার অন্তর। একান্তমনে মানুষের কল্যাণ কামনা করে সে, একান্তমনে বিধাতার ক্রোধকে শান্ত করতে চেষ্টা করে সে। অন্তক-ব্রতী হয় সুকঠিন তপশ্চর্যায়। উপবাসে ক্ষীণতনু বায়ুভুক অন্তক প্রার্থনা করে, 'ক্রোধশান্ত হোন বিধাতাপুরুষ, জগৎ শান্তিময় হোক।' একপদে দণ্ডায়মান হয়ে সে আকুল কামনা জানায়, 'প্রসন্ন বিধাতার আশীর্বাদে মৃত্যুমুক্ত হোক অসহায় মানুষ—শান্তি হোক জগতের।' তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করে বিশ্বের কল্যাণে করুণাভিক্ষা করে অন্তক—পবিত্র তীর্থনীরে শুচিস্নান করে মানুষের জন্য শান্তি প্রার্থনা করে সে।

কিন্তু সত্যমূর্তি বেদগর্ভ ব্রহ্মা। তিনি বলেন, 'মিথ্যা অধর্মের ভয়ে কাতর হয়েছ তুমি। তোমার কর্ম ভয়াল হলেও—এ তো পাপ নয়, অধর্ম নয়, নবজীবনের অভ্যুদয়সূচক তোমার কর্ম—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যের আকর। দুঃখীর জীবনে তুমি স্বর্গের আশীর্বাদ, ধার্মিকের জীবনে গভীর প্রশান্তি। তাদের কাছে তুমি সুন্দর—পরম সুন্দর। হে অনন্ত মৌন, হে রুদ্র-সুন্দর, যাও, তোমার কর্মভার গ্রহণ কর। পিতৃতর্পণে লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে তোমার নাম।'

অবিচল সত্যের বাঙ্‌মূর্তি সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অন্তককে তাঁর আদেশ স্বীকার করতে হয়। আপিঙ্গল রুক্ষ চক্ষু—সেখানে অশ্রু উদ্‌গত হয় না। তবু বেদনায় চিকচিক করতে থাকে রক্তসন্ধ্যার অভ্রের মত তার রক্ত নয়ন। রাত্রিদেবী—কালরাত্রি, মোহরাত্রি আর মহারাত্রির ছায়ায় সাজিয়ে দেন তাকে; মহাকাল রুদ্র তার দেহে আধান করেন রুদ্র তেজ। পাশী বরুণ তার হাতে তুলে দেন অমোঘ পাশ, ধর্মরাজ দেন অমিতপ্রভ ন্যায়ের দণ্ড। প্রলয়-বেদনার কণ্টক-মুকুটে অভিষিক্ত হয়ে নিজের সমাজে ফিরে আসে সর্বসংহারক অনৃত-নন্দন।

সমাজে তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হল বক্রকটাক্ষ। কেউ সশ্লেষে বলল, 'ওহে, অধর্মের বংশে ইনি যে হলেন ধর্মপুত্তুর! পঙ্কে পঙ্কজ।' কেউ ব্যঙ্গ হাস্য করে বলল, 'অন্তক হল সর্বান্তক। ভালই হল, আমরা ওর আত্মীয়স্বজন—আমরা অমর হব।' সর্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হল কামনা-বুভুক্ষু সমাজের নারী। অনিরুদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল কামনার মহাভয় মৃত্যু। তারা বলল, 'আমরা দেখে নেব কত বড় শক্তিমান অন্তক।'

সেদিন সমাগত হল কাল-রাত্রির মত দুর্যোগঘন এক রজনী। অন্ধকারে আচ্ছন্ন দিঙ্‌মণ্ডল, মহামেঘে আবৃত আকাশ। কৃষ্ণ যবনিকায় অবরুদ্ধ দৃষ্টি। নেপথ্যে সংবর্ত জীমূতের ঘোর ডম্বর—ঊনপঞ্চাশ পবনের মত্ত হুঙ্কার। বৃক্ষে বৃক্ষে সঘন কম্পন, মৃত্তিকা গর্ভে হাহাশ্বাস। দশদিকে আজ বন্ধনমুক্ত দিঙ্‌নাগ, আজ উন্মাদ সহস্রফণা বাসুকী। সৃষ্টি জুড়ে যেন গর্জন করছে রুদ্রসর্গের ভূত প্রেত পিশাচ। অন্ধ দৃষ্টি, বধির কর্ণ, তন্দ্রাহীন নয়নে দুঃস্বপ্ন।

স্বীয় প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়েছিল অন্তক—ন্যায়ের রক্ষক, নীতির তত্ত্বাবধায়ক। তাকেও শুরু করতে হবে এই সংহারলীলা। কী কঠিন বিধাতার নির্দেশ। সে ভেবে পায় না কেন উন্মাদিনী হয় প্রকৃতি, কেন বেসুরে বাজে সৃষ্টির বীণা।

সহসা কে তাকে ডাকল, ডাকল তারই নাম ধরে। চম্‌কে ফিরে তাকাল অন্তক। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখল, বাইরের ওই উন্মাদিনী ঝটিকার মতই নির্জন কক্ষের স্বল্পালোকে এসে দাঁড়িয়েছে কামার্তা তারই সহোদরা।

কী কুটিল কদর্য দৃষ্টি! বিদ্যুতের মত তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ। বিস্রস্ত বসন, ধূসর কুন্তল। স্ফুরিত অধরে মদিরার গন্ধ।

শিউরে উঠল অন্তক—ভয়ে নয়, ঘৃণায়। কিন্তু প্রতিবাদ করার পূর্বেই ঝটিকার বেগে ছুটে এল কামিনী, যেন বংশের চিরাগত ব্যভিচার ছুটে এল তাকে ব্রতভ্রষ্ট করতে। প্রাণপণ শক্তি সঞ্চয় করে প্রস্তুত হল অন্তক।

সে কথা বলে না। সহজ গম্ভীর মৃত্যু। স্তব্ধ নীরবতার মূর্ত প্রতীক। বিপুল অন্ধকারের মত বিশাল বপু, সূচিমুখ শঙ্কুর মত ঊর্ধ্বরোমা। সংরক্ত নয়নে নীরবে সে শুধু উত্তোলন করে দোর্দণ্ড কালদণ্ড। অস্পষ্ট আলোকে অতি ভীষণ দেখায় তার মূর্তি!

দণ্ডভাতা স্বেচ্ছাচারিণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, যেন যাদুদণ্ড সঞ্চালনে স্তব্ধ কালনাগিনী। উদ্যত ফণা, অগ্নিবর্ষী নয়ন।

বাইরে তখন উনপঞ্চাশ পবনের মত হুঙ্কার, উন্মত্ত সংবর্তের গর্জন। সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তাদের নেই, কিন্তু সৃষ্টির একাংশকে পঙ্গু করে দিচ্ছে তারা। ক্রুদ্ধা সহোদরার অভিশাপ তেমনি পঙ্গু করে দিয়েছিল অন্তকের ভয়ঙ্কর জীবনের একটি দিক। ক্ষুভিতা নারীর তপ্তশ্বাস বিধৃত কণ্ঠে গর্জন করে উঠেছিল, 'বংশের নিয়ম লঙ্ঘন করে যে দণ্ডকে বড় বলে মনে করলে তুমি, সেই দণ্ড দুর্দৈব সৃষ্টি করবে তোমার জীবনে। এ জগতে কোন নর, কোন নারী স্বেচ্ছায় তোমাকে কামনা করবে না। হে নির্মম—নীরস, নিঃসঙ্গ মরুর মত দারাপত্যহীন শুষ্ক, শূন্য হবে তোমার জীবন।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামিনী, যেন শেষ ঝাপটা দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল উন্মাদিনী ঝটিকা। উদ্যত দণ্ড হস্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্তক। শান্ত ঝড়, তবু কেন মর্মবিদারী চাপা ক্রন্দন?

অভিশপ্ত অন্তক এসে দাঁড়াল বিধাতার সম্মুখে। তেমনি মৌন, তেমনি গম্ভীর। পাঁজর যেন ভেঙ্গে গিয়েছে তার। মুখে সুগভীর বেদনার ছায়া।

'সাধু! সাধু অন্তক!'—উৎসাহে বলে উঠলেন সর্বদর্শী বিধাতা: 'কদর্য কামকে জয় করে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করলে তুমি। কুটিল কামনায় যারা অন্ধ, তারা জানুক—শাস্তার শাস্তি কি ভয়ঙ্কর! সকল কামনার পরমা নিবৃত্তি, আজ থেকে তোমার দণ্ড হবে কাম-কিঙ্করের মহাভয়।'

বিধাতার উৎসাহে অন্তক উৎসাহিত হয় না। হায়, সপ্রজ্ঞা প্রজাপতি কেমন করে বুঝবেন, নিঃসঙ্গতার কি দুঃখ—শূন্যতার কি হাহাকার! সুখী কি করে বুঝবে দুঃখীর অন্তর্দাহ?

অন্তর্দ্রষ্টা ব্রহ্মা। তিনি সবই দেখেন, সবই বোঝেন। নিঃসঙ্গতার বেদনা তাঁর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এ বেদনা অন্তককে বহন করতে হবেই—এ বিধাতারই অভিপ্রেত। প্রশান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনার বাক্য বলেন তিনি, 'শোন অন্তক, জগতে দুরূহ মহৎ কার্যে ব্রতী যাঁরা, তাঁরা সকলেই একা—নিঃসঙ্গ। জ্ঞানী একা, যোগী একা, কর্মী একা। আত্মীয় তাঁদের বর্জন করে, প্রিয়জন মুখ ফিরিয়ে নেয়। একাই তাঁরা অগ্রসর হন কঠিন কর্মের পথে। চেয়ে দেখ, জগতের ওই শাশ্বতী গতিপথ, যে পথের পরিচালক তুমি স্বয়ং। সে পথে কে একা নয়? একা কোটি কোটি প্রাণী, একা আসে—একা যায়। একা তাদের অনন্ত পথ পরিক্রমা, একা তাদের কর্মফলভোগ। মিথ্যা ভ্রান্তি মহান্ 'এক'কে বহুরূপে প্রতিভাসিত করে। অন্তক, তুমি সেই বিরাট এককে দেখ, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি কর। এক ছাড়া দুইয়ের অস্তিত্ব কোথায়?'

নীরব হন বিধাতা পুরুষ, নীরব হয় একটি সুগম্ভীর নাদ। বিস্ফারিত নয়নে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে অন্তক—বিশ্ব জুড়ে আছে শুধু এক। কমলযোনি ব্রহ্মা, কমলাপতি বিষ্ণু, প্রলয়ঙ্করী মহাকাল—সব সেই একের অন্তর্ভুক্ত। একেরই দেহগত আকাশ, সাগর, সপ্তলোক, চতুর্দশ ভুবন। এক—এক—এক। দুইয়ের অস্তিত্ব তো নেই কোথাও!

আবার সব মিলিয়ে যায়। নির্বাক, স্তব্ধ মৃত্যু। নীরবে সে বেরিয়ে আসে। নিশ্চল গাম্ভীর্যে সে আরম্ভ করে বিধি-নির্দিষ্ট কর্ম। বিশ্বের সন্ত্রাস সে, মহাভয়াল। প্রাণঘ্নী বেদনায় সে মুহূর্তে নীল করে দেয় প্রাণময় দেহ, কোটি কোটি প্রাণীকে নিয়ে যায় জীবন-নদীর ওপারে, স্তব্ধশীতল গুহাপথে। সে নির্মোহ, নির্মম। পশ্চাতে ফেরে সহোদরার অভিশাপ। নিঃসীম একাকিত্ব!

অন্তরে ক্ষোভের সহস্র তরঙ্গ, বাইরে ক্রোধের কম্পন! অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে অন্তক। বিদ্রোহী যেন চঞ্চল রক্তকণা! মিথ্যা, মিথ্যা! কে বলে, বিশ্ব নিঃসঙ্গ? এ জগতে কেউ একা নয়। সংজ্ঞা-প্রিয় সূর্য, রোহিণী-প্রিয় চন্দ্র, পৃথিবী-প্রিয় দৌষ্পিতা। একাকী নিরানন্দ স্বয়ং ব্রহ্মা। 'একাকী ন রেমে'—পুরাণ-প্রসিদ্ধ এ বাক্য। 'একোঽহম্ বহু স্যাম্'—এ আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং প্রজাপতির। আক্রোশে উদ্যত হয় ভৈরব বাহু। একাকিত্বের বিধান কি শুধু তার জন্য?

রুদ্র উগ্রদৃষ্টিতে তাকায় পৃথিবীর প্রতি। বসন্তের আবির্ভাবে আরক্তিম প্রকৃতি, দিব্যপাটলের রক্তাম্বর পরিহিতা ধরণী যেন নববিবাহের বধূ; কণ্ঠে চম্পকমালা, কর্ণে রক্তাশোকের কুন্তল, কটিতে কুসুম্ভ মেখলা। সালোক ঋতুরঙ্গশালায় কে ওই নারী ?

'মমতা'—প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব প্রাণপ্রতিমা। এই মমতাকে চেনে অন্তক। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত এক স্ফূর্তি! মমতাকে সে দেখেছে—জায়ার প্রেমে, জননীর স্নেহে। তাকে দেখেছে গৃহীর গৃহাঙ্গনে, সেঁজুতির স্নিগ্ধ শিখায়। দেহে লাবণ্যের উচ্ছল তরঙ্গ, নয়নে মেঘের সজলতা। হৃদয়ের শান্তি, করুণার কমকান্তি মমতা। ধরণী মমতা-ধন্যা।

হুহু করে ওঠে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর হৃদয়। ক্ষুৎকাম সমাজের চিরন্তন ক্ষুধায় উন্মাদ বুঝি শোণিত-কণিকা!

তখন বসন্তের রঙ্গশালায় সঙ্গীতে ছন্দিত জীবনের স্পন্দন, নৃত্য-চঞ্চল চরণে আর চারু অঙ্গে উচ্ছল প্রাণতরঙ্গ। কৌতুকে বলছে সখীদল:

'দেখ সখি, অশোক হয়েছে লাল।'

'দেখ, বকুল হল মুকুলিত!'

'কার দোহদে অশোক লাল হল, বকুল হল গন্ধে ভোর?'

'মমতার ছোঁয়ায় প্রাণময় বনতল।'

'মমতা-ধন্য ওগো অশোক, ওগো বকুল—তোমরা প্রতিদান দাও।'

হেসে লুটিয়ে পড়ে তরুণীদল, বেদনায় ভরে ওঠে মমতার অন্তরতল। রণিত হয় কোমল করুণ কণ্ঠ, যেন সকরুণ সুরে রণিত হয় বীণার তার:

'হায় সখি, প্রতিকূল বায়ুতে ঝরে যায় অশোক, ঝরে যায় বকুল। আলোর ক্ষণিক আশীর্বাদ ক্ষণিকের ওই ফোটা ফুল! মমতার ছোঁয়ায় লাল হয়ে ফোটে, কুঁড়ি মেলে গন্ধ বিলায়। তারপর নিমেষে মিলিয়ে যায় আনন্দের বুদ্বুদ। কি প্রতিদান দেবে ওরা?'

করুণায় কম্পিত হয় মমতার নীল নয়ন, যেন বাতাহত নীলোৎপল। স্ফুরিত হয় নধর ওষ্ঠাধর। সহসা তার চোখে কিসের যেন ছায়া পড়ে। অশোকের বুকে কি প্রলয় মেঘের রক্তছায়া? বকুল, কি ছাইয়ের মত বিবর্ণ? দিনে কেন আকাশে এত তারার ফুল? কে আসে ওরা? ছায়ার মত অস্পষ্ট অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কোটি কোটি জীবাণু! দ্রুতবেগে দক্ষিণদিকে ছুটছে ওরা। ওদের পুরোভাগে অন্ধকারের মত বিশালকায়, রক্তাম্বর পরিহিত এক পুরুষ। কে ওই ভয়াল! প্রাণের আনন্দ-নিকেতনে কার আবির্ভাব?

ভয়ে একবর্ণময় বাক্য, ঊর্ধ্বহ শ্বাস, বিঘূর্ণিত দৃষ্টি, পরিশুষ্ক কণ্ঠ—করুণ চিৎকার করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মমতা। আতঙ্কে ছুটে পালাল সখীদল।

দ্রুত এগিয়ে এল ক্ষুধাতুর অন্তক, দ্রুত ভূমিতে জানু স্পর্শ করে বসল সে, দ্রুত উগ্র দৃষ্টিতে তাকাল মমতার দিকে। কিন্তু একি! একি পাণ্ডুরতা রক্তাধরে! সূর্যোদয়ে নিমীলিত কুমুদিনীর মত সঙ্কুচিত আঁখি, চন্দ্রোদয়ে মুদ্রিত পঙ্কজের মত ম্লান বদন। শব্দহীন চারু অঙ্গ। ধীরে সে স্পর্শ করল মমতার দেহ। সুতীব্র হিম-শিহরণ খেলে গেল নিজেরই সর্বাঙ্গে। এ যে তুহিনশীতল। সে করেছে কি? মুহূর্তের আত্মবিস্মরণ। সে আকর্ষণ করেছে মমতার প্রাণ—রাহুর মত গ্রাস করেছে রাকা চন্দ্র।

বেদনায় নয়, ক্রোধে রক্তনীল অন্তক উঠে দাঁড়ায়। বসন্তের রক্তরাগ আচ্ছন্ন হয়েছে শীতের ধূমল ধূসরতায়। সে সর্বান্তক, জীবের মহা অবসান। সে নিমীলন, সে প্রলয়। প্রলয়ই সৃষ্টি করবে সে। ফণা তুলে খাড়া হল জলজটা, মাথা তুলে দাঁড়াল সূচিমুখ শঙ্কুর মত রোমাবলী। জলজল করে উঠল পিঙ্গল চক্ষু যেন রুধিরবর্ষী রক্তমেঘ। উদ্যত পাশ উদ্যত দণ্ড। ভয়ঙ্কর ছায়াটা চলতে শুরু করল।

ব্যর্থকাম ক্ষ্যাপা প্রেমিকের বিকট ক্ষ্যাপামি। নিয়মের রাজত্বে স্বেচ্ছাচার উত্তাল হয়ে উঠল। সবুজ শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হল, শ্মশানভূমিতে পরিণত হল জনপদ। মাতার অশ্রু আর জায়ার রক্তসিন্দূরে প্রবাহিত হল রক্তসিন্ধুর স্রোত। মুহূর্তে অশান্ত ক্রন্দন, মুহূর্তে অনন্ত স্তব্ধতা।

কল্যাণী সৃষ্টির প্রতি করুণাঘন নয়ন মেলে তাকালেন কমলযোনি। বেদনায় উন্মথিত চিত্তপ্রদেশ, নয়নে ছলছল অশ্রু। মহাভয়ঙ্কর উন্মাদকে আহ্বান করে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন তিনি, 'পাগল, দেখ তোমার কীর্তি! দেখ, আমার সৃষ্টির করুণ দৃশ্য!'

সংরক্ত নয়নে স্বীয় সংহার-লীলার প্রতি তাকাল অন্তক। শূন্যতায় রিক্তা বসুমতী। সম্বিৎ যেন ফিরে এল। অপরাধীর মত মস্তক অবনত করে দাঁড়াল সে, বিচারক বিধাতা পুরুষ।

প্রথমে স্নেহদ্রব কণ্ঠেই বললেন প্রজাপতি, 'ব্যক্তিগত স্বার্থে শক্তির প্রয়োগ—শক্তির অপব্যবহার। তোমাকে আমোঘ উৎক্রান্তিদা শক্তির অধিকারী করেছি, তোমার হাতে তুলে দিয়েছি প্রাণঘ্নী বেদনা। সে কি স্বেচ্ছাচার সৃষ্টির অভিপ্রায়ে? এ তুমি করেছ কী?'

উত্তেজিত হলেন অমিততেজা ব্রহ্মা। কঠিন কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তুমি কি

ভেবেছ, তোমার শক্তির ওপর শক্তি নেই? তুমি কি জান না, বিরাট বিশ্বশক্তির নিকট তৃণের মত তুচ্ছ তোমার দণ্ড। তোমার অধিকর্তা কাল, কালের অধীশ্বর বৈবস্বত যম, যমের নিয়ন্তা মহাকাল রুদ্র। মহাকাল—যিনি কল্পান্তে সমগ্র সৃষ্টি কলন করেন—তাঁরও কলন-কর্তা সেই বিশ্বশক্তি। সৃষ্টির মহাভয় সেই শক্তির প্রশাসনে সূর্য উদিত হয়, মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়। তারই প্রশাসনে সন্ত্রস্ত মহাকাল, যম, চণ্ডবেগ কাল। সে শক্তির কথা কি জান না তুমি?'

সঙ্কোচে তৃণের মতই যেন মাটিতে মিশে যায় অন্তক। বজ্রস্বরে নিনাদিত হয় স্রষ্টার কণ্ঠ: 'তোমার শক্তি আকর্ষণ করে কাকে? কার ওপর বিস্তৃত হয় তোমার অধিকার? এ জগতে ক্ষুদ্র যারা, কামকিঙ্কর, ভীরু যারা—মৃত্যুর পূর্বে সহস্রবার বরণ করে মৃত্যু, অজ্ঞান যারা—মোহান্ধ—তারাই তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়। তুমি কি পার কীর্তিমানের কীর্তি গ্রাস করতে? পার কী অমৃতলোকের যাত্রীর প্রাণ আকর্ষণ করতে? ওই চির-চলমান মহাজীবন—কালপ্রবাহে ভাসমান অক্ষয় অমর জীবন—তুমি কি পার তার গতিরোধ করতে? তুচ্ছাতিতুচ্ছ নিত্য প্রলয় তুমি, মহাজীবন প্রবাহের ক্ষণিক ছেদ—তাতেই এত গর্ব। কল্পান্তে বা প্রস্তিসঙ্করে কোথায় থাকে তোমার অস্তিত্ব?'

কম্পিত হয় মৃত্যু, যেমন মৃত্যুর নামে কম্পিত হয় মোহান্ধ জীব। রুদ্রস্বরে বলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, 'বিনা কারণে মমতার বন্ধন ছিন্ন করেছ তুমি! হে মমতাকর্ষণ, তাহলে কঠিন সত্যে পরিণত হোক এই বিধিবাক্য—'দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি ন মমেতি চ'—মমত্ব হোক বন্ধন-মৃত্যুর কারণ। কামনায় খিন্ন হয়ে ছিন্ন করেছ স্নেহের শৃঙ্খল—চিরকাল বঞ্চিত হও স্নেহ-মমতা থেকে, ভোগের সুধাপাত্র, গরল হয়ে উঠুক তোমার হাতে। মমতার অন্তকারী রূপে চিরশূন্য হোক তোমার জীবন।'

নীরব হন ব্রহ্মা। অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে অন্তক। ক্রোধের মূর্ত প্রতীক সে, ক্রোধবশ। আজ নিরুদ্ধ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ—কে যেন কঠিন বন্ধন-রেখা টেনে দিয়েছে দুর্দম স্রোতোমুখে। আজ সংরুদ্ধ রোষ, সংক্ষুব্ধ গর্জন—আজ শুধু শুষ্ক উত্তাপ।

সে অভিশাপ, সৃষ্টির অভিশাপ! সে সর্বান্তক—বিশ্বের আতঙ্ক। পণ্ডিত-মূর্খ, বলবান-দুর্বল, সম্রাট-দরিদ্র—সকলের কাছে সে মহাভয়। 'নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ'—এ যেন চরম বিভীষিকা। কেউ তাকে প্রার্থনা করে না—না নর, না নারী। সে একা। জীবন তার শূন্য হাহাকার!

হৃদয়ে অন্তর্গূঢ় বিষস্ফোটকের যন্ত্রণা, মস্তিষ্কে সুতীব্র জ্বালা, দেহময় প্রচণ্ড

প্রদাহ। শান্তি নেই স্বস্তি নেই। পাগলের মত সে ছুটে যায় পুষ্পিত ছায়াবীথিকায়, নিমেষে মিলিয়ে যায় ছায়া, দগ্ধ হয়ে যায় সরিৎ-সরোবর। ব্রহ্মঘাতক নীল লোহিতের মত অভিশপ্ত, জ্বালাময় তার জীবন। রুদ্র নীললোহিত—তিনি একদিন শাপমুক্ত হয়েছিলেন ; কপাল-মোচন তীর্থে প্রেমময়ী কপালীর স্নেহস্পর্শে শান্তি পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু হায়, অন্তকের জীবনে কে বর্ষণ করবে সুধাধারা ? সুধাপাত্র তার স্পর্শে গরল হয়ে যায়। মমতাকে হত্যা করেছে সে। কামনার বজ্রাঘাতে সে পঙ্গু, কামিনীর অভিশাপে সে নিঃসঙ্গ। জগতে সুদুর্লভ প্রেম !

রক্তাক্ত অন্তর বিদীর্ণ করে জাগে দীর্ঘশ্বাস, জাগে শুষ্ক ক্রন্দন। অশ্রুহীন ক্রন্দন। বিরাট পাষাণ-শিলার মত, শুষ্ক তার দেহ। নিষ্প্রাণ পাষাণে অভাব প্রাণময় অশ্রুর। সে নীরস, ভৈরব—নির্দয়, নিষ্করুণ।

অথচ অশ্রুময়ী পৃথিবী। ওই গৃহপ্রাঙ্গণে কাঁদছেন জননী। কি আকুল করা ক্রন্দন ! কোথাও বক্ষে করাঘাত করে কাঁদছেন পিতা—শোকের উন্মাদ মূর্তি ! ওই শোকাতুর পতি, ওই শোকাতুরা পত্নী। অশ্রুতে বিধৌত সিঁথার সিঁদুর ! অশ্রুর কি শেষ নেই ? নিখিল বিশ্বে উত্তাল অশ্রুসিন্ধু !

অসহ্য মনে হয় অন্তকের। অস্থির হয়ে ওঠে সে। সেই তো অবারিত করেছে অশ্রুর উৎস। নিজে অশ্রুহীন, কিন্তু জগৎ পারাবারে অশ্রুর প্লাবন তারই সৃষ্টি। কঠিন দায়িত্বভার অর্পণ করে অভিশাপ দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ।

বিষতিক্ত সংসার। সংসারে অপাংক্তেয় সে। অন্ত্যজের মত সে এসে দাঁড়ায় শ্মশানপ্রান্তে।

ধীরে প্রদোষের ছায়া নামে। এমনি করেই আলোর জগতে নামে মৃত্যুর শুভ্র যবনিকা। অদূরের শ্মশান—মৃত্যুর নির্মম বিজয়-কীর্তি। স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অন্তক। লকলক করে জ্বলছে ঊর্ধ্বশিখ অগ্নি—তার জয়ধ্বজা। চিৎকার করছে অসংখ্য শিবা—তার জয়ধ্বনি।

সহসা শিউরে ওঠে অন্তক। বিজয়ের আশীর্বাদ নয়, বঞ্চিতের অভিশাপ যেন রূপ ধরেছে অন্ধকার শ্মশানে ! অন্ধকার যেন রাক্ষসের মত করাল গ্রাস বিস্তার করেছে। রক্তরাঙা নয়ন মেলে তাকিয়েছে ক্রব্যাদ চিতাগ্নি—কাদের যেন রক্তচক্ষু। সহস্র শিবার চিৎকার যেন উন্মত্ত প্রতিহিংসার গর্জন।

অভিশাপ ! অভিশাপ যেন তুরন্ত গতিতে ছুটে আসছে অন্তকের দিকে। ব্রহ্মার অভিশাপ, সহোদরার অভিশাপ, স্বজনবিরহিত আত্মায়ের অভিশাপ। অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করছে প্রিয় মাতা, প্রিয় পিতা, প্রিয় ভ্রাতা, প্রিয় ভগ্নী

প্রিয় পতি, প্রিয় পত্নী। অনাথ শিশু, তারা অবুঝ—উচ্চকণ্ঠে দারুণ অভিশাপ দিচ্ছে তারা। চিতাগ্নির হুহু শ্বাসে অভিশাপ, শিবাকণ্ঠে ধ্বনিত অভিশাপ, বাতাসে প্রতিধ্বনিত অভিশাপ। নিখিল বিশ্বের মর্ম থেকে উচ্চারিত ভয়াল অভিশাপ!

পলায়নের পথ পায় না অন্তক। রোমহর্ষক ভীতি! শিহরিত আপাদমস্তক। কোথায় আশ্রয়? সম্মুখে সেই গুহাহিত পথ। পাগলের মত ত্রস্তে সে সেই বন্ধ্রপথে পদক্ষেপ করে।

অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। অন্ধকারে আজ আতঙ্কগ্রস্ত অন্তক। পরিচিত পথ—তবু সর্বাঙ্গে ছমছম! অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে উঠছে যেন বিকট, অশান্ত চিৎকার—চিৎকার উঠছে বন্ধ্রহীন, নিস্তব্ধ গুহাপথ থেকে। অভিশাপ দিচ্ছে কি প্রিয়তম বান্ধব? অভিশাপ দিচ্ছে বুঝি কোটি কোটি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ সত্তা।

সভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে অন্তক—যেন বজ্রভয়ে দ্রুত ছুটে চলে বিশাল মন্দর—যেন অঙ্কুশ-তাড়িত হয়ে উন্মাদের মত ছুটে চলে ঐরাবত। আতঙ্কগ্রস্ত ভীষণ মৌন, প্রচণ্ড তার গতি। পশ্চাতে পড়ে থাকে সংসার, পড়ে থাকে গহন গুহাপথ, পড়ে থাকে বিশাল সংযমনী পুরী। অন্ধ উন্মাদের মত সে এসে উপস্থিত হয় সেই শাশ্বতী শুক্লকৃষ্ণ গতিপথের সংযোগস্থলে।

ভয় কাটে, কিন্তু হুহু করে ওঠে সমগ্র অন্তরাত্মা। ঊর্ধ্বে নভোমণ্ডলে ওই দেবযান, অর্চিরভিমানী দেবলোকের পথ। অমৃত ও অভয়ের আশীর্বাদ। সহস্র ধারায় ঠিকরে পড়ছে অজস্র আলোর ধারা। জ্যোতির তরঙ্গে সঙ্গীতমুখর উত্তরায়ণ। কিন্তু সে?

আলোর আঘাতে কাঁপছে কি পাষাণশিলা? কাঁপছে কি অন্ধ গুহার পাষাণচাপা নির্ঝর? বুকে কিসের যেন অশান্ত কম্পন!

একি! কোথা থেকে শুষ্ক পাষাণে এল জল? কোথ থেকে উত্তাল হল ভাদ্রপদ কোটাল? অন্তকের নয়নে অশ্রু! শুষ্ক নয়নে প্রাণের মুক্তধারা!

কোনদিন কাঁদে নি সে। আজ কাঁদছে—অঝোর ধারায় কাঁদছে নির্মোহ নির্মম, নিষ্করুণ মৃত্যু। দুই নয়ন বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে স্বর্গগঙ্গার সুশুভ্র মুক্তাধারা।

নির্নিমেষ নয়নে অন্তক তাকিয়ে থাকে সেই নয়ন-ধারার প্রতি। অঞ্জলি পূর্ণ করে সে ধরে রাখতে চায়—ধরে রাখতে চায় প্রাণের এই সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু পারে না। বদ্ধাঞ্জলি ছাপিয়ে সে অশ্রুধারা সংযমনী পুরী অতিক্রম করে—অনন্ত অন্ধকারময় গহন গুহাপথ বেয়ে মুক্ত অশ্রুধারা কলকল শব্দে ছড়িয়ে পড়ে মর্ত্যে। অভিশপ্ত মৃত্যুর অশ্রান্ত অশ্রু উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, প্লাবিত হয় ধরাতল।

শুষ্ক বক্ষ-নিংড়ানো এই অশ্রুই মৃত্যুর অভিশাপ মোচন করেছে। বিধাতা বলেছিলেন, এই অশ্রু ভয়ঙ্কর ব্যাধিরূপে জীবকে আক্রমণ করবে—ব্যাধির আক্রমণেই নির্জীব হবে জীবকুল। মানুষ ব্যাধিকেই অভিশাপ দেবে, মৃত্যুকে নয়। কিন্তু অভিশাপমুক্ত হয়েছে কি অন্তক? মৃত্যুর তপ্ত অশ্রু কি রোধ করতে পেরেছে বিশ্বের অশ্রু-অভিশাপ। ভীষণ রহস্যময় সেই ছায়াদেহকে কি প্রিয় বলে গ্রহণ করেছে কেউ? অলক্ষ্যচারী মৃত্যু আজও অভিশপ্ত, আজও অবাঞ্ছিত, আজও একা। মৃত্যু বিভীষিকা, মৃত্যু অনন্ত মৌন, মৃত্যু বিরাট রহস্য।*

* স্ত্রীরূপিণী মৃত্যুর কাহিনী রয়েছে মহাভারতে (শান্তিপর্ব ২৫৩ অঃ) এখানে মৃত্যুকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। মমতা-মৃত্যু কাহিনী রূপক।

# ॥ স্মৃতিহরা ॥

অন্ধকার নিশীথ রাত্রি। বিশাল নির্জন প্রান্তরে দিগ্‌ভ্রান্ত পথচারী। কোন্ দূর জলাভূমিতে জ্বলে উঠেছে আলেয়া—আলোর মায়া। দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে ভয়ার্ত ভ্রান্ত পথিক—তার চোখে আশার নেশা। দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আলো। বিভ্রমবতী আলেয়া ভুলিয়ে সর্বনাশ করছে পথিকের।

উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের দগ্ধ মরুভূমি। প্রচণ্ড সূর্যের দহনে ধুধু করছে বালু। তাপিত তৃষ্ণার্ত মরুযাত্রী—যেন কশাহত উচ্চৈঃশ্রবা, যেন অঙ্কুশ-তাড়িত ঐরাবত। সহসা তার নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠল মরীচিকা—মরুর মায়া। নয়ন-বিমোহন মরূদ্যান—শীতল ছায়াতরু, স্বচ্ছ সরসী-নীর। দ্রুতবেগে ছুটে চলল তৃষিত পান্থ। হায়! দূরে—আরো দূরে মিলিয়ে গেল মরীচিকা। অদ্ভুত এ ভ্রান্তি।

ওই ভূতলে নন্দনবনসম পঞ্চবটী। রাজপুত্র, রাজবধূ এসেছেন নির্বাসনে। জীবনে দুঃখ নেই তাঁদের। বন যেন প্রজায় পূর্ণ জনপদ। সুখের সংসার। তাঁদেরও ভ্রান্তি। সজীব সোনার হরিণ এসেছে বনে। কি অভিরাম স্বর্ণাজিন! কি সুন্দর স্বর্ণশৃঙ্গ। বধূর প্রার্থনায় মৃগের প্রতি ধাবিত হলেন ঋষিবেশী রাজপুত্র। হায় মায়া। স্বর্ণমৃগ—সে কি সত্য? তবু ভ্রান্ত হলেন নররূপী নারায়ণ।

কে এই মোহিনী, যার মায়ায় মোহিত ত্রিভুবন? কে এই নিকৃতি-নিপুণা, যে প্রতি মুহূর্তে ছলনা করে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে? আলেয়ার মত রূপসী, মৃগতৃষ্ণিকার মত মায়াবিনী—কে এই বিভ্রমবতী?—স্মৃতিকে নিমেষে ডুবিয়ে দেয় বিস্মৃতির অতল সাগরে?

নাম তার 'স্মৃতিহরা'। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে বিশ্বের স্মৃতি হরণ করছে সে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংসারীর ওপর বিস্তৃত তার ভীষণ মায়াজাল। ভয়ঙ্করী সে, স্মৃতির প্রলয়ঙ্করী। বিষকন্যার মত বিভ্রমবতী।

শুক্র-শোণিতে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হয় জীবসত্তার বীজাঙ্কুর। ক্রমে গঠিত হয় অঙ্গপঞ্চক, উপাঙ্গ। উদ্ভবকোষে বর্ধমান সত্তা—পূর্বজন্মের সংস্কার ও স্মৃতির একটি বুদ্‌বুদ—অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল। গর্ভবাস যন্ত্রণায় কাতর সে, প্রতিজ্ঞা করে—আর দুষ্কর্ম নয়, এ জন্মে সুকৃতি অর্জন করব, সুগতি

লাভ করব। সহসা স্মৃতিমারুত তাকে আকর্ষণ করে, উদর থেকে অধঃশিরায় নিষ্ক্রান্ত হয় জীব। জন্মমাত্র অলক্ষ্যে আসে 'স্মৃতিহরা', মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে গর্ভস্মৃতি। কোথায় জীবের জ্ঞান? কোথায় তার কল্যাণী ইচ্ছা? —'বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি।' ভ্রষ্ট স্মৃতি, মোহগ্রস্ত জীব আবার সংসার-মায়ায় বদ্ধ হয়। আবার কাম, আবার ক্রোধ, আবার পঞ্চেন্দ্রিয় ষড়রিপুর তাড়না। এমনি করে কৈশোরে, পৌগণ্ডে, যৌবনে, বার্ধক্যে— জীবন ভরে চলে স্মৃতিহরার লীলা। তারপর জীব উপস্থিত হয় মৃত্যুর দ্বারে। তখনও অপূর্ব মোহিনীর বেশে আসে মৃত্যুদূতী 'স্মৃতিহরা'। পশ্চাতে প্রিয়জনের করুণ ক্রন্দন, সম্মুখে বিভ্রমবর্তী স্মৃতিহরার রূপমায়া। অলক্ষ্য শক্তি বিস্তার করে সে স্মৃতি আকর্ষণ করে। চেতনাশূন্য জীব মূর্ছিত হয়, বুঝতেও পারে না, কে কাঁদে, কে আকর্ষণ করে। তারপর ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আশ্চর্য সে স্মৃতিলোপ!

অতি ভীষণ স্মৃতিহরার ক্ষ্যাপামি। উন্মাদিনীর মতই সে জ্ঞানশূন্যা। তার নিজের স্মৃতিভ্রংশতা আরও শোচনীয়। অথচ সে রূপসী। আলেয়ার মত, মরীচিকার মত, স্বর্ণমৃগের মত তার বিভ্রান্তিকর রূপ। অবশ্য রূপের সে জলুস আজ আর নেই। তবু যেটুকু অবশিষ্ট আছে, চুম্বকের মত তার আকর্ষণ। আজ তার কটা কটাক্ষ, জটার মত কুটিল কেশ, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দন্তপংক্তি, অভিক্ষত অলক্তসম চরণ। আজ-উগ্রা ভৈরবীর মত সে ভীষণা। তবু মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে জাগে সেই রহস্যময়ী রূপ, চপলার মত চকিতে চমক দেয় সেই মোহিনী হাসি। মানুষ মোহগ্রস্ত হয় তারই মায়ায়।

রূপের কেন এমন বিপর্যয়? ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের কেন এমন শোচনীয় পরিণাম? নয়নে উজ্জ্বল দীপ্তি, সুরেলা হৃদয়তন্ত্রী কি ছিল না তার? কেমন করে নিবলো নীল নয়নের জ্যোতি—এল আলেয়ার পাণ্ডুরতা? কিসের কঠিন আঘাতে ছিন্ন হল হৃদয়-বীণার তার?

—সে এক লোক-বিশ্রুত সকরুণ, পুরাণ কাহিনী:

কমলযোনি ব্রহ্মার সত্ত্বগুণাত্মক কলেবর থেকে একে একে উৎপন্ন হয়েছে সত্ত্বগুণাধার ধর্ম, ধর্মপ্রভব দেব-দেবতা, ঋষি। তাঁর তমোমাত্রাত্মিকা তনু থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহামোহ অধর্ম, অধর্ম-প্রভব ক্ষুৎকাম অনাসৃষ্টি; হিংসা, ক্রূরতা, মিথ্যামতি, দুঃখ, ভয় বেদনা—বিশ্বের বিভীষিকা এরা। এই বংশেরই আর একটি লোকত্রাস সন্তান 'দুঃসহ'।

দুঃসহ চিরক্ষুধাতুর, চির অধোমুখ, চির অসহিষ্ণু। প্রচণ্ড ধর্মবৈরী সে। তার ভার্যা 'নির্মাষ্টি'। নির্মাষ্টি যমদুহিতা। যেমন কুটীলা, তেমনি ভয়ঙ্করী। এই দুঃসহ-নির্মাষ্টির ষোড়শ সন্তান—আট পুত্র, আট কন্যা। তথোক্তি, পরিবর্ত, অঙ্গধ্রুক্ প্রমুখ পুত্র অতি ভীষণ জগৎ অমঙ্গলের নিদান: নিয়োজিকা, ভ্রামণী, স্বয়ংহারিকা প্রভৃতি কন্যা বিশ্ব-বিভীষিকা। বিনাশকালে এরাই জীবকে আক্রমণ করে, অধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে প্রাণীকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়। দুঃসহের প্রত্যেকটী সন্তান সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত ও মৃত্যুদূতী। দৌঃসহগণের দৌবাত্ম্যে ব্যাপ্ত নিখিল জগৎ।

এই দুঃসহ-নির্মাষ্টির অন্যতমা নন্দিনী 'স্মৃতিহরা'। নিখিল মানুষের দুঃখের কারণ সে। সে কামগতি, কামচারিণী, ছলনাময়ী। সে বিদ্বেষিণী—বিশ্বের বুকে দারুণ অক্ষমা। স্মৃতির প্রলয় সৃষ্টিতে সে অদ্বিতীয়া।

কিন্তু আকৃতির দিক থেকে দুঃসহের কুলে আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই স্মৃতিহরা। অদ্ভুত তার রূপ: সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন রূপ সমুদিত একটীমাত্র সন্ধ্যাতারার, প্রলয়রাত্রিতে যেমন রূপ চঞ্চলা চপলার—তমোময় তামসকুলে তেমনি রূপ এই কন্যার। মনোহরা স্মৃতিহরা যেন তমিস্রার দীপশিখা।

কৃষ্ণকায় মিথুন-সমাজে কোথা থেকে এল এই প্রভাতরল জ্যোতি—ভেবে পায় না মাতাপিতা। এ যে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর চুরিকরা অঙ্গকান্তি। নয়নে সুরাঙ্গনার স্নিগ্ধ দীপ্তি, ভ্রূবিলাসে স্বরপ্সরীর ভঙ্গি, অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যাধরীর লাস্য। রুচিরা স্বর্গশ্রী যেন শাপভ্রষ্টা হয়ে এসেছে অধর্মের বংশে। বারেক দর্শনে সে কান্তিচ্ছটা নয়নদ্বয় মোহিত করে, দেহে জাগায় উন্মাদনা। পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত হয় মন, লুপ্ত হয় স্মৃতির সূত্র। সকলে আদর করে তাকে ডাকে বিভ্রমবতী, উন্মাদিনী। তার সার্থক নাম স্মৃতিহরা।

'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'—ভাবে দুষ্টমতি দুঃসহ। কিন্তু তার রাজ্যে কোথায় এমন যোগ্য পাত্র? কুরূপ, কদাকার, ভীষণদর্শন প্রজায় পূর্ণ অধর্মের কুল—কেউ বিকলাঙ্গ কেউ বিকৃত। সুন্দর-দর্শন পুরুষ ধর্মরাজ্যের অধিবাসী। যেমন শুদ্ধ তাদের অন্তর, তেমনি নয়ন-মোহন রূপ—যেন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত সুন্দর প্রতিকৃতি।

অনেক চিন্তার পর দুঃসহ এসে উপস্থিত হল রাজা ঔশীনর শিবি-পুত্রের সভায়। ত্যাগশুদ্ধ নির্মল শিবিবংশ, দানধর্মে প্রতিষ্ঠিত ঔশীনর কুল! শিবিপুত্র নিজে যেমন ধর্মশীল, তেমনি রূপবান। অশ্বিনীকুমারের মত তাঁর রূপ, শশাঙ্ক-

সদৃশ কান্তি। দুঃসহ ভাবল, রূপবান অবশ্যই রূপের মর্যাদা রক্ষা করবেন। তাই রাজাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে, 'আমার বংশে কমলাক্ষী কমলার মত প্রস্ফুটিত হয়েছে এক কমলিনী। নাম তার স্মৃতিহরা। রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপ—রাজ-ভোগেরই যোগ্যা। তার লক্ষণ পরীক্ষা করে আপনি তাকে গ্রহণ করুন।'

যোগ্যকে সমাদর করা রাজারই কর্তব্য—ভাবলেন, শিবিধর্মে প্রতিষ্ঠিত ঔশীনর। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করলেন দুঃসহের গৃহে।

যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত্রুটি হল না। ব্রাহ্মণেরা এসে উপস্থিত হলেন পরীক্ষাগৃহে। বিচিত্র আসন, বিচিত্র ভোজন-পাত্র, বিবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার্য। 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ'—কিন্তু নৃত্যের কথা ভুলে গেলেন ব্রাহ্মণবর্গ। আহার্যের চেয়েও আকর্ষণীয় এক রূপপ্রতিমা তাঁদের সম্মুখে। সে স্মৃতিহরা। দীপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গবর্ণ, পরিধানে শুভ্র চীনাংশুক। শুভ্র অভ্র ভেদ করে যেমন ষোড়শকলায় প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ চন্দ্র, তেমনি সূক্ষ্ম রেশম ভেদ করে পূর্ণ প্রকাশিত নবযৌবনের ফুল্ল সুষমা। সযত্ন-গঠিত অঙ্গে, সযত্ন-বিন্যস্ত আভরণ—যেন একখানি রহস্যময় স্বপ্ন!

বিমুগ্ধ লক্ষণবিদ্ বটুবৃন্দ। 'অহো রূপম্ অহো রূপম্' ভাবতে ভাবতে স্মৃতি-বিভ্রম ঘটল তাঁদের। বিকলচিত্তে হাস্যকর কাণ্ড করে বসলেন তাঁরা। কেউ আসন ভেবে বসে পড়লেন আহার্যস্থালীতে, কেউ আহার্য মনে করে আসনকেই তুলে ধরলেন মুখে; কারও বা আসনে উপবেশন করতে গিয়ে হল পদস্খলন, কেউ বা 'প্রাণায় স্বাহা' বলে আহার্য দ্রব্যকে অর্পণ করলেন মস্তকে।

অস্থিরচিত্ত এই বটুবৃন্দ পরীক্ষা করবে তার রূপ?—চারু দন্ত পংক্তি বিকাশ করে উচ্চ সশ্লেষ হাস্য করে উঠল কুটিলা স্মৃতিহরা। লজ্জিত হলেন লক্ষণ-বিশারদ ব্রাহ্মণ। পরমুহূর্তে ক্রোধে আরক্ত হলেন তাঁরা। অতি ভীষণ অপমানিতের ক্রোধ। সত্যকে আচ্ছন্ন করে রুদ্ররোষ। রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে মিথ্যাবাক্য বললেন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ, 'অপ্সরী নয়, এক কালকর্ণী যক্ষী। সম্রাজ্ঞী হবার যোগ্যা সে নয়।'

বিনাবিচারে তাঁদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করলেন ধর্মভীরু ঔশীনর। নির্লোভ, সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁরা মিথ্যাই বা বলবেন কেন? দুঃসহের গৃহে সংবাদ প্রেরিত হল—স্মৃতিহরাকে গ্রহণ করা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়।

ক্রোধে উত্তপ্ত হল স্মৃতিহরা। এত দর্প রাজার? তিনি কি এতই নির্মোহ

যে স্মৃতিহরার রূপ তাঁর কাছে তুচ্ছ! একবার যদি সুযোগ আসে, দেখে নেবে সে, কত বড় যতাত্মা রাজা ঔশীনর। রুষ্টা হয়ে রইল আহতা ভুজঙ্গিনী। সুযোগ পেলে সে বিষোদ্গার করবে।

ঔশীনরের পরম বন্ধু, আবাল্যের সহচর, সুযোগ্য সেনাপতি অহিপারক। ধর্মবুদ্ধিতে ও কর্তব্যে সে অবিচল। সে শাস্ত্রপারঙ্গম অস্ত্রাভিজ্ঞ। রাজা স্মৃতিহরাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন জেনেই, সে তাকে বিবাহ করল। রাজা জানলেন না, আহতা নাগিনী আশ্রয় পেয়েছে তাঁরই রাজ্যে, দংশন করার সুযোগ খুঁজছে সে। বন্ধুবৎসল অহিপারকও জানতে পারে নি পত্নীর অভিসন্ধি। সে শুধু জেনেছে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে—আশ্চর্য স্মৃতিহরার উন্মাদিনী শক্তি, অতিশয় বিভ্রান্তিকর তার রূপ। ইচ্ছা করলে যে কোন মানুষকে সে উন্মাদ করতে পারে।

সেদিন শিবিরাজ্যে কার্তিকী পৌর্ণমাসী উৎসব। চন্দ্রিকাস্নাত, আলোকমালায় সজ্জিত সন্ধ্যায় এইদিন রাজা নগর প্রদক্ষিণ করেন, গৃহের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে বিতরণ করেন দৃষ্টি-প্রসাদ। অহিপারকের গৃহে থাকবার উপায় নেই—নগর সীমান্তে অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ কবার দায়িত্ব তার ওপর। বহির্গমনকালে স্মৃতিহরাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'আজ কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নিশ্চয় আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হবেন। তাঁকে দর্শন দিও না তুমি।'

'কেন, ভয় কিসের?'

'ভয় তোমার উন্মাদক রূপের।'

'রূপজয়ী রাজর্ষি ঔশীনর। তিনি নির্মোহ।'

'রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও নির্মোহ ছিলেন, তাঁরও পরাজয় হয়েছিল।'

'বিশ্বামিত্রের চেয়েও অজেয় তোমার রাজা, তিনি নিষ্কাম। প্রভুভক্ত সেনাপতির স্ত্রীর কর্তব্যই পালন করব আমি।'

বর্মচর্মে আবৃত অহিপারক বহির্গত হল নিজের কর্তব্যপথে। জলজ্বল করে উঠল স্মৃতিহরার হিংসাকুটিল চোখ। প্রত্যাখ্যানের মর্মজ্বালায় অস্থিরা রূপপ্রমত্তা। আজ প্রতিশোধ নেবার মাহেন্দ্র যোগ। দাসীকে নির্দেশ দিল সে, 'রাজা উপস্থিত হলেই সংবাদ দিবি আমাকে।' স্বভাবসুন্দরী তিলোত্তমা তারপর মনোনিবেশ করল অঙ্গপ্রসাধনে। কন্দর্পের দর্পহরণ করতে হবে আজ।

ক্রমে প্রতীচী সীমান্তে অস্তে গমন করলেন দীপ্ত দীধিতি দিবাকর, পূর্বাচলে দেখা দিলেন যামিনী শ্রীচন্দ্র। মহাতেজা মহর্ষি অত্রির নয়ন-সম্ভূত স্নিগ্ধ তেজে

সোমের জন্ম—পূর্ণিমায় তাঁর পূর্ণ সমৃদ্ধি। সুস্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করে সমগ্র সৃষ্টিতে রসসঞ্চার করেন তিনি। রসময় হয়ে ওঠে ওষধি-বনস্পতি, প্রাণচাঞ্চল্যে উন্মাদ হয় নিস্তরঙ্গ সাগর। এই চন্দ্রোদয়ে শিবিপুরী অপূর্ব শোভা ধারণ করল। গৃহচূড়ায় দীপমালার দীপালি, পুষ্পহারে সজ্জিত গৃহতোরণ। পূর্ণচন্দ্র, ফুল্লকুসুম, উজ্জ্বল দীপালোক, মধুর সঙ্গীত। উৎসবমত্তা শিবিপুরী যেন দ্বিতীয় অমরাপুরী।

অহিপারকের গৃহও আজ সৌন্দর্যশোভায় সুসজ্জিত। শুভ্র স্ফটিকে নির্মিত দ্বিতল মর্মর প্রাসাদ, প্রাচীর-গাত্রে মনঃশিলার মণিদীপ্তি। রাত্রির সহস্র চক্ষুর মত জ্বলজ্বল করছে তাদের দ্যুতি। তোরণে সহস্র দীপসজ্জা, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত প্রাসাদ-প্রাকার।

প্রজাবৎসল প্রিয়দর্শী রাজা ঔশীনর বহির্গত হয়েছেন নগর-ভ্রমণে। সপ্তাশ্ব-বাহিত রথ চলেছে মৃদুমন্দ গতিতে। অগ্রে, পশ্চাতে পাত্র, মিত্র, সভাসদ। বাদ্যভাণ্ডে মুখর উৎসব যাত্রা। প্রিয়দর্শন রাজা আজ দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি-প্রসাদ বিতরণ করছেন। উন্মুক্ত পুর-বাতায়ন। গবাক্ষপথে সহস্র পুরনারীর নীল উৎসুক নয়ন রাজাকে অভিনন্দিত করছে। ওপর থেকে ধারাসারে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, বর্ষিত হচ্ছে পবিত্র, শুভ্র লাজাঞ্জলি। আজ রাজায়-প্রজায় মিলন, আজ রাজায়-প্রজায় দৃষ্টির কোলাকুলি। ধন্য রাজা, ধন্য তাঁর প্রজা।

উৎসব-যাত্রা এসে দাঁড়াল অহিপারকের গৃহ-তোরণে। কি আন্তরিক নিষ্ঠা। রাজা জানেন না, কার এ গৃহ, কে গৃহস্বামী। যে-ই হোক, রাজভক্ত প্রজা। উৎসবের মর্যাদা যথাসাধ্য রক্ষা করতে যত্ন করেছে সে। পরিতৃপ্ত রাজার রথ এসে থামল বহির্দ্বারে।

দাসী এসে ত্বরিতে স্মৃতিহরাকে জানাল রাজার আগমন সংবাদ। সর্বশৃঙ্গার-বেশাঢ্য সজ্জা, পুষ্পকরণ্ড হস্তে স্মৃতিহরা এসে দাঁড়াল বাতায়ন পথে। বঙ্কিম নয়নে বঙ্কিম কটাক্ষ। কিন্নরীলীলায় রাজার মস্তকে সে পুষ্প বর্ষণ করল। দাসীরা বাজাল শুভ শঙ্খ।

সবিস্ময়ে ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করলেন যতাত্মা ঔশীনর। বাতায়নপথে কে ওই সুন্দরী? আবক্ষমস্তক মাত্র প্রকাশিত, যেন তৈলচিত্রে অঙ্কিত একটি চিত্রার্ধ। একি গন্ধর্বকন্যা, অপ্সরী, না সুরবালা! রহস্যময় চন্দ্রালোকে রাজার মনে হল, স্বপ্নাবেশময় সুরলোকে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। দৃষ্টির সম্মুখে জ্যোতির্বিমণ্ডিতা সুরকন্যা; রাকাচন্দ্রের মত অঙ্গবর্ণ, সুবিন্যস্ত কবরী সীমন্তে চন্দনচর্চিত রক্তসিন্দূর। মরি মরি, কি রূপ! কি অপরূপ প্রসাধন-নৈপুণ্য! বিধাতার নির্মাণ-কৌশল

সেই দেহে, মানুষের কলাচাতুর্য সেই সজ্জায়—যেন উভয়ের শিল্পরচনা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই অঙ্গে তাঁদের স্ব স্ব শক্তিসীমা নিঃশেষ করেছে।

বিক্রমে আদিত্যতুল্য ঔশীনর, সংযমে ব্রহ্মচারীতুল্য শিবিপুত্র মুহূর্তে বিক্রম ও সংযম হারিয়ে ফেললেন। বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কে এই রমণী?'

উত্তর করলেন অমাত্য-প্রধান, 'মহারাজ, ইনি আপনার হিতকাম সেবক অহিপারকের পত্নী। দুঃসহ কুলে উৎপন্না ইনি বিভ্রমবতী স্মৃতিহরা।'

'স্মৃতিহরা! যাচক হয়ে যার পিতা এসেছিলেন আমারই দ্বারে? লক্ষণবিশারদ পণ্ডিতগণ যার লক্ষণ পরীক্ষা করে বলেছিলেন—ও একটা যক্ষী, কালকর্ণী?'

ক্রোধে আরক্ত হলেন ঔশীনর। করজোড়ে নিবেদন করলেন অমাত্য, 'এই বিভ্রমবতী কন্যাকে গ্রহণ করলে আপনি রাজকার্যে উদাসীন হবেন, তাই আপনাকে মিথ্যা বলা হয়েছিল মহারাজ!'

ঈষৎ শান্ত হলেন রাজা। যথার্থই বটে। অলোকসামান্য এ রূপের অত্যাশ্চর্য মোহিনী শক্তি। আশ্চর্য তার মাদকতা। নিজের অজ্ঞাতসারে পুনর্বার ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ধর্মশীল ঔশীনর।

কোথায় রূপমায়া? রুদ্ধ বাতায়ন, অন্তর্হিত লাবণ্যরাশি। রাজার মনে হল, সহসা অস্তমিত হয়েছে চন্দ্র, সহসা নিবে গিয়েছে দীপের সহস্র আলো, সহসা কৃষ্ণ যবনিকার মত নেমে এসেছে অন্ধকার। দোলাচল চিত্ত নৃপতি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। গম্ভীর মুখে সারথিকে বললেন তিনি, 'রাজপ্রাসাদে রথ ফিরিয়ে নিয়ে চল সারথি।'

নিমেষে নীরব হয়ে গেল উৎসববাদ্য, নীরব হল প্রমত্ত কোলাহল। আজানেয় অশ্ববাহিত রথের গতিমুখ ঘুরে গেল। বিরস বদন রাজাকে বহন করে লঘুসঞ্চারে রথ ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। কারও সঙ্গে কথা বললেন না রাজা। স্খলিত চরণে স্বকক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিলেন তিনি। রুদ্ধ হয়ে গেল কক্ষদ্বার।

পরদিন আর রাজসভা বসল না। অমাত্যগণ নীরবে প্রতীক্ষা করলেন; প্রার্থী নিরাশ হয়ে ফিরে গেল, বিচারার্থী বিমুখ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করল, রাজসিংহাসন রইল শূন্য। শিবিরাজ্যে এই প্রথম নিয়মভঙ্গ। রাজা সেই যে শয্যা আশ্রয় করেছেন, আর বাইরে আসেন নি। কে জানে, তাঁর অন্তরে চলেছে কোন্ স্বর্গ ও নরকের কি ভীষণ দ্বন্দ্ব!

চিন্তিত হলেন অমাত্যবর্গ। অহিপারককে জানালেন তাঁরা—সেনাপতির গৃহদ্বারে পৌঁছেই বিচেতন হয়েছেন ঈশ্বরতুল্য নরেশ্বর।

অহিপারক বুঝল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। দ্রুত গৃহে ফিরে অভিযোগের সুরে স্মৃতিহরাকে প্রশ্ন করল সে, 'রাজাকে দর্শন দিয়েছ তুমি?'

'আমি! কখন?'

'কাল কার্তিকী পূর্ণিমার সন্ধ্যায়!'

'কে জানে, তিনিই রাজা কি না! গৃহদ্বারে এসে একটি রথ থেমেছিল বটে! সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তি হবেন বিবেচনা করে আমি বাতায়ন-পথে তাঁর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করেছি।'

'সর্বনাশ করেছ। তিনিই রাজা। তোমায় দেখে রাজকার্য বিস্মৃত হয়েছেন তিনি।'

বিজয়ের আনন্দে নৃত্য করে উঠল উন্মাদিনীর অন্তর। আশ্চর্য ছলনাময়ী নারী। হৃদয়ে কুটিল হাস্য, মুখে ছদ্ম বিষাদ গাম্ভীর্য। কপট সমবেদনার সুরে টেনে টেনে বলল সে, 'ভারি দুঃসংবাদ! এখন উপায়?'

'উপায়?'—উত্তর দিতে পারে না অহিপারক। দুঃখে ক্রোধে জর্জর হৃদয়। পাগলের মত সে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। বিজয়োল্লাসে বিহ্বলা বিজয়িনী। শিকারকে হিংস্র নখরে আহত করে সুতীব্র উল্লাস-দৃষ্টি নিয়ে প্রতীক্ষা করে ব্যাঘ্রী। যন্ত্রণায় ছটফট করে শিকার—পাশব প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যাঘ্রীর বদন। তেমনি পৈশাচিক উল্লাসে উল্লসিত হয় রূপদর্পিতা স্মৃতিহরা। ঔৎসুক্যে সে প্রতীক্ষা করে—আরও কি তৃপ্তিকর সংবাদ বহন করে আনে তার স্বামী!

ওদিকে চিন্তাক্লিষ্ট অহিপারক এসে উপস্থিত হয় প্রজাবৎসল, তপোধীর ঔশীনরের কক্ষদ্বারে। অর্গলবদ্ধ কক্ষ। কক্ষমধ্যে অস্থির পদচারণা ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ হা-হুতাশ, তীব্র আত্ম-সংযমন। 'ছি ছি—শিবিপুত্রের একি চিত্ত-বৈকল্য! এতদিনের অভ্যস্ত সংযম, এতদিনের অর্জিত ঋদ্ধি, তার এই পরিণাম? রূপমোহে পদভ্রষ্ট ধর্মাত্মা? অসঙ্গ আজ সঙ্গোন্মুখ, অনাসক্ত আজ অনুরক্ত! রাজা কিনা প্রজার সম্পদ-লোলুপ! ধিক্ আমার শিক্ষায়, ধিক্ আমার জীবনে।'

হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় অহিপারকের। রাজার এই মোহ, এই দুঃখের হেতু সে। সে যদি স্মৃতিহরাকে গ্রহণ না করত, তাহলে এ বিপর্যয় ঘটত না আজ। এর প্রতিবিধান করতেই হবে। মুহূর্তে বুদ্ধি স্থির করে সে, কক্ষদ্বারে করাঘাত করে বলে, 'দ্বার খুলুন মহারাজ!'

কক্ষাভ্যন্তর থেকে উত্তর আসে, 'কে?'

'আমি অহিপারক!'

'অহিপারক! না-না, তুমি ফিরে যাও।'

'ফিরে যাব না। প্রজা রাজার দর্শনপ্রার্থী।'

'রাজা আমি নই। বিনষ্ট আমার রাজধর্ম!'

'শিবিরাজ্যে রাজধর্ম বিনষ্ট হতে পারে না। দুয়ার খুলতেই হবে। আমি শুধু প্রজা নই, আপনার ভৃত্য। ভৃত্য কি প্রভুর দর্শনলাভে বঞ্চিত হবে?'

পবিত্র-মধুর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন না রাজা। কিন্তু আজ কে প্রভু, কে ভৃত্য? আজ অনঙ্গায়ত্ত ঔশীনর। আর্তনাদ করে তিনি বলেন, 'প্রভু আমি নই। আমি ভৃত্যেরও অধম অহিপারক!'

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারী রাজার দৈন্যে অহিপারক অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। সিক্ত কণ্ঠে সে বলে, 'আপনি তো শুধু রাজা নন, শুধু প্রভু নন। শৈশবের বন্ধু আপনি! বন্ধু কি কেবল সম্পৎকালের সঙ্গী? আপৎকালের কেউ নয়?'

এ কাকুতি উপেক্ষা করতে পারেন না ঔশীনর। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে অহিপারক। এ কি মূর্তি হয়েছে রাজার! একটি রাত্রি ও একটি দিনের কয়েক প্রহরের মাত্র ব্যবধান। অকাল বার্ধক্য দেখা দিয়েছে পূর্ণ যৌবনে। চক্ষু কোটরাগত, নয়নকোণে গাঢ় কালিমা, মুখে বিনিদ্র রজনীর দুশ্চিন্তার চিহ্ন—যেন অগ্নিস্পর্শে বিশুষ্ক অম্লান পঙ্কজ। কাতরকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বলে অহি-পারক—'উপায় থাকতেও কেন অসিধারা ব্রত গ্রহণ করেছেন, মহারাজ! স্মৃতিহরা আপনার দাসী। আদেশ করলেই সে আপনার সেবায় নিযুক্ত হতে পারে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অহিপারকের প্রতি তাকান ধর্মশীল ঔশীনর। তিনি কামমোহিত, কিন্তু বিবেকরহিত নন। লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলেন, 'আমি স্মৃতিহরার রূপমুগ্ধ, একথা তুমিও জেনেছ অহিপারক? সবাই জেনেছ?'—ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়েন ধর্মধীর। সুগভীর আর্তনাদ ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে, 'নিষ্কলঙ্ক শিবিকুলে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছি আমি। রাজার যদি ধর্ম গেল, তবে আর কি অবশিষ্ট থাকল, অহিপারক!'

'আপনার পক্ষে এ দৈন্য অশোভন। আপনি রাজা, রাজ্যের প্রভু। রাজ্যের যে-কোন দ্রব্য গ্রহণে রাজার পূর্ণ অধিকার।'

'এ যুক্তি স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের। রাজা প্রজার রক্ষক। রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তাহলে তা স্বৈরাচার। আমি স্মরাতুর হলেও শাস্ত্রজ্ঞান হারাই নি, অহিপারক! 'বরং ভিক্ষার্থিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম'—শাশ্বত এ শাস্ত্র-শাসন।'

'শাস্ত্রে এ অনুশাসনও আছে, ভর্তা ইচ্ছা করলে পরের কল্যাণে আপন ভার্যাকে দান করতে পারে। পতি আমি, আমি স্বেচ্ছায় আমার পত্নীকে দান করছি। আপনি গ্রহণ করুন।'

মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠেন ধর্মধীর বীর ঔশীনর, বলেন, 'শিবিবংশের রাজা চিরকাল দান করেই এসেছে, দান গ্রহণ করে নি। পরার্থে প্রাণ পর্যন্ত দান করেছেন তাঁরা। দুর্বলতার সুযোগে সেই মহৎ মর্যাদায় আঘাত করছ তুমি?'

ক্ষোভে উন্মাদবৎ হয়ে ওঠেন শিবিপুত্র। ধার্মিকের হৃদয়দ্বন্দ্ব অতি প্রচণ্ড, অতি প্রচণ্ড তার অভিঘাত। আত্মদ্বন্দ্বে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন। চিৎকার করে বলেন, 'তা হয় না। 'অনন্তপারা দুষ্পুরা তৃষ্ণা'—তার নিবৃত্তি নেই, শান্তি নেই। আমি মৃত্যু বরণ করব, তবু তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দেব না। রাজা প্রজার নেতা, রাজার আদর্শই প্রজার আদর্শ। বক্র পথানুসারী রাজা প্রজাদের বক্রপথেই আকর্ষণ করে। সে রাজধর্ম শিবিকুলের ধর্ম নয়। তুমি যাও অহিপারক, আমার ব্রত আমি রক্ষা করব।'

অহিপারক আর প্রতিবাদ করতে পারে না। দুঃখে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু অলঙ্ঘনীয় প্রভুর নির্দেশ। বেদনা-বিধুর হৃদয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে সে।

এদিকে চরম রূপ ধারণ করে রাজার অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিস্ফোটকের মত গূঢ়দাহী যন্ত্রণা। একদিকে নীতির অনুশাসন, অন্যদিকে রূপের উন্মাদনা; একদিকে বিবেকের বাক্য, অন্যদিকে কন্দর্পের প্ররোচনা; একদিকে নিয়মের বন্ধন, অন্যদিকে অনিয়মিত মোহ। অস্থির ঔশীনর। পঙ্কে বদ্ধ মত্ত হস্তী যেমন হস্তীপকের কঠিন কশাঘাতে পঙ্ক থেকে উত্থানের প্রয়াস করে, গভীর পঙ্ক-গহ্বর থেকে তেমনি উঠতে চেষ্টা করেন তিনি। ভীষণ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শিবিপুত্রের হৃদয় যেন বিবেক ও মোহের ভয়ঙ্কর রণভূমি—দগ্ধ, প্লাবিত, বিপযস্ত।

দশদিন ধরে চলল এই ভীষণ দ্বন্দ্ব। দশদিনে বিরহজনিত দশ দশা অতিক্রম করলেন ঔশীনর। লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। অষ্টম দিনে স্পষ্ট উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিল। ঘোর বিকার, ঘোর উন্মত্ততা! নবমদিনে অদ্ভুত মোহ—অচৈতন্য জড় দেহ। দশম দিনে বিরহের দশমী দশায় উপনীত হলেন ধার্মিক, প্রজাবৎসল রাজা।

বিষাদাচ্ছন্ন রাজ্য, আকুল প্রজা। চিন্তাক্লিষ্ট অমাত্য, পুরোহিত। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, প্রার্থনায় পূর্ণ শিবিরাজ্য। সকলের মুখে এক কথা—'সুস্থ হোন রাজা, সুস্থ হোক শিবিরাজ্য।' সর্বাপেক্ষা মর্মাহত হল অহিপারক।

কিন্তু উৎকট উল্লাস আজ স্মৃতিহরার। গবিতার গর্ব—সার্থক তার স্মৃতিহরা নাম। নিঃশেষে খর্ব করেছে ধার্মিকের দম্ভ, স্মৃতিভ্রংশ করেছে যতাত্মা পুরুষকে। নিজের প্রকোষ্ঠে বিজয়োৎসবের আয়োজন করে কুটিলা বিজয়িনী। উন্মাদের মত এসে উপস্থিত হয় অহিপারক, 'রাজার কথা নিশ্চয় শুনেছ তুমি!'

'ও, সেই রাজা!'—নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উত্তর করে স্মৃতিহরা, যেন রাজার ব্যাপারটা নগণ্য। অসহ্য মনে হয় অহিপারকের। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে, 'দুঃখ হচ্ছে না তোমার?'

'দুঃখ? কেন?'—আলেয়ার মত কুটিল দৃষ্টি স্মৃতিহরার কণ্ঠে যেন বিষের বীণা, 'ধার্মিক তোমার রাজা, রূপাতঙ্কে কঠিন তার প্রায়শ্চিত্ত।'

'এ রূপাতঙ্ক সৃষ্টি করেছ তুমি'—গর্জন করে ওঠে অহিপারক।

সশ্লেষে বলে স্মৃতিহরা, 'আমি নই। আতঙ্কের বীজ ছিল তোমার রাজারই মনে। বাইরে ধার্মিক, অন্তরে কুটিল কামনা! ভণ্ড, কামাচারী ঔশীনর।'

ললনার বসনা যেন খোপানসী খড়্গ। ক্রোধে দিগ্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয় অহি-পারক। পিধানমুক্ত হতে চায় অস্ত্রাভিজ্ঞের অস্ত্র। রুদ্রস্বরে গর্জন করে ওঠে সে।

কিন্তু মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় অহিপারক। দূত এসে ত্রস্তে জানায়, 'অন্তিম দশায় উপনীত রাজা। সচিব সেনাপতিকে স্মরণ করেছেন।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় অহিপারক। বাধা দেয় স্মৃতিহরা। প্রতিহিংসার আগুন তার চোখে, রূপের আগুন তার দেহে। সে অহিপারকের সামনে এসে দাঁড়ায়। মরিয়া হয়ে ওঠে অহিপারক। বজ্ররবে সে বলে, 'সরে দাঁড়াও! রাজার চেয়ে প্রেয় নয় প্রিয়া, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় নয় রূপজ মোহ!

কঠিন বীর্য দুর্বার বিক্রমে রূপকে দলিত করে চলে যায়।

গর্জন করে ওঠে অপমানিতা, যেন দলিতা ফণিনী। পিশাচীর মত জ্বল জ্বল করে তার হিংস্র চোখ! তারপর কি ভেবে সে এসে দাঁড়ায় বাতায়ন পথে, দেখে, ঝটিকাবেগে অহিপারক চলেছে রাজ-সন্নিধানে।

রাজপথে বাধামুক্ত জনস্রোত। স্রোত চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে। সকলের মুখে এক প্রার্থনা, 'হে ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা কর।' কেউ বা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে অহিপারকের গৃহ-গবাক্ষে 'ওই পিশাচীই রাজার সর্বনাশ করেছে! নিপাত যাক্ যক্ষী।'

স্তব্ধ স্মৃতিহরা। কে যেন কণ্ঠ রোধ করেছে তার। অথবা কে জানে, স্তব্ধ সাগরতলে রচিত হচ্ছে কিসের আবর্ত। অথবা এ স্তব্ধতা প্রলয়ের পূর্বাভাস।

সহসা দূর থেকে ভেসে আসে বিষাদঘন বিপুল ক্রন্দন। হাহাকারে পূর্ণ গগন, পূর্ণ প্রতিটি ভবন। যূপ কাষ্ঠে নিহতশির কোটি কোটি মেষশাবক যেন সমবেত আর্তক্রন্দনে দিঙ্‌মণ্ডল কাঁপিয়ে তুলছে। বিদীর্ণ হয়ে যায় স্মৃতিহরার কর্ণ। তবু সে স্থির। তার বক্ষ বেদনাহীন, তার কণ্ঠ ক্রন্দনহারা। দাসী এসে বৃথাই জানিয়ে যায়, 'শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রজাপ্রিয় ঔশীনর।'—তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিহরা। অবিকৃত বদন, অবিচল হৃদয়, শুষ্ক স্থির নয়ন—যেন নিষ্প্রাণ অনড় পাষাণ।

নিষ্পলক দৃষ্টিপথে দিবসের গতি অগ্রসর হয়। ত্রিবিক্রম সূর্যের রথ এগিয়ে চলে। ত্রুটি, বেধ, লব, নিমেষ, ক্ষণ কাষ্ঠা লঘু দণ্ড, মুহূর্ত, প্রহর অতিক্রান্ত হয়। সপ্তাশ্ববাহিত হিরণ্ময় রথ এখন মস্তকশীর্ষে। তৃষ্ণার্ত অশ্ব যেন মরুর মত জিহ্বা বিস্তার করে ভুবনরস পান করছে। অনাথ প্রজাবর্গের হাহাকার যেন ক্লান্ত সপ্তাশ্বের শ্রান্তিহীন হ্রেষা। কে যেন দারুণ কশাঘাত করেছে তাদের।

ক্রমে উপস্থিত হয় অপরাহ্ণকাল। তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করে উত্তপ্ত ধরণী। শুষ্ক সমীরণে সমীরিত দীর্ঘশ্বাস। একটা শূন্য ঘূর্ণি ধরণী-ক্রোড় থেকে আকাশের দিকে উড়ে চলে।

শবযাত্রা বেরিয়েছে রাজপথে। অপার জনসাগর। কৃষ্ণসাগরে কোটি কোটি কৃষ্ণ চলোর্মি। নীরবে বর্ষিত হচ্ছে অশ্রুধারা, কৃষ্ণ ঊর্মির সিক্ত শীকর। কি গভীর নিস্তব্ধতা! মধ্যভাগে স্বর্ণপালঙ্কের শবাধার। রক্তরেশমে আচ্ছাদিত শবদেহ, পুষ্পমাল্যে আবৃত রক্ত-রেশম। কালীয় দহে কি ফুটে উঠল রক্তকমল।

গৃহে গৃহে উন্মুক্ত বাতায়ন। বাতায়নপথে সহস্র বরাঙ্গনার নীল উৎসুক নয়ন। আজও যেন কার্তিকী পূর্ণিমার উৎসব। রাজা নগর-প্রদক্ষিণে বহির্গত হয়েছেন। দিক্‌পাল সদৃশ মহাভাগ রাজা ঔশীনর। প্রিয়দর্শী তিনি, লোকপ্রিয়। সহস্র সহস্র পুরাঙ্গনা অন্তরের শুভ কামনা নিয়ে পরম আগ্রহে নয়নভরে দর্শন করছে প্রিয়দর্শী রাজাকে। ধারাসারে হচ্ছে পুষ্পবৃষ্টি—রঙিন শুভ কামনা; বর্ষিত হচ্ছে শুভ্র লাজাঞ্জলি—হৃদয়ের পবিত্র আশীর্বাদ! আজও রাজার পাশে পাশে চলেছে কাতারে কাতারে অমাত্য সদস্য। সেদিন তারা ছিল মুখর, আজ মূক। আজ তাদের মৌনব্রত। উপরন্তু আজ রাজার সঙ্গে পদব্রজে চলেছে সৈন্যাধ্যক্ষ অহিপারক, রাজার আবাল্যের বন্ধু—নগ্নশির, নগ্নপদ, আনত আনন। গভীর শোকে জিয়ন্ত, নিরস্ত্র অস্ত্রবীর।

শবযাত্রা অহিপারকের গৃহের সম্মুখে আসে। মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে জনসমুদ্র, মুহূর্তে গর্জমুখর হয়ে ওঠে উত্তাল তরঙ্গ। ক্রুদ্ধ শ্লেষ বর্ষিত হয় বাতায়নে। আবার সব নিস্তব্ধ। পুষ্প করণ্ড হস্তে দাসীরা পুষ্প বর্ষণ করে। আজ সে পুষ্পবর্ষণে কেউ সাড়া দেয় না, মুগ্ধ লোচনে কেউ ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। সভয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে স্মৃতিহরা। স্বর্ণপালঙ্কের শবাধারে রক্ত-রেশমে আবৃত দেহ, পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন—কেবল অনাবৃত রাজার বদন। একখানি সুশুভ্র পাণ্ডুর প্রসন্নতা! স্থির, উদাসীন। কোথাও কি মদনাতুরতার চিহ্ন আছে? —কোথাও নেই। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে স্মৃতিহরা। তার আয়ত উগ্র চক্ষু দুটি আরও বিস্ফারিত হয়। প্রকাণ্ড, নিশ্চল, অতিশয় তীব্র তার দৃষ্টি।

শবযাত্রা অহিপারকের গৃহ অতিক্রম করে যায়। অদূরে অস্ত যাচ্ছেন প্রদীপ্ত স্বর্ণভানু। রঞ্জিত সন্ধ্যাভ্রের আবরণে যেন একখানি দীপ্ত আনন! কিঞ্চিৎ ম্লান, কিন্তু কি প্রশান্ত কি মহনীয়। অথচ কেমন উদাসীন।

এ ঔদাসীন্য স্মৃতিহরাকে উত্তেজিত করে তোলে না, এ অপমানে দুঃসহনন্দিনী অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে না। নিঃশেষিত কি প্রতিশোধ স্পৃহা? কালনাগিনীর চোখে কী আজ অন্ধকার?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। শূন্য রাজপথে আলো জ্বলে না। অহিপারকের গৃহও আজ নিষ্প্রদীপ। শোকের কালিমায় আচ্ছন্ন নগরী, মূর্চ্ছাহত পুরবাসী। এই অনন্ত শোকের ছায়া নিয়ে নেমে আসে কৃষ্ণাদশমীর তামসী রাত্রি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্মৃতিহরা। দুরবগাহ অন্ধকারে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে কি যেন অর্থ খোঁজে সে।

হয়তো এতক্ষণ শ্মশানভূমিতে প্রেতকার্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে রাজোচিত মর্যাদায়। দক্ষিণ শিরায় শয়ান ধর্মশীল শিবিপুত্র। মন্দাকিনী নীরে স্নাত শব— সপ্ত ছিদ্রে সপ্ত রত্ন, গন্ধচন্দনে চর্চিত রাজদেহ, পরিধানে শ্বেত উত্তরীয়। রাজপুরোহিত অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন প্রেত-আবাহন মন্ত্র: 'এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বেণেভি'—আর যেন শোনা যায় না। কোটি কণ্ঠের আর্তনাদে মন্ত্রধ্বনি মজ্জিত হয়ে যায়। তুঙ্গ ও পদ্ম নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠের চিতায় আরূঢ় শব: সহস্রকণ্ঠে অগ্নির আবাহন: হাহাকার, বিপুল আর্তনাদ। ওই লকলক করে বুঝি জ্বলে উঠল চিতা!

নিস্তব্ধ স্মৃতিহরা। তার বিস্ফারিত চক্ষু আরও বিস্ফারিত হয়। কৃষ্ণাদশমীর রাত্রিতে তমসাসুর কি নিদ্রাভঙ্গে নয়ন মেলে তাকিয়েছে? ঘোর কৃষ্ণদেহে

ঘোর আরক্ত দৃষ্টি! তার লেলিহান জিহ্বা! পুরোহিতের কণ্ঠে উচ্চারিত গম্ভীর মন্ত্র যেন বজ্রমন্দ্রে কার ভৎর্সনা:

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

—মহাবায়ুতে বিলীন প্রাণবায়ু। এখন স্মরণ কর, স্মরণ কর। স্মরণীয় যা কিছু, স্মরণ কর, যা করেছ স্মরণ কর, কৃতকর্ম স্মরণ কর—'ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।'

কিছুই স্মরণ করতে পারছে না স্মৃতিহরা। লুপ্ত পূর্বস্মৃতি। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। কে স্মৃতিহরা? কার ওই শব? কিসের ওই চিতা? —অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক। বিভ্রমবতী আজ নিজে বিভ্রান্ত।

সহসা সন্ত্রস্তে দাসী কক্ষে প্রবেশ করে, সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাকুল ভাবে বলে, 'সর্বনাশ উপস্থিত!'

কিছুই বোঝে না স্মৃতিহরা। শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকায় দাসীর প্রতি। দাসী এক নিশ্বাসে বলে, 'প্রভুর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ সেনাপতি, কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি, কেউ বাধা দিতে পারে নি। রাজার অকালমৃত্যুর কারণ তিনি—এই বিবেচনা করে চিতায় আরোহণ করে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন প্রভুভক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ।'

ভীষণ চীৎকার করে ওঠে স্মৃতিহরা। বহুক্ষণের নীরবতা যেন এক সঙ্গে উদ্দাম হয়ে ওঠে, যেন সহসা রুদ্ধ আগ্নেয় বিদারণ! বাধাবন্ধহীন উন্মাদ আবেগাগ্নি যেন দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে। আতঙ্কে তাকে জড়িয়ে ধরে দশবারজন দাসী। বাধা কি মানে? দুর্বলার দেহে সহস্র প্রমত্তা করিণীর শক্তি! প্রোদ্দাম গতি, কণ্ঠে মুহুর্মুহু স্খলিত গর্জন। ভীষণ চিৎকার! ভীষণ অঙ্গ-বিধূনন! কুটিলা হলেও স্বভাবদুর্বলা নারী। তাই উচ্চগ্রামে বাজতে গিয়ে ছিন্ন হয় হৃদয়-তন্ত্রী! প্রলয়-কম্পনে বিপর্যস্ত দেহ-প্রাকার, চূর্ণ-বিচূর্ণ বুদ্ধির দুর্গ।

তারপর সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তির এক শোচনীয় পরিণাম। কাঞ্চনের মত অঙ্গবর্ণ বহুদিনের খররৌদ্রে বিবর্ণ হয়ে গেল, সুবিন্যস্ত কেশপাশ হল অবিন্যস্ত। দীর্ঘদিনের অযত্নে জটার আকার ধারণ করল কাজল কুন্তল। ঘোলাটে চোখ, অর্থহীন দৃষ্টি। কুণ্ডলীকৃতা স্মৃতি—মাঝে মাঝে সূত্রহীন প্রলাপ। এই উত্তেজনা, এই গর্জন, এই মৃত্যুর স্তব্ধতা। কখনো বুকভাঙা আর্তনাদ! অতি মর্মান্তিক সে ক্রন্দন! বদ্ধ উন্মাদিনী স্মৃতিহরা—সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদিনী তার

কুটিল প্রকৃতি। ভীষণ আক্রোশ, বিচারহীন তার আক্রমণ। সুস্থ মানুষকে মুহূর্তে মাতাল, উন্মাদ, বিভ্রান্ত করে সে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই বীভৎস উন্মত্ততার মধ্যেও কোথায় যেন রয়েছে উদ্‌ভ্রান্তিকর এক রূপের মায়া। এই রূপ-মায়াই মানুষের স্মৃতি হরণ করে।

আজও সৃষ্টিকে উন্মাদিত করছে আলেয়ার মত রূপবতী এই উন্মাদিনী। মরীচিকার মত বিভ্রান্ত করছে এই বিভ্রমবতী। জনমে, জীবনে, মরণে, স্মৃতিহরা লুপ্ত করে দিচ্ছে স্মৃতি। ত্রিলোকময় তার প্রমত্ত সঞ্চরণ। প্রচণ্ড আক্রমণ। ধৃতব্রত সংযমীরও মুক্তি নেই তার হাতে। রূপের মোহিনী মায়া স্মৃতিহরা— সে উন্মাদিনী, সে বিভ্রমবতী ; স্মৃতিহরা মৃত্যুর অগ্রদূতী।*

* দুঃসহ-নন্দিনী স্মৃতিহরার পরিচয় ও প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে ( ৫০—৫১ অধ্যায় ) ; উশীনর-ঘটিত যে কাহিনীটি স্মৃতিহরার ওপর আরোপিত হয়েছে, তা 'উন্মদন্তী' জাতক থেকে গৃহীত। কথাসরিৎসাগর ও বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থেও পরিবর্তিত আকারে 'উন্মাদিনী'র কাহিনী আছে।

# ॥ নরক ॥

গম্ভীর হয়ে গেল রাজা নরক! প্রদোষের স্বল্পালোকে তার চোখে ফুটে উঠল একটা সুতীব্র সন্ধানী দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দিয়ে সে দেখে নিল প্রিয়তমা মহিষী বেদনার আপাদমস্তক।

বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে মহাঘোর নিরয়লোকের অধীশ্বর নরক। সে পাপীর এক দণ্ডধর—দুরন্ত, নির্মম। তার নামেই অন্ধকার-ঘন অধোলোকের নাম 'নরক'। নরক অতি ভীষণ, পাপীর ভোগ্যস্থান।

যেমন ভীষণ রাজ্য তেমনি ভয়ঙ্কর তার রাজা। অঞ্জন পর্বতের মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, জটিল পিঙ্গল কেশসটা। তদুপরি রত্নময় মুকুট—যেন সূর্যরশ্মি প্রতিঘাতী মন্দরশৃঙ্গ। বলিকুঞ্চিত ললাটতলে তীক্ষ্ণ জ্বালাবহুল নয়ন। প্রলয় মেঘবিম্বিত উত্তাল সাগরে বাড়বাসদৃশ ভয়াল ক্রোধ-সংরক্ত কটাক্ষ। সে কটাক্ষ পাপাত্মার মর্মভেদ করে। নরকের কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কুণ্ডলের দোলায় দেবতা-ত্রাস ঔদ্ধত্য। অতি বিভীষণ সে মূর্তি।

তারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মহিষী 'বেদনা'। আজ তার অদ্ভুত প্রার্থনা—'আমি নরক দেখতে চাই, আমাকে নরকে নিয়ে চল।'

নরকের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে, দৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণতর। সুগম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, 'তা হয় না, নরক দেখার অধিকার সকলের নেই।'

'কেন নেই!' ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে বেদনা।

তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে নরক, 'কর্মফলেই স্বর্গ বা নরক দর্শন হয়। যাঁরা পুণ্যবান, প্রেমিক—সত্যবাক্, ধর্মশীল—তাঁরা যেমন সুখের পর সুখ, স্বর্গের পর অনন্ত স্বর্গ ভোগ করেন—তেমনি যারা পাপী মিথ্যাচারী—তারা ভোগ করে ক্লেশ, নরক। নরক দর্শনের অধিকারও পাপীর। তুমি তো জীবনে কোন পাপ কর নি!'

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় বেদনা। অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে বলে, 'নারকীর কাতর ক্রন্দন আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি সহ্য করতে পারি না। উঃ, কি করুণ আর্তনাদ! আমাকে নিয়ে চল, আমি ওদের দেখি।'

নরকের স্বভাব-গম্ভীর বদনমণ্ডল আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে, যেন অন্ধকার মেঘলোকে আসন্ন সন্ধ্যার ঘোর। রক্তচক্ষু কুটিল শকুনের মত সুতীব্র সন্ধানী দৃষ্টি তীব্রতর করে সে আবার মহিষীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে।—নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক আনন—নির্মল, নিষ্কলুষ নয়ন! আকৃতি কি অন্তরের দর্পণ নয়!

দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছে নরক, করুণায়-কোমলতায়, যত্নে-সেবায় অতুলনীয়া বেদনা। প্রশ্নের অতীত তার পাতিব্রত্য। সপ্তর্ষি লোকের অনসূয়া, অরুন্ধতীর মতই অনিন্দিতা সে—অনিন্দনীয় তার চরিত্রগৌরব। স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে আছে সেই প্রথম দিনের স্মরণীয় ইতিহাস, যেদিন ভীমকান্ত নরকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল বেদনা। যেমন উদ্যত-গ্রাস মেঘ মুখে স্থির দাঁড়ায় নীল তারা, বিপুল কৃষ্ণকায় নরকের সম্মুখে তেমনি দাঁড়িয়েছিল সে। পরিপূর্ণ শ্যামাঙ্গী—যৌবনে উচ্ছল। নিখুঁত নীলকান্ত মণির মত নীলদ্যুতি, শতকুঞ্চিত ঘন নীল কেশকলাপ, নীলোৎপলের মত সুস্নিগ্ধ নয়ন, মমতা-মাতানো আবেশ-বিহ্বল ঈক্ষণ—যেন চারুসর্বাঙ্গী অনঙ্গলতা। এমন করে কোন নারী তার সম্মুখে দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে সাহস পায় না। নারীর বিভীষিকা নরক।

নারীকে দেখে সুগম্ভীর মেঘমন্দ্রে প্রশ্ন করেছিল নরক, বীণানিন্দিত মধুক্ষরা কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল বেদনা—যেন কড়ি ও কোমলে উদাত্ত ও অনুদাত্তে সাধা সংলাপ:

'কে তুমি?'

'অপহৃতা আমি, পতিংবরা!'

'আমায় অভিশাপ দিতে এসেছ, নারী?'

'তোমায় পতিরূপে বরণ করতে এসেছি আমি!'

'আমাকে? জান, আমি কে!'

'নিরয়লোকের অধীশ্বর, সম্রাট, নরক।'

'আমি ভয়াল অত্যাচার—নির্মম, নিষ্ঠুর।'

'তুমি শাস্তা, দণ্ডধর—নবজীবনের প্রেরণা।'

হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল রাজা নরক। এত সংবাদ কি করে জানল, ওই নীল-তারার মত ছোট্ট একটি নারী। কেনই বা পতিরূপে প্রার্থনা করছে তাকে? বিশ্বের চোখে মহাভয়াল নরক, নারী-জীবনের দুর্দৈব। কি একটা আক্রোশ অনির্বাণ অনলের মত তার বুকে জ্বলে। সেই প্রজ্বলিত ক্রোধানলের আহুতি গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, বিদ্যাধরপুরের সহস্র রমণী। অপহৃতা তারা মলদিগ্ধাঙ্গী—
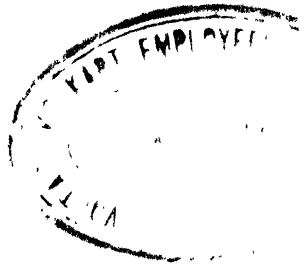
তারা এক-বেণীধরা। তাদের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে অস্থির নরক। সহস্র মুখে তারা নরককে অভিশাপ দেয়। এমন করে তো কেউ পতিরূপে প্রার্থনা করে না তাকে। এ নারী কি জানে না, কি অভিশপ্ত তার জীবন। পরিত্যক্ত, মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত, গোত্র পরিচয়হীন সে—অতি কুৎসিত, অতি কঠোর। অসীম তার প্রতাপ, কঠিন শাসন—কিন্তু অন্তরময় শূন্য হাহাকার যেন শূন্যগর্ভ অগ্নিগোলক!

নরকের মনে পড়ে, কত কাল আগের এক কাহিনী—সদ্যপ্রসূত অনাথ এক শিশু। নির্জন শ্মশানপ্রান্তে প্রাণরক্ষার তাগিদে প্রাণপণে চিৎকার করছিল সে, ক্রন্দন করছিল শুষ্ক একটা মৃত নরকপালের ওপর মস্তক স্থাপন করে। যে-কারণেই হোক—জননী পরিত্যাগ করেছে তাকে। হয়তো সে কানীন, হয়তো সে মাতার অবৈধ কামনার বিষফল। হয়তো মৃত্যুই ছিল তার ললাট-লিখন। কিন্তু মৃত্যু ঘটে নি তার। অমর বিষবীজ, অমর বিষবৃক্ষ। বিশ্বতোচক্ষু বিধাতা পুরুষের দৃষ্টি পড়েছিল তার ওপর। করুণাভরে তাকে রক্ষা করেছিলেন কমলযোনি।

আশ্রয় পেয়েছিল মাতৃত্যক্ত অনাথ শিশু। বিধাতার অভিপ্রায়ে বর্ধিত হয়েছিল স্রষ্টার অমোঘ শাস্তা—'নৈর্ঋতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ'। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতি—যেমন উত্তপ্ত হাহাকারময় জীবন, তেমনি ক্রন্দন-সিসৃক্ষু শাসন। কঠিন কণ্ঠে তাকে সুকঠিন নির্দেশ দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, 'জন্মের পর নরকপালে মস্তক স্থাপন করে ভূমিতে শায়িত ছিলে তুমি—তোমার নাম হল 'নরক'। তুমি ভীষণ হলেও আমার বিরাট সৃষ্টিতে তোমারও প্রয়োজন আছে। সৃষ্টি রাজ্যে যারা শৃঙ্খলার ব্যভিচারী—যারা প্রবঞ্চক, নরঘাতী, অত্যাচারী—যারা কামান্ধ, মদোদ্ধত—সেই সকল অধর্ম-বন্ধুর শাস্তিদাতা হবে তুমি। ত্রিলোকীর দক্ষিণ ভাগে ভূ-নিম্নস্থ নিরয়লোক—আজ থেকে তুমি তার অধীশ্বর হলে। তোমার নামেই সে রাজ্য নরক নামে অভিহিত হবে।'

শিউরে উঠেছিল বিভীষণ নরক। সে ভীষণ, কিন্তু তারও চেয়ে ভীষণ নরক; সে কঠিন, কিন্তু আরও কঠিন নরকলোক। রুদ্র-শাসনে ক্রন্দনমুখর প্রজা—রৌদ্র, করুণ, বীভৎস রসের সাগরে নিমজ্জিত হয়েও পার পায় না। এমনি ভয়ঙ্কর শাস্তি। শুষ্ক স্বরে প্রতিবাদ করেছিল সে, বিভীষণ নাদে উত্তর দিয়েছিলেন বেদগর্ভ ব্রহ্মা, 'এ কর্মভার তোমারই উপযুক্ত। তুমি ভয়ঙ্কর, করাল তোমার

শাসন—তুমি নির্দয়, নির্মম তোমার পীড়ন। নরকের পতি হবে নরক—এই-ই কল্পের বিধান।'

তারপর একটু নীরব থেকে বলেছিলেন বিধাতাপুরুষ, 'সৃষ্টির সুর বিচিত্র, বিস্ময়কর! যাদের কান আছে, তারাই সুরের ঐকতান শুনতে পারে। অন্ধকারের বুকে ঘুমায় আলো, রুদ্রের বুকে সুখে ঘুমায় পরম শিব। কঠিন শাসন কেবল দণ্ডবিধান করে না, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অঙ্গারের মলিনত্ব সহজে ঘোচে না, কিন্তু সুকঠিন অগ্নিতাপে তাকে দগ্ধ কর—অঙ্গার হীরক হয়ে উঠবে। নরকের শাসন হবে মলধৌত ধর্মজীবনের প্রবর্তক। হে নির্মম, হে অমিত্র-কর্ষণ, তোমার হৃদয়হীন দণ্ডের তাড়নায় পাপীর ভোগক্ষয় হবে—নরকাগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে নারকী হবে অভ্যুদয়সূচক নবজীবনের অধিকারী।

নির্বাক নরক। বিধাতাপুরুষের নির্দেশ নত মস্তকেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। তার হাহাকারময় করাল জীবনের একটি ক্ষত থেকে প্রতিনিয়ত নির্গত হয় তপ্ত রক্ত, সেই রক্তই উত্তেজিত করে তোলে তাকে। তার জীবনের সেই ক্ষত একটি অনুত্তর প্রশ্ন, কে সে? কেন সে পরিত্যক্ত? মাতার মমতা নির্মম হল কিসের অভিশাপে?

নরক-পতনের পূর্বে সে শুধু সেই প্রশ্নটিই করেছিল সর্বজ্ঞ বিধাতাকে—'আমার নীরস জীবনে একমাত্র রসের নির্ঝর আপনার স্নেহ, অপরিশোধ্য আপনার ঋণ। চিরকাল কি অজ্ঞাত থাকবে আমার পরিচয়? কোনদিন কি জানব না আমি, কে আমার মাতা, কে আমার পিতা?'

প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর করেছিলেন অস্খলিত সত্যের বাঙ্মূর্তি ব্রহ্মা, 'সত্যকে প্রকাশ করতে হয় না, বৎস! সত্য স্বয়ং-প্রকাশ। সময়ান্তরে এ সত্য আপনিই উদ্‌ঘাটিত হবে।'

আর কোন কথা বলে নি নরক। রহস্যঘন জিজ্ঞাসা অন্তরে রুদ্ধ রেখে সে গ্রহণ করেছিল বিধি নির্দিষ্ট কর্তব্যভার। ঊর্ধ্বে পুণ্যবানের স্বর্গ, নিম্নে পাপীর নরক। এই নরকেরই অধীশ্বর হয়েছিল সে। স্বর্গ তার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের অধিবাসী তার শত্রু। স্বর্গের মহাভয় নরক—প্রাণান্তকর ব্যাধির চেয়েও ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর চেয়েও করাল, যমদূতের চেয়েও দুরন্ত। মাতৃস্নেহের বঞ্চনা আরও ভীষণ করে তুলেছিল তাকে। সমগ্র নারী জাতির প্রতি বিতৃষ্ণা! তার আক্রমণে সন্ত্রস্তা যোষিৎকুল। নারীকে সে করেছে নরকের দ্বার। সহস্র রমণীর দীর্ঘশ্বাসে অস্থির নরক, ক্রন্দনে উত্তেজিত নরক, একবেণীধরা সীমন্তিনীর অভিশাপে উত্তপ্ত নরক। সে উত্তাল

উন্মাদ। উন্মত্ততায় কঠিন হয়ে ওঠে সুকঠিন পীড়ন, নিষ্পিষ্ট হয় কোটি কোটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ। বাইরের প্রতাপ অন্তরের ক্রন্দনকে যেন চাপা দিতে চায়, কিন্তু পারে না। নরক যেন অনন্ত হাহাহারে পূর্ণ একটা শূন্যগর্ভ উল্কা।

সেই নরককে—বিশ্বলোকের বিভীষিকা, নারীকুলের মহাভয়, চির অভিশপ্ত সেই নরককে স্বেচ্ছায় বরণ করতে বসেছে এক নারী—যে নারী তারই কর-পীড়নে পীড়িতা, বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতা। সে কি নরককে চেনে না? কুৎসিত, মহাভয়াল নরকের পরিচয় কি অজ্ঞাত তার কাছে? সুন্দরকে সকলেই প্রার্থনা করে, কিন্তু যে অসুন্দর, যে অভিশপ্ত, যে মহাভয়ঙ্কর—তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে কে!

ভ্রূভঙ্গে উত্তপ্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিল নরক, 'জান, কোটি কোটি নারীর চোখের অশ্রু আমি, মহা অভিশাপ।'

আয়তনয়ন বিস্তার করে কোমলকণ্ঠে বলেছিল নীলনয়নী বেদনা, 'একটি নারীর নয়নের হাসি তুমি, জীবনের আশীর্বাদ।'

'শোন নারী, বিরামহীন আমার জীবন, ক্লান্তিহীন শাসন!'

সেই ক্লান্তিহীন জীবনে আমি হব শান্তি।'

'তুমি কি জান না, আমি গোত্র পরিচয়হীন, আজন্ম মাতৃ-পরিত্যক্ত, স্নেহবঞ্চিত?'

'জানি, জানি—' উচ্ছল হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে উত্তর দিয়েছিল মেঘবরণী, মমতাময়ী বেদনা, 'তাইতো জায়ার প্রেম দিয়ে পূর্ণ করতে চাই জননীর স্নেহ—শূন্য হৃদয়ের অভাব দূর করতে চাই মমতার মাধুর্যে।'

এরপর আর কোন কথা বলতে পারে নি রাজা নরক। প্রীতির যে শৃঙ্খলে বন্দী বিশ্বজগৎ, সেই শৃঙ্খলেই বন্দী হয়েছিল মদকলমত্ত নরকেশ্বর। বন্দী হয়ে বঞ্চিত হয় নি সে। মমতাময়ী বেদনা—করুণা ও শান্তির একমূর্তি। বর্ষার বারিবর্ষণে যেমন সবুজ শ্যামলতায় পূর্ণ হয়ে উঠে দাবদগ্ধ, শুষ্কাতিভৈরব গ্রীষ্ম—বেদনার স্নেহধারায় তেমনি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল নরক। নরকের জীবনে একেশ্বরী বেদনা, তার প্রিয়তমা মহিষী। ক্লান্ত জীবনে একখানি পরিপূর্ণ আরামের বিশ্রামাগার—ছায়া শীতল, প্রীতি-স্নিগ্ধ, শান্ত। স্বামীর সেবায় বেদনাও অক্লান্ত। একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য, পতির ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—পতির আদেশ তার পরম আদেশ।

সেই পতিব্রতা আজ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলছে, সে নরক দর্শন করবে।

যতবার নিষেধ করছে নরক, ততবার জেদ করছে বেদনা; যেমন অটল নরক, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেদনা। ব্রতীর কঠিন পণ ভঙ্গ করতে চায়। নরক, বলে, 'এ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। অতি ভীষণ সে স্থান।'

'ভীষণ বলেই আমি তা দেখতে চাই।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি নরকের অধীশ্বর, নরকের প্রতীক। আমার এই রত্নমুকুটের চেয়েও জ্বালা-করাল নরক, আমার এই কুণ্ডলের চেয়েও বহ্নিমান নরকলোক।'

'আমি সেই বহ্নিশিখাই স্পর্শ করতে চাই।'

'ভীষণদর্শন নরক-কিঙ্কর সেখানে লৌহশূর্মির আঘাতে নারকীদের শাস্তি দেয়।'

'নারকীয় বেদনায় আমি আকুল হয়ে উঠি। আমি বুক পেতে নিতে চাই শূর্মির আঘাত।'

বেদনায় কাঁপতে থাকে বেদনার কণ্ঠ। সসংশয় সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে আবার বেদনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নরক। এবার তীব্র শ্লেষ ধ্বনিত হয় তার কণ্ঠে, 'নারকীর জন্য নরক-মহিষীর এ-অভূতপূর্ব বেদনা যেন এক নূতন বিস্ময়।'

'বেদনার সমবেদনায় বিস্ময় তো নেই কিছু—' কম্প্র কণ্ঠে বলে বেদনা।

ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারে নরক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হারিয়ে যেতে চায় ধৈর্য। বজ্রস্বরে সে বলে, 'জান, নরক-দর্শনের ইচ্ছা হওয়াও পাপ।'

'পাপ!'—করুণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে বেদনা।

'হ্যাঁ'—কঠিন কণ্ঠে বলে নরক। ত্বরিতে আবার মহিষীর মুখে, চোখে সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বলে সে, 'ভেবে দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ। আমাকে এখনি যেতে হবে 'অসিপত্র' বনে। পৃথিবী থেকে নূতন একদল পাপীয়সী নারী এসেছে। পতিকে প্রবঞ্চনা করে মহাপাতকের ভাগী হয়েছে তারা। তাদের জন্য ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

শিউরে ওঠে বেদনা, কাতরস্বরে বলে, 'আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমাকে ওদের দেখতে দাও।'

আরক্ত নয়নে তাকায় নরক। ক্রুদ্ধ গর্জনে কক্ষ পরিত্যাগ করতে করতে সে বলে, 'যদি প্রয়োজন হয়, নিশ্চয়ই নরক-মহিষীর জন্য মুক্ত করতে হবে নরকের দ্বার। প্রতীক্ষা কর, আমি পাপীয়সীদের একটা ব্যবস্থা করে আসি।'

মত্ত পদক্ষেপ করে কক্ষ ত্যাগ করল নরক। তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে উঠেছিল কক্ষে জ্বলে উঠেছিল উজ্জ্বল আলো। বেদনার মনে হল, উজ্জ্বল আলোর বুক

থেকে একটা কৃষ্ণ বহ্নিশিখা যেন বেরিয়ে গেল সৃষ্টিকে দগ্ধ করতে। ভয়ে, দুঃখে গুমরে কেঁদে উঠল বেদনা। স্বামী তার এত নিষ্ঠুর।

ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে বেদনা। অস্থির চরণে কক্ষময় পদচারণা করে সে। দারুণ অস্বস্তি। প্রতীক্ষার মত এমন অস্বস্তিকর বুঝি আর কিছু নেই। রাজ্যের দুশ্চিন্তা ভর করে মস্তিষ্কে, রাজ্যের অশান্তি আন্দোলিত করে হৃদয়। সময় কাটে না, এক মুহূর্তে যেন এক যুগ।

সহসা থমকে দাঁড়ায় বেদনা। ঢং ঢং ঢং···দূরে যেন বাজে নরকের ঘণ্টা। রহস্যঘন দূরাগত ধ্বনি। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। বেদনা দেখে নি, কিন্তু শুনেছে, অসংখ্যবার শুনেছে—অতি ভয়ঙ্কর নরকলোক। ত্রিলোকীর দক্ষিণ প্রান্তে কালাগ্নিরুদ্রপুরের ঊর্ধ্বে ভূগর্ভস্থ নিরয়লোক। কোটি কোটি যোজন তার বিস্তার। নরকের সংখ্যাও অসংখ্য: চৌরাশি লক্ষ নরক—তার মধ্যে আবার প্রধান একবিংশতি নরক। অতি ভীতিজনক তাদের নাম: রৌরব, মহারৌরব, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক কালসূত্র, অসিপত্র, অপ্রতিষ্ঠ, ঘটিযন্ত্র, সন্দংশ, তপ্তশূর্মি, সংশোষণ, কৃমিভোজন, পূঁজশোণিত ভোজন, শ্বান ভোজন, বজ্রকণ্টক শাল্মলী, করম্ভসিকতা, বৈতরণী, অবীচি, সূচিমুখ ও অয়ঃপান। নাম স্মরণ করে ভয়ে শিউরে ওঠে বেদনা। কেবল নরক নয়—একবিংশতি নরকে প্রতিষ্ঠিত ষড়শীতি নরককুণ্ড। এদের মধ্যে অতি ভয়াবহ দ্বাদশ কুণ্ড: বহ্নিকুণ্ড, উল্কামুখ, ক্ষারকর্দম, শুক্রকুণ্ড, বসাকুণ্ড, লালাভক্ষ, সর্পকুণ্ড, দংশকুণ্ড, বজ্রদংষ্ট্রা, অশ্রুকুণ্ড, মসীকুণ্ড, প্রাণরোধ। পাপাত্মার অবশ্যম্ভাবী গতি এই নরক, এই নরককুণ্ড। রক্তলোচন, তাম্রপিঙ্গল জটিলজটা কোটি কোটি নরকভৃত্য এদের রক্ষক। নির্দয় তাদের শাসন, মর্মান্তিক পীড়ন! কি হৃদয়বিদারক পাপাত্মার আর্তনাদ!

নিশ্চল পাষাণের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে বেদনা। সেই ক্রন্দন, সেই বুকভাঙা হাহাকার উঠছে যেন নরকের অন্ধকার বিদীর্ণ করে। 'মহারৌরব' নরক থেকে উঠছে কী এ ক্রন্দন? বেদনা জানে, যারা হিংসক, নরঘাতী—যারা ক্ষমাহীন, নররক্তে সিক্ত করে ধরাতল—হিংসায় যারা উন্মাদ, তাদেরই ভোগস্থান ভয়ঙ্কর মহারৌরব। দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এই মহানরক—তাম্রময়ী এর ভূমি। নিম্নে প্রচণ্ড হুতাশন ঊর্ধ্বে প্রলয়সূর্যের দাহন। অনলতাপে উত্তপ্ত তাম্রে পদক্ষেপ করামাত্র দেহ দগ্ধ হতে থাকে, ওপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করে মার্তণ্ড। একে দাবদাহে দগ্ধ দেহ, তদুপরি বজ্রদংষ্ট্রা দংশশূকের আক্রমণ—একযোগে আক্রমণ করে কোটি দংশশূক। দহনে ও দংশনে জর্জর পাপী 'হা মাতা, হা পিতা' ক্রন্দনে আকুল করে তোলে

নরকের বাতাস। উল্লাসে পৈশাচিক হাসি হাসে নরক-কিঙ্কর। ভীমদর্শন তারা, মমতাহীন—তাদের হস্তে দণ্ড, অঙ্কুশ। অঙ্কুশের তাড়নায় তারা পাপীকে উন্মাদ করে তোলে। কাতর ক্রন্দন, সকাতর অনুনয় 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্তরব। কেউ কর্ণপাত করে না। ভ্রমিযন্ত্রে স্থাপন করে নরকদাস তাদের নিক্ষেপ করে 'রুরুকুণ্ডে'। মহাসর্পের চেয়েও হিংস্র, ক্রুর, ভারশৃঙ্গ রুরু। মহারুরু আরও ভয়ঙ্কর। তাদের নামেই নরকের নাম—'রৌরব', 'মহারৌরব'। কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্র এই হিংস্র ক্রব্যাদ জন্তু পাপীকে আক্রমণ করে। হিংসার শাস্তি হয় হিংসায়। মর্মবিদারী সে শোচনীয় পরিণাম!

কল্পনাতেও সে দৃশ্য সহ্য করতে পারে না বেদনা। কোমল অন্তরে যেন তীব্রতুণ্ড রুরুর আক্রমণ, কমনীয় দেহে যেন তপ্ত তাম্রের অসহ্য দহন। নিজেই যেন মহারৌরবে পতিত হয়েছে সে। আতঙ্কে দুই হস্তে সে নয়ন আবৃত করে। আবৃত নয়নে অনাবৃত হয় যেন 'মহাতামিস্র' নরকের দৃশ্য।

ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 'মহাতামিস্র' নরক। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, নিজের দেহটি পর্যন্ত নয়। সেই নিদারুণ অন্ধকারে হিমখণ্ডপ্রবাহী অতি শীতল বায়ুপ্রবাহ। অতি প্রচণ্ড তার বেগ। সেই বায়ুর আঘাতে মুহূর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় পাপীর অস্থি, মজ্জা। এ জগতে যারা মদান্ধ, দস্যু, ধর্মসেতু লঙ্ঘনকারী—তারাই এ নরকে প্রবেশ করে। একে মহাতমিস্রায় অন্ধ দৃষ্টি, তার ওপর হিমশীতল বায়ুর কঠিন প্রহার। চূর্ণ দেহের গলিত রক্তে হিমস্তূপ রক্ততুষারে পরিণত হয়। ক্ষুব্ধ, তৃষিত, অন্ধ পাপী স্মৃতিহারা উন্মাদের মত সেই রক্ততুষার ভক্ষণে উদ্যত হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে আসে বজ্রদণ্ডধারী নরক-রক্ষক। বজ্রদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হানে পাতকীর মস্তকে। আঘাতে আর্তনাদ করে ওঠে পরস্বাপহারী মদান্ধ। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে তারা—অন্ধকারে দিশাহারা ভ্রষ্টবুদ্ধি, নষ্টস্মৃতি পাপী—অথৈ 'অশ্রুকুণ্ডে' নিমজ্জিত হয়।

আর যেন ভাবতে পারে না বেদনা। তারও চোখে উত্তাল হয় অশ্রুনদী। সভয়ে চোখ খোলে সে। নরকে নয়, নিজের প্রকোষ্ঠেই সে দাঁড়িয়ে আছে। কক্ষে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে দীপালোক। বাতায়নপথে দেখা যায় সেই অন্ধকার। কক্ষের আলো যেন আরও ভয়াবহ করে তুলেছে বাইরের অন্ধকারকে। অন্ধকার অন্ধকারই থাক। অন্ধকারই নেমে এসেছে তার জীবনে। কি প্রয়োজন প্রদীপের? উচ্চকণ্ঠে সে দাসীকে ডাকে, নিজের চিৎকারে নিজেই শিউরে ওঠে। দাসী কক্ষে

প্রবেশ করে। ফিসফিস করে সভয়ে বলে বেদনা, 'প্রদীপ নিবিয়ে দে।' দাসী ঠিক বুঝতে পারে না। দীপ নিবে না, স্তিমিত হয়। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে যায় দাসী। আনমনে বেদনা এসে দাঁড়ায় গবাক্ষপথে। বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার-দর্পণে কি স্বামীর প্রতিবিম্ব পড়েছে? অন্ধকারে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ কাদের ওই প্রেতদেহ? একি হল বেদনার! কেউ কি সত্যই স্মৃতি হরণ করল তার? মনে হল, সে যেন 'অবীচিমৎ' নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নিস্তরঙ্গ নীরের ন্যায় মহাশূন্যে অবস্থিত নিরালম্ব অবীচি নরক। নরক-কিঙ্কর সুউচ্চ পর্বত থেকে পাপীকে অধঃশিরায় এই নরকে নিক্ষেপ করে। তরঙ্গহীন, নিরালম্ব কঠিন 'অবীচি'। পতনভয়ে আতঙ্কে ক্রন্দন করে ওঠে জীব। প্রচণ্ড ঘূর্ণনে ঘূর্ণিত মস্তক, ঘূর্ণিত নেত্রতারকা। অনন্তশূন্যে মূর্ছিত হয় পাপমতি।

দুই করে নিজের মস্তক তাড়না করতে থাকে বেদনা। স্মৃতিকে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সে দেখতে চায়, এ নরকের শেষ কোথায়? ব্যাকুলভাবে সে স্বামীর প্রতীক্ষা করে।

অতিক্রান্ত রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। এদিকে নিস্তব্ধ জগৎ। খুব কান পেতে শুনলে শোনা যায়, কিসের যেন বোঁ-বোঁ শব্দ। সেই শব্দ ভেদ করে মাঝে মাঝে যেন ভেসে আসে অজ্ঞাত নরকের ক্রন্দন। সত্যিই কি এ নারকীর ক্রন্দন? না তারই হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন কোন প্রেতের আর্ত চিৎকার? বুক দুরুদুরু করে বেদনার। সর্বাঙ্গে এক সভয় কম্পন! অন্তঃকর্ণে সে শুনতে পায়, নরককিঙ্করের ভৈরব গর্জন, পাপীর 'হা হতোস্মি' আর্তনাদ! বৈতরণী কি উত্তাল হয়েছে তার হৃদয়ে, নারকী কি নীড় বেঁধেছে তারই অন্তরে? অস্থির হয়ে ওঠে বেদনা।

সহসা স্তিমিতপ্রদীপ কক্ষে প্রবেশ করে নরক। কি ভীষণ মূর্তি! পর্বতপ্রমাণ দেহে সরোষ কম্পন, ক্রোধে জ্বলজ্বল করছে সংরক্ত নয়ন, ললাটে সহস্র কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ, কণ্ঠে সংক্রুদ্ধ গর্জন—যেন মূর্তিমান কৃতান্ত, অথবা তার চেয়ে ভয়ঙ্কর। ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে বেদনা, 'এ কি মূর্তি তোমার! কার সর্বনাশ করে এলে তুমি?'

বিকট অট্টহাস্য করে নিশীথের মেঘমন্দ্রে বলে নরক, 'কূটসত্যভাষীদের ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করে এলাম। মিথ্যাচারী 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'—তাদের জন্য রয়েছে মহাঘোর 'অসিপত্রবন' নরক। জাজ্বল্যমান অনলে পরিব্যাপ্ত সহস্র যোজন পরিমিত গভীর অরণ্য। দ্বাদশ সূর্যের তেজে অতি উত্তপ্ত সে স্থান। তারই মাঝে সন্নিবিষ্ট খড়্গাফলকময় অসিপত্র বৃক্ষ। আপাতরমণীয় ছায়াতরু—দেখে

মনে হয় বড় শীতল, বড় স্নিগ্ধ। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! অসিপত্র অসির মতই ক্ষুরধার—উভয়ত তীক্ষ্ম। তাপদগ্ধ তৃষ্ণার্ত জীব বড আশায় সেই বনে প্রবেশ করে, আশার নেশায় ছুটে যায় অসিপত্র বৃক্ষের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবাহিত হয় অসিপত্রপাতী প্রলয়বাত্যা, শ্রাবণের ধারার ন্যায় পাপাত্মার ওপর পতিত হয় তীক্ষ্মধার অসিপত্র। মুহূর্তে উৎপলনালের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড দেহ, মুহূর্তে বিপর্যয়। আকুল ক্রন্দন করে ওঠে মিথ্যাচারী, বাক্-অপহারী—মিথ্যার কুহকে মিথ্যাবাদিতার নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে তারা। এইখানেই সাজার শেষ নয়।

'আর বলো না, আর বলো না'—কাতর ক্রন্দন করে ওঠে বেদনা। অসিপত্র-বন নরকে যেন নিজেই পতিত হয়েছে সে। সভয়ে পালাতে চেষ্টা করে বেদনা। ভীম বাহু বিস্তার করে বাধা দেয় নরক। তেমনি উৎকট অট্টহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করে বলে, 'তাদের মধ্যে আবার রয়েছে ছলনাময়ী পুংশ্চলী। পাপীয়সী কামিনী—তারা পতিরূপে সম্ভোগ করেছে সগোত্র সহোদরকে—'

আহত, রক্তাক্ত বিহঙ্গীর মত নরকের কবলে ছটফট করে বেদনা। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে ক্ষুব্ধ গর্জনে বলে নরক, 'আরে, পাপীয়সী! তাদের জন্য যে রয়েছে 'বজ্র কণ্টক শাল্মলী'। ব্যভিচারী পুরুষ, আর ব্যভিচারী নারীর জন্য নির্দিষ্ট এই নরক। বজ্রতুল্য কণ্টকময় শাল্মলী, তপ্ত লৌহতুল্য তার কণ্টকশলাকা। নরককিঙ্করের অঙ্কুশ তাড়নায় জর্জর হয়ে কামাচারী লম্পট সেই শাল্মলীবৃক্ষকে আলিঙ্গন করে—'

গভীর যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে বেদনা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিষ্ঠুর হাস্যে হৃদয় কম্পিত করে বলে নরক, তপ্তকণ্টকে বিদ্ধ রক্তাক্ত কামুক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, লৌহদণ্ডের আঘাতে তাড়না করতে করতে নরকভৃত্য তাদের নিক্ষেপ করে উত্তপ্ত 'শুক্রকুণ্ডে'—

ভয়াল দন্তপংক্তি বিকাশ করে ভয়াবহ হাসি হেসে ওঠে নরক। স্বামীর এ মূর্তি কোনদিন দেখেনি বেদনা। দুই হস্তে মস্তক পীড়ন করে গভীর আর্তনাদ করে ওঠে সে, অশ্রু-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, 'এ জগতে পাপ নেই কার? পাপী নয় কে? তার জন্যে এ নিষ্ঠুর পাশবিক শাস্তির ব্যবস্থা কোন্ নির্মম বিধাতার?'

বিধাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে থমকে দাঁড়ায় নরক। বজ্রমুষ্টি শিথিল করে বেদনাকে ছেড়ে দেয়। অতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে পলকে দেখে নেয় বেদনার পাংশু বদন। সবই নিমেষের ঘটনা। সহসা যেন বজ্র বিদীর্ণ হয় কক্ষে। নরক ডাকে, 'বেদনা!'

স্বামীর কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব এ স্বর। সভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় বেদনা। রুদ্রস্বরে বলে নরক, 'এখনও নরক দেখতে চাও তুমি?'

মস্তক আনত করে মৌন থাকে বেদনা। তারপর বলে:

'জানি, যন্ত্রণাময় নরক—ভীষণ, বীভৎস তার চিত্র। কিন্তু যে যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি, তা নরকের চেয়েও ভয়ংকর'—অশ্রুসজল বেদনার নয়ন, যেন নীলসাগরের সজল ঢেউ; আবেগকম্পিত স্বরে সে বলতে থাকে, 'যখন জেগে থাকি, নরকের ক্রন্দনধ্বনি আমাকে আকুল করে তোলে। কোথা থেকে, ভেসে আসে 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' আর্তরব—আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমারই হৃদয়ে অনুভব করি দংশশুকের দংশন, তপ্তকুণ্ডের জ্বালা।'

নরকের রক্তনেত্রে প্রখর হয়ে ওঠে উগ্র ভয়াল দৃষ্টি। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলে চলে বেদনা, 'দিনে সূর্যবিম্বকে আমি রশ্মিবিহীন দেখি, শুক্ল বস্ত্রখণ্ড আমার চোখে দেখায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মনে হয়, ছায়ার অসংখ্য কায়া ঘুরছে আমার চারপাশে।'

নরকের বদনমণ্ডলে গাঢ় মেঘের ওপর গাঢ় মেঘ জমে। ক্রমে আরও যেন ভীষণ আকার ধারণ করে তার ঘোর কৃষ্ণ আনন। স্বল্পালোকে সে এক রহস্যঘন ভয়াল মূর্তি। উদ্‌ভ্রান্তের মত গর্জন করে সে বলে, 'আরও কিছু?'

'আরও অনেক কিছু'—অশ্রুরুদ্ধ ভীত কণ্ঠে বলে বেদনা, 'ঘুমিয়েও শান্তি নেই আমার। অর্ধ তন্দ্রা, অর্ধ জাগরণ। সেই অবস্থায় স্বপ্ন দেখি, রক্তকৃষ্ণ বস্ত্রধারী বিকটাকার দেহ—হাতে পাশ, বজ্রদণ্ড—আমাকে পাশবদ্ধ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণদিকে! সামনে তরঙ্গায়িত দুস্তর 'বৈতরণী'—জলস্রোতে পূয, শোণিত, মাংস, বসা—কি বীভৎস! ঘৃণায় সঙ্কুচিত হই আমি, পালিয়ে আসতে চাই—পারি না। বজ্রদণ্ডধারী পুরুষ বজ্রদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করে মস্তকে—যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি আমি। তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখি, পাশে শুয়ে আছ তুমি। তবু ভয়ে সারা হই!'

সভয়ে কাঁপতে থাকে বেদনা, যেমন অসিপত্রপাতী বায়ুর প্রহারে কাঁপে পাপাত্মা। অগ্নিকটাক্ষ নিক্ষেপ করে সিংহনাদে গর্জন করে ওঠে নরক, 'তা হলে সত্যিই নরক-দর্শনের সময় হয়েছে তোমার। শোন বেদনা, নরকের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করছি তোমার কাছে। বেদগর্ভ বিধাতার অস্খলিত সত্যের বাক্যই বেদের মত উচ্চারিত হয় জ্ঞানী, পণ্ডিতগণের কণ্ঠে। তাঁরা বলেন, 'জীবকে প্রত্যেকটি কর্মের ফলভোগ করতে হয়।' 'প্রাক্তনং বলবৎকর্ম'—এ উক্তি

মিথ্যা নয়, কল্পনাও নয়। অনাদি অবিদ্যার ফল দুষ্কর্ম—এই কর্মই মানুষকে তার স্বভাবের বিপরীত পথে চালনা করে, তাকে প্ররোচিত করে দোষাবহ লোকনিন্দক পাপে। এরই পরিণাম প্রকৃতি বিপর্যয়, মৃত্যু, সহস্র সহস্র নরকগতি।'

নিশ্চল দাঁড়িয়ে শুনে যায় বেদনা, বজ্রমন্দ্রে বলতে থাকে নরক, 'মৃত্যুর পর স্থূলদেহ ধ্বংস হয়ে যায়, কর্মানুসারে পারলৌকিক ভোগের জন্য থাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ। তার অনুভূতি এই দেহেরই মত—একই সংজ্ঞা, একই বোধ, একই সংবেদন। যমদূত নিষ্ঠুর পীড়নে তাড়না করতে করতে এই দেহকে নিয়ে আসে 'যম' লোকে। সেখানে হয় কঠিন বিচার। সেই চুলচেরা বিচারে যারা পাপী সাব্যস্ত হয়—'অবরোহিণী গতি' প্রভাবে তারা নিমেষে উপস্থিত হয় নরকে। শুরু হয় নরকভোগ। এ ভোগ যে কী ভয়ঙ্কর, জীবিত মানুষ তা কল্পনা করতে পারে না। কালসূত্রে দেহ খণ্ডিত হয়, অসিপত্রে শতধা ছিন্ন হয়, বহ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হয়, শোষকুণ্ডে শুষ্ক হতে থাকে। সে লিঙ্গ-দেহ তবু বিনষ্ট হয় না। ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করেও তাকে অপেক্ষা করতে হয় পরবর্তী কর্মফলের জন্য। জীবের পারলৌকিক নরকভোগ হয় মৃত্যুর পরে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ইহজীবনেই রয়েছে, আর এক ভয়ঙ্কর নরক—নাম তার 'ভৌম নরক'।'

বহুদিনের বুভুক্ষু, যেমন লোলুপ উগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি, তেমনি দৃষ্টিতে নরকের দিকে তাকায় বেদনা, গ্রাস করে তার কথা। নরক বলে চলে, 'হ্যাঁ, ভৌম নরক। জীবরূপে সত্তার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার নামই 'ভৌম নরক'। আলোর জীব—শুক্রশোণিতের পিণ্ডরূপে বর্ধিত হয় মাতৃগর্ভে, দশমাস দশদিন গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করে 'প্রাজাপত্য বায়ু'র আকর্ষণে মায়ার সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়—কর্মবশে ভ্রমণ করে 'ভবচক্র', চৌরাশি লক্ষ যোনি। কখনও হয় স্থাবর—তমোময় অন্তঃসংজ্ঞ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম; কখনও লাভ করে তির্যক গতি—কৃমি হয়ে, কীট হয়ে আশ্রয় করে নারকীয় যোনি। এও নরকভোগ—এ ভৌম নরকের সংখ্যা চৌরাশি লক্ষ। ভৌম নরকের মধ্যে প্রধান নর-জীবন। সূক্ষ্ম বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর, তেমনি ভ্রূণস্থ সূক্ষ্ম বীজে এ দেহের উৎপত্তি। কি আকর্ষণ এই দেহের! কি অদ্ভুত তার মমত্ববোধ! প্রিয় বন্ধু, প্রিয় পত্নী, প্রিয় পুত্র—এই প্রিয়জনের জন্য অন্যায় কর্মে অর্থসঞ্চয়; কামোপভোগের জন্য পরকে বঞ্চনা, শোষণ; আত্মস্বার্থের জন্য জঘন্য পৈশুন, নরহত্যা! সুখ-সুখ করে উন্মাদ জীবকুল। কিন্তু সুখী কি হয় মানুষ?'

বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে বেদনা। সেই নেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে

গম্ভীর নাদে বলে নরক, 'সুখী হয় না। বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী সুখ, প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অচিরস্থায়ী যৌবন। সর্বোপরি বন্ধন-রজ্জু হস্তে অপেক্ষা করে দুর্জয় কাল, সুখপ্রমত্ত মানুষ সে কাল-বৃককে দেখে না—যেমন মাংসলুব্ধ মৎস্য দেখে না লৌহ শঙ্কু। আপাতরমণীয় সুখে বিভোর হয় মানুষ। বড় মধুর পঞ্চেন্দ্রিয়, ষড়রিপুর আকর্ষণ—বড় সুন্দর কামনা-কান্তা, ইন্দ্রিয়ভোগ! তারই বিষময় পরিণাম নরক। এ নরক পরলোকের নরক নয়, ইহলোকের নরক। চিরকাল ধরে পণ্ডিতেরা বলে আসছেন, ইহলোকেই রয়েছে স্বর্গ, ইহলোকেই রয়েছে নরক। মানুষের মন সেই স্বর্গ, সেই নরক। কর্মের ভোগ এই স্থূল দেহেই শুরু হয়, পরলোকের নারকীয় যন্ত্রনার সূচনা হয় ইহজীবনে। মানুষের মনই দুষ্কর্মের ফলে দুশ্চিন্তার নরক সৃষ্টি করে। মনেই জ্বালা, উত্তাপ—মনেই অনুশোচনার বজ্রকীটের সহস্র দংশন। রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভয়—এগুলি তো আছেই, তার ওপর দুষ্কৃতিজনিত মানসিক পীড়া। অতি ভীষণ তার প্রতিক্রিয়া। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, নিদ্রা নেই—অহরহ বিষজ্বালা। মহারৌরব, মহাতমিস্রের চেয়েও দুঃসহ মন-নরকের বিভীষিকা। এই বিভীষিকা জাগ্রত অবস্থায় যেমন মানুষকে আক্রমণ করে, তেমনি ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করে স্বপ্নরূপে। দিবসের দুশ্চিন্তাই রাত্রির দুঃস্বপ্ন, দিবসের কদর্য কামনাই রাত্রির ভয়। এরই আক্রমণে মানুষ স্বপ্নঘোরে আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে।'

ক্ষণেকের জন্য নীরব হয় নরক। নীরব কক্ষে যেন প্রতিধ্বনিত হয় নরকের কণ্ঠ! প্রকোষ্ঠে আলো-ছায়ার রহস্যময় কম্পন! বেদনার চোখে-মুখে সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় ভীতির চিহ্ন। স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের মত থরথর কাঁপছে তার দেহ, অধরপল্লব। নয়নের তারায় তারায় চঞ্চল কম্পন। নিশীথকালের গর্জিত বজ্রের মত গর্জন করে ওঠে নরক, 'বেদনা!'—তার রক্তনেত্রে আগ্নেয় উচ্ছ্বাস: 'তোমারও মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকট হয়েছে সেই নারকীয় যন্ত্রণা। এ শুধু সমবেদনা নয়, নরকের ভয়ে ভীত পাপীর মর্মবেদনা। বল, কি ভয়ঙ্কর পাপ করেছ তুমি জীবনে?'

বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ বেদনা। শুষ্ক বক্ষ, শুষ্ক রসনা—যেন বজ্রবাতে শোষিত পাতকী। শুষ্ক স্বরে সে শুধু বলে, 'আমি!'

'হ্যাঁ, তুমি!'—বজ্রস্বরে, নিনাদিত হয় বিচারকের কণ্ঠ: 'বল কি পাপ করেছ জীবনে? সাবধান, গোপন করো না—কোন কথা গোপন করো না।'

বেদনার মনে হয়, বজ্রদণ্ড হস্তে কে যেন সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, কে যেন করাল

ভ্রূকুটি করে অঙ্কুশ উদ্যত করেছে। সাধ্য নেই কোন কথা গোপন করে, সাধ্য নেই সে পালিয়ে যায়। উর্ধ্বে অসিপত্র, নিম্নে বহ্নিকুণ্ড সম্মুখে মহা হিংস্র রুরু, পশ্চাতে বজ্রাঙ্কুশ। কম্পিত কণ্ঠে স্খলিত বচনে বলতে থাকে বেদনা, চির অসত্যময়ী আমার জননী নির্ঋতি, চিরন্তন মিথ্যার বিগ্রহ আমার জনক অনৃত। সহোদর সহোদরা হয়েও তারা স্বামী-স্ত্রী।

ভ্রূভঙ্গে বলে নরক, 'সে পাপ তাদের। জনক-জননীব স্বভাব সন্তানে সংক্রমিত হয়, তাদের পাপ সন্তানকে স্পর্শ করে না।'

'তাদেরই চার সন্তান আমরা। দুই ভ্রাতা, দুই ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ অগ্রজ—নাম 'ভয়া, অগ্রজার নাম 'মায়া'। ভ্রাতা-ভগ্নী হয়েও তারাও পতি-পত্নী।'

'সে পাপও তাদেব। এক ভ্রাতা বা ভগ্নীর কর্মেব জন্য অন্য ভগ্নী দায়ী হতে পারে না।'

'মাতাপিতার চতুর্থ সন্তান আমি।'

'তোমার তৃতীয় ভ্রাতা ?'

'মাতা তখন ছিলেন রজঃস্বলা। পর্বকালে তিনি চণ্ডাল দর্শন করেন। সেই চণ্ডালের ঔরসে আমার মাতার ক্ষেত্রে তৃতীয় সন্তানের আবিভাব হয়। শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন পিতা। আমাদের সমাজে চির অবারিতা নারী, তাই পিতাকে নীরবে সহ্য করতে হয় ব্যভিচার। কিন্তু প্রসবের ঠিক পূর্বক্ষণে সহসা বজ্রনির্ঘোষে গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'আরে পুংশ্চলী, এ ক্ষেত্রজ সন্তান যেন আমার গৃহে প্রসূত না হয়।'

'তার পর।'

'হতভাগিনী জননী এক নির্জন শ্মশানে এসে অতি দুঃখে সেই সন্তান প্রসব করেন। প্রচণ্ডস্বভাব স্বামীর ভয়ে অপত্য-স্নেহ বিসর্জন দিতে বাধ্য হন তিনি। সদ্যোজাত সেই অনাথ শিশুকে অসহায় অবস্থায় শ্মশান প্রান্তে পরিত্যাগ করে, নয়নের জল মুছতে মুছতে গৃহে ফিরে আসেন ব্যথা-অভিহতা জননী।'

নীরব হয় বেদনা। দুঃখে সিক্ত নয়ন। বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমোচন করে সে। ক্ষণেক নীরব থাকে মহাভয়ঙ্কর নরক। তারও মানস-পটে জেগে ওঠে আর একটি পরিত্যক্ত অনাথ শিশুর চিত্র। এমনি করে কোন মাতা তাকেও বর্জন করেছিল। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে নরক, পরমুহূর্তে ক্ষোভে ক্রোধে নিজের মনেই গর্জাতে থাকে সে—চিরকালের ব্যভিচারিণী নারী—কামনার চির-দাসী। সে কদর্য কামনার নিকট তুচ্ছ স্বামী-প্রেম তুচ্ছ সন্তান-স্নেহ। বেদনাও কি সেই পাপে

পাপী? রক্তনয়নে ঘোর রবে সে বলে, অন্যের কাহিনী শুনতে চাই না আমি। তোমার পাপ, তোমার কুকীর্তির কথা ঘোষণা কর, নারী।'

অসিপত্রাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন নারকীর মত করুণকণ্ঠে বলে বেদনা, 'আমার পাপ—আমি পতিরূপে বরণ করেছি সেই ভ্রাতাকে, রজঃস্বলা অবস্থায় চণ্ডাল-দৃষ্ট হয়ে আমার জননী যে দুর্ভাগ্য সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন—'

'আমি! আমি সেই পরিত্যক্ত শিশু? তোমার সহোদর?'—ক্রোধ ও ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে নরক। তার সর্বাঙ্গে বহ্নিজ্বালা।

স্থির নীল নয়নে স্বামীর রক্তাক্ত লোচনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ক্লান্তস্বরে বলে বেদনা, 'তুমিই সেই সহোদর—'নৈর্ঋতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ'—

দেহের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় ওঠে। আরক্ত চক্ষু, ঘূর্ণিত মস্তক। 'ধ্বস্ত হও, ধ্বস্ত হও'—বলে ভীষণ গর্জন করে ওঠে নরক। জ্ঞানহারা উন্মাদের মনে হয়, নিজেই ধ্বস্ত হচ্ছে সে। বজ্রকণ্টক শাল্মলীর আলিঙ্গনে জর্জর দেহ মহারৌরবের রুরু দংশনে বিক্ষত অঙ্গ, তপ্ত কুণ্ডের দহনে দগ্ধ মস্তিষ্ক—অবীচি নরকের নিস্তরঙ্গ, নিরালম্ব শূন্যে আশ্রয়হীন হয়ে যেন ঘুরতে ঘুরতে সে পড়ছে—ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাতমিস্র নরক, সঙ্গে পত্নীরূপা তারই সহোদরা বেদনা। তারই ঔরসজাত পুত্র 'দুঃখ' যেন এসে ঘিরে ধরেছে নরককে। *

* নরক বর্ণনা সকল পুরাণেই আছে। এখানে শ্রীমদ্‌ভাগবত (৫।২৬), বামন পুরাণ (১১, ১২ অধ্যায়) এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (প্রকৃতি ২৯ অঃ) অনুসরণ করা হয়েছে। নরক স্বীয় ভগ্নী বেদনাকে বিবাহ করে এবং তাদের পুত্র 'দুঃখ'—এই তথ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫০ অধ্যায়) থেকে গৃহীত।

# ॥ ভয়া ॥

অতি ভয়ঙ্কর বীভৎস সে দৃশ্য! কালনাগিনীর মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণা এক ললনা—দুই হাঁটু গেড়ে বসেছে মাটিতে। পশ্চাতে প্রসারিত পদযুগল, ঈষৎ নত সম্মুখের কঙ্কালসার দেহযষ্টি। বিকট করাল বদন, কটা চোখে অত্যুগ্র দৃষ্টি। স্খলিত কণ্ঠে অস্পষ্ট উচ্চারিত আভিচারিক মন্ত্র। দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে তৃষিত লেলিহ রসনায় কি যেন পান করছে সে।

তামসী বিদ্যাবলে কলেবর পান করছে কালকন্যা 'ভয়া'। দুরন্ত, মহাভয়ঙ্কর কাল। ক্ষমাহীন করাল গ্রাসে তিনি বিশ্বরস পান করেন। তাঁর তিনশত যাট পুত্র, তিনশত যাট কন্যা। প্রত্যেকেই ভীষণদর্শন, উগ্রস্বভাব, পিতৃ-প্রকৃতির প্রতিরূপ।

এই কালেরই অন্যতমা কন্যা ভয়া। পিতার মতই অত্যুগ্র, ভ্রাতা-ভগ্নীর মতই ভয়ঙ্করী। তারও স্বভাবে চিরজাগ্রত ক্ষুধা। উদ্যত গ্রাস, উদ্ধত প্রকৃতি। কুটিল-ভাষণে সে অদ্বিতীয়া—বাক্যে বহ্নিস্ফুলিঙ্গ, জিহ্বায় দুষ্টা সরস্বতী। ভগ্নীরা সহোদরার নাম রেখেছিল 'দুর্মুখা'। দুর্মুখা কেবল দুষ্টভাষিণী নয়, সে দুষ্টমুখে পান করে মানুষের কলেবর—নিমেষে শোষণ করে নেয় দেহের সদগুণ—বিদ্যা, বিনয়, সদাচার। অতি ভীষণ তার তামসী বিদ্যা।

পিতা আদর করে নয়নানন্দ দুলালী কন্যার নাম রেখেছিলেন 'সুনীথা' অর্থাৎ ধর্মশীলা। অধর্ম-সম্ভব কাল, ধর্মের চিরবৈরী। কিন্তু তিনি জানতেন, ধর্ম ও অধর্মের আদি পুরুষ এক। একই বিরাট পুরুষের বক্ষ থেকে ধর্ম, পৃষ্ঠ থেকে অধর্মের উৎপত্তি। কালক্রমে বংশলতিকা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, দুই বংশের মধ্যে জেগেছে বিরোধ। বৃদ্ধ কালের অন্তরে তাই প্রচ্ছন্ন ছিল একটি কামনা—আবার দুই বংশের মেলবন্ধন স্থাপন করা যায় কিনা। তিনি স্থির করেছিলেন, এই কন্যাকে সমর্পণ করবেন কোন ধর্মশীলের করে, একসূত্রে গ্রথিত করবেন দুই বিরোধী কুল। সাধ করে তাই তিনি ভয়ার নামকরণ করেছিলেন সুনীথা।

শৈশব অতিক্রম করে সুনীথা যৌবনে উত্তীর্ণ হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হল

বংশগত দুর্গুণ। বক্রকুটিল প্রকৃতি, দুর্দমনীয় ঔদ্ধত্য। সর্বোপরি তার কলেবর পানের মত্ততা। চিন্তিত হলেন প্রবৃদ্ধ কাল, কোন্ ধর্মশীল গ্রহণ করবেন এই দুর্বিনীতা অধর্মশীলাকে?

স্বায়ম্ভুব মনুবংশের ধর্মপ্রভব রাজা অঙ্গরাজ 'ক্ষত'—সুকৃতকর্মা, আচারনিষ্ঠ, শাস্ত্রপারঙ্গম। তিনি প্রজাবৎসল, সাধুসজ্জনের একাশ্রয়। তাঁর রাজ্যে নিত্য যাগ নিত্য দানক্রিয়া, নিত্য অতিথিসৎকার। প্রজাপুঞ্জ রাজভক্ত, সুশীল, ধর্মপরায়ণ।

কাল ভয়াকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা অঙ্গের দ্বারে। ত্রিলোকত্রাস মহামান্য কাল। অঙ্গরাজ পবম সমাদরে অতিথিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেন, মধুপর্ক ও আসন নিবেদন করে বিনীতভাবে করলেন কুশলপ্রশ্ন।

কাল বললেন, 'প্রার্থী হয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার বহু কন্যার মধ্যে আদরিণী কন্যা এই সুনীথা। সৎপাত্রে কন্যাদান করাই পিতার কর্তব্য। তুমি ধর্মপরায়ণ, সুকৃতিশীল। আমার কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর।'

কাল-বাক্যে চিন্তিত হলেন অঙ্গরাজ। কালের বংশগত শীলাচার তাঁর অজ্ঞাত নয়। সেখানে পুরুষ দুঃশীল, নারী দুঃশীলা—প্রত্যেকেই অধর্মবন্ধু, ধর্মবৈরী। অথচ প্রার্থী স্বয়ং কাল। প্রার্থীকে বিমুখ করাও অধর্ম। চোখে যেন অন্ধকার নেমে আসে, সে অন্ধকারে পথ খোঁজেন আলোর সন্তান অঙ্গরাজ।

মিনতিভরা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন কাল, 'ধর্মের পূত স্পর্শে আমার বংশ পবিত্র হোক—এই আমার আকাঙ্ক্ষা। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়, তোমার করস্পর্শে কলধৌত সুবর্ণের মত উজ্জ্বল হোক আমার কন্যা। তুমি একে গ্রহণ কর। এই সেতুবন্ধে যুক্ত হোক ধর্ম ও অধর্মের দুই বিরোধী কূল।'

মুহূর্তের দ্বিধা, পরমুহূর্তেই স্থির-সঙ্কল্প। স্থিতধী, সংযত অঙ্গরাজ—নীলকণ্ঠের মতই তাঁর দুর্জয় তপঃশক্তি। কালকূটে তিনি নির্ভয়। তাঁর নিকট সমান মৃত্যু ও অমৃত, ভয় ও অভয়। পুণ্যের স্পর্শে পাপ যদি সুগতি লাভ করে, পুণ্যবান্ কি তাতে বিমুখ হয়? কল্যাণ-মিত্র অঙ্গরাজের আননে ধর্মের জ্যোতির্ময় প্রভা বিকশিত হয়, মধুর কণ্ঠে তিনি বলেন, 'প্রার্থীকে বিমুখ করা অধর্ম। আপনার যদি একান্তই এই ইচ্ছা—'এবমস্তু', আমি সানন্দে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করব।'

প্রজাগণ কিন্তু সন্তুষ্ট হল না, সন্তুষ্ট হলেন না রাজ্যের কল্যাণকামী

ঋষিবৃন্দ। দুর্নিমিত্ত আশঙ্কা করে শঙ্কাকুল হলেন কুলপুরোহিত। অথচ রাজাকে বাধাও দিতে পারলেন না তাঁরা। সাহসে বুক বেঁধে যথাবিহিত আচারে অঙ্গরাজ কাল-কন্যা ভয়াকে বিবাহ করলেন। সুনীথা পেল ভার্যার অধিকার।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'—শাস্ত্রের এ অনুশাসন অঙ্গরাজ জানতেন। কিন্তু শিউরে উঠলেন তিনি সুনীথার কুৎসিত মত্ততা দেখে। কি বীভৎস কাম-বিহ্বলতা, কি কদর্য কুটিলভাষণ! সে কালাকাল জ্ঞানশূন্যা। ভয়াল গ্রীষ্মের ক্ষুধা যেন ভয়ার বুকে।

কোন্ দূর অন্ধকার পুরী থেকে যেন কালরাত্রির ছায়া নেমে আসছে! কারা যেন ব্রতভ্রষ্ট কবার জন্য জোট পাকাচ্ছে! প্রাণপণে আত্মদমন করলেন অঙ্গরাজ, সঙ্কল্প করলেন, 'সংযম হোক আমার আশ্রয়। বংশপরম্পরায় সন্তানে সংক্রমিত হয় মাতাপিতার স্বভাব। মাতার পাপবৃত্তি থেকে মুক্ত হোক আমার পবিত্র কুল। হোক বংশ লোপ, তবু অক্ষয় হয়ে থাক বংশের পুণ্য, নিষ্কলঙ্ক থাক স্বায়ম্ভুব মনুর গোত্র।'

কামিনীর উৎকট কামনা ব্যর্থ হল ধৃতব্রত অমিতাভের নিকট, কিন্তু ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল অভিহতা নারীর আক্রোশ। ভয়ার কুৎসিত বদন আরও ভয়াল হল, বক্রস্বভাব হল বক্রক্রুর। 'সে কি শক্তিহীনা?'—গর্জন করে উঠল দুর্মুখা। কালকন্যা সে, কালের মতই দোর্দণ্ড, দুর্বার। তামসী বিদ্যা, তার আয়ত্ত, সে কলেবরপায়ী। স্বামীর কলেবর সে পান করতে পারে না, কিন্তু রাজ্যে সৃষ্টি করতে পারে বিপর্যয়। সে গ্রাস করতে পারে প্রকৃতিপুঞ্জের সদগুণ!

সেদিন রাত্রিতে সে উদ্‌যাপন করল সেই মহাঘোর তামস ব্রত। অমাবস্যার রাত্রি। বাইরে অন্ধকার—তমসাবৃতা প্রকৃতি। আচ্ছন্ন দিঙ্মুখ—মুক্তবন্ধ যেন অশরীরী আত্মা। অন্ধ অন্ধকারে সহস্র প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব, নিশাচর-বৃত্তি যেন নিশীথের বুকে। সেই ভীষণ রজনীতে রাজ-প্রাসাদের একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল দীপাবলী নিবিয়ে দিল ভয়া, জ্বালাল এক মহাতৈল প্রদীপ। উৎপাতই সৃষ্টি করবে সে! রাজ্যময় ছড়িয়ে দেবে পুত্রকামা নারীর ব্যর্থ হাহাকার!

রাত্রি গভীর হলেও শয্যাকক্ষে সুনীথাকে না দেখে চিন্তিত হলেন অঙ্গরাজ। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করলেন। 'কোথায় গেল সে!'—এমন তো হয় না কোনদিন! কামার্তা আস্ফালন করে, গর্জন করে—শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে ঢলে পড়ে নিদ্রার ক্রোড়ে। কিন্তু আজ—

চিন্তাকুল চিত্তে রাজা বেরিয়ে এলেন কক্ষ থেকে। পার্শ্বকক্ষে প্রদীপ নেই, অথচ কক্ষ নিষ্প্রদীপও নয়। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি! সোৎকণ্ঠ অঙ্গরাজ-দ্বারের কাছে এলেন। দ্বার অর্গলবদ্ধ নয়। একটু ঠেলে দেখলেন, তৈলপ্রদীপের স্বল্পালোকে রহস্যঘন কক্ষ। রুদ্ধশ্বাসে কক্ষে প্রবেশ করলেন তিনি।

এ কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে অভিচার ক্রিয়ায় রত সুনীথা। সম্মুখে ক্রিয়ার দ্রব্য—কপালপাত্র, রক্তজবা, রক্তসিন্দূর। নতজানু হয়ে পদযুগল পশ্চাতে প্রসারিত করে বসেছে সে, সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে কৃষ্ণসার বিশীর্ণ দেহ। আথর্বণ মন্ত্রের অস্পষ্ট হুঙ্কার তার কণ্ঠে, দ্রুত চলেছে উপাংশু জপ। মাঝে মাঝে হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে উগ্র তৃষাতুরের মত কি যেন পান করছে সে!

এ কি যক্ষী, না রাক্ষসী? ডাইনী, না প্রেতিনী! আতঙ্কে শিহরিত রাজা। দ্রুত সম্মুখে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন, 'সুনীথা!'

সুনীথা তখন এ রাজ্যে নেই, যেন সে চলে গিয়েছে ভূত-প্রেত-পিশাচের জগতে। রাজার আহ্বানে অর্ধজাগরিতের মত তার সম্বিত ফিরে এল। উৎকট, বিভ্রান্ত, অর্থহীন, দৃষ্টি মেলে তাকাল অঙ্গরাজের প্রতি। রাজার মনে হল দেহ যেন বিশুষ্ক হয়ে যাচ্ছে! সভয়ে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'এ কি করছ সুনীথা!'

উদ্‌ভ্রান্তের মত অট্টহাস্য করে উঠল ভয়া, যেন অন্ধকারের অন্ধগর্ভে পিশাচীর অট্টহাস, যেন মহাতামিস্র নরকে নরকদূতের খলখল উচ্চরোল। ভয়ে কম্পিতপদে দ্রুত বেরিয়ে এলেন অঙ্গরাজ।

পরদিন থেকে রাজ্যে ঘোর দুর্নিমিত্ত সূচিত হল। দিনমানে অন্ধকার দিঙ্মণ্ডল, ধূলিপটলে আচ্ছন্ন গগন। কোথাও উল্কামুখী শিবার ধ্বনি, কোথাও অস্থি-করকা, কোথাও অকারণ শোণিতবৃষ্টি। সীমান্ত থেকে এল শস্যহানির সংবাদ, অকালমৃত্যু দেখা দিল রাজতন্ত্রে।

আতঙ্কগ্রস্ত প্রজা, আতঙ্কিত অঙ্গরাজ। ঋষিদের আহ্বান করলেন তিনি, আহ্বান করলেন কুলপুরোহিতকে। একে একে সমবেত হলেন অঙ্গিরা, কশ্যপ, ভৃগু, ক্রতু। অমঙ্গল শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন হোমের নির্দেশ দিলেন তাঁরা।

রাজোচিত আড়ম্বরে হোমের আয়োজন হল। দেশবিদেশ থেকে সমাহৃত হল যজ্ঞদ্রব্য। নানাস্থান থেকে এলেন বেদবিদ্ ঋত্বিক, অধ্বর্যু, উদ্গাতা,

হোতা। সূত, ভাট, মাগধে পূর্ণ হল যজ্ঞস্থল। কৃত সঙ্কল্প হয়ে রাজা বসলেন যজমানের আসনে, বামপার্শ্বে বসল, ভার্যা সুনীথা। উদাত্তকণ্ঠে সামগান গীত হল, পদানুক্রমে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করে হোতা যজ্ঞাগ্নিতে হবি আহুতি দিলেন।

কিন্তু কি দুর্দৈব! বেদমন্ত্রের আকর্ষণে কর্মসাক্ষী দেবতা আবির্ভূত হলেন না। বিমুখ দেবমুখ অগ্নিদেব। যজ্ঞের হবি কুণ্ড বেয়ে ভূমিতে গড়িয়ে পড়ল। সোমপাত্র যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ রইল। বিস্মিত পুরোহিতবর্গ, বিস্মিত সমাগত ঋষিবৃন্দ। যজমান অঙ্গরাজের অন্তরে আশঙ্কা—এ কি বিঘ্ন!

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন পুরোহিত, 'রাজা অপুত্রক—এইজন্যই হবিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়েছেন দেবতা।'

উৎকট উল্লাসে জ্বলজ্বল করে উঠল ভয়ার উগ্র চক্ষু। লজ্জায় আরক্ত হল রাজার বদন, সঙ্কোচে তিনি মস্তক আনত করলেন। তাঁর নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠল, প্রত্যাখ্যাতা রতিকাম নারীর কুটিল মুখ, ভেসে উঠল—অন্ধকার নিশীথে বঞ্চিতা সুনীথার প্রাঞ্জলি-পানের বিকট দৃশ্য! কেমন করে তিনি শুদ্ধ, সরল ঋষিদের বোঝাবেন, কেন তিনি অপুত্রক! পুত্রকামনা কি তাঁরও ছিল না? জীব-প্রকৃতির মজ্জাগত বংশরক্ষার আকূতি।—কিন্তু তিনি শঙ্কিত হয়েছেন, পুত্রার্থে গৃহীতা ভার্যার স্বরূপ দেখে। লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে নীরব রইলেন অঙ্গরাজ।

ঋষিগণ নির্দেশ দিলেন, 'পুত্রকামনা করে আপনি যজ্ঞ করুন, নিশ্চয় মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। যজ্ঞেশ্বর অনপত্যকে অবশ্যই অপত্যবান করবেন।'

সুনীথার কটা চোখে উল্লাসের পৈশাচিক দীপ্তি। শেষ পর্যন্ত অঙ্গরাজ সম্মত হলেন। যজ্ঞে যদি সুনীথার অন্তর শুদ্ধ হয়, হয়তো সুপুত্রও লাভ করতে পারেন তিনি!

স্বস্ত্যয়ন হোমের হোমস্থলীতেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সূচনা হল। যাজ্ঞিক ঋষিগণ যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে হবি নিবেদন করতেই পরিতৃপ্ত দেবতার আশীর্বাদস্বরূপ যজ্ঞে আবির্ভূত হলেন এক দীপ্ত হিরণ্ময় পুরুষ—স্বর্ণকান্ত কান্তি, কণ্ঠে কাঞ্চনমালা, হস্তে সিদ্ধ পায়সান্ন। ব্রাহ্মণগণের নির্দেশে অঙ্গরাজ অঞ্জলিপুটে সেই পায়স গ্রহণ করলেন, যজ্ঞেশ্বরকে স্মরণ করে প্রথমে নিজে আঘ্রাণ করলেন সেই পরমান্ন—তারপর অন্নপাত্র দিলেন রাজ্ঞী সুনীথার হস্তে।

নির্লজ্জা সুনীথা, তার রসনায় বহ্নিতৃষা। ঋষি, ঋত্বিক ও সদস্যগণের সম্মুখেই সে এক নিশ্বাসে অন্নপাত্র নিঃশেষ করে ফেলল। হতবাক্ অঙ্গরাজ, স্তম্ভিত জনগণ! কামনার এ কী কদর্য নগ্ন মূর্তি!

যজ্ঞ শেষ হল। ভূরি দক্ষিণা গ্রহণ করে বিদায় হলেন ব্রাহ্মণগণ। আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন রাজ্যের মঙ্গলকামী ঋষিবৃন্দ। চিন্তিত অন্তরে রাজা প্রবেশ করলেন অন্তঃপুরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যা, প্রদোষের ছায়ায় প্রায়ান্ধকার জগৎ। লোকে একে বলে আসুরী মুহূর্ত। অসুরের মত্ততা প্রকাশ পায় সন্ধ্যার রহস্যঘন আধআলো, আধঅন্ধকারে। ক্ষুধার্ত কামনার বীজ সৃষ্টিকে আকুল করে তোলে, এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হন সন্ধ্যায়। যতি, সন্ন্যাসী, ধৃতব্রত গৃহী তাই এ সময়ে নিযুক্ত হন সন্ধ্যা-বন্দনায়। 'যদহ্না পাপমকার্ষম্' মন্ত্রে কলুষের বীজাণু বিনষ্ট হয়ে যায়, হৃদয়ে জাগে অমেয় প্রশান্তি! কিন্তু কলুষ-চিত্ত-জীব সন্ধ্যাক্ষণেই পীড়িত হয় কামবাণে। রুদ্রাধিকারভুক্ত সন্ধ্যায় যজ্ঞক্রিয়াহীন অসুর-বৃত্ত জীব উদ্দাম হয়ে ওঠে আসুরিক মত্ততায়।

কালকন্যা ভয়ার অন্তরেও আসন্ন সন্ধ্যায় মন্মথের মত্ত সঞ্চরণ। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেই বিহ্বলার মত ছুটে আসে সে, যেন ছুটে আসে বিষমুখ একটা অব্যর্থ তীক্ষ্ণ তীর। বুকে পাশব উত্তেজনা, মুখে আদিমতম আরণ্য প্রবৃত্তির বীভৎসতা! ধর্মশীল অঙ্গরাজ আতঙ্কিত হন, অনুনয়ে-উপদেশে শান্ত করতে চেষ্টা করেন অশান্ত তরঙ্গ। অশুভ মুহূর্তের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে পুরাণ-ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত করেন অসংযত কামনার ভীষণ পরিণামের উদাহরণ। কিন্তু সুদুষ্কর যেমন বায়ু, অনিয়ত যেমন প্রলয়কালের উল্কা, প্রমত্তা যেমন মদস্রাবী করিণী—তেমনি উদ্দাম ভয়া। বিচারহীন প্রচণ্ড ক্ষুধা, কামান্ধের নিকট ব্যর্থ শাস্ত্রের অনুশাসন। অসহায়, উপায়হীন অঙ্গরাজ।

ফলও ফলল প্রত্যক্ষ। ভয়ার দুর্বিনীতি ব্যসন-ভোগের বাসনায় জন্মগ্রহণ করল অধর্মাংশপ্রভব পুত্র 'বেণ'। মাতামহের মত দুরতিক্রমণীয়, মাতুলদের মত অতি কুটিল, মাতৃস্বসাদের মতই মহাভয়ঙ্কর। সে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম। শিশু হলেও বালভুজঙ্গের মত বিষধর, ক্ষুদ্র হলেও সর্বগ্রাসী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মত কষ্টকর। মূর্তিমান অধর্ম, হিংস্রতা, দুঃসহ, মহামদ আবির্ভূত হল ধর্মপরায়ণ স্বায়ম্ভুব মনুর গোত্রে।

কিন্তু এই দুরন্ত শিশু হল জননী ভয়ার নয়নানন্দ দ্বিতীয় আত্মা। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। নন্দন-দর্পণে আত্মরূপের প্রতিবিম্ব দেখে পরিতৃপ্ত হল সে। কি অপূর্ব শিশুর শৈশব-লীলা! দেখে দেখে সাধ মেটে না মায়ের। শিশু বেণ অট্টহাস্য করে পক্ষি-শাবকের কণ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করে, ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে রক্তধারা—ভয়ার

অন্তরে পৈশাচিক তৃপ্তি! বেণ ক্রীড়াছলে অন্যান্য শিশুদের কণ্ঠ চেপে ধরে, পীড়নে করুণ আর্তনাদ করে ওঠে ক্রীড়া-সঙ্গী—মুহূর্তে দেহ নীল হয়ে যায়, মৃত্যুতে নিশ্চুপ হয় দুগ্ধপোষ্য বালক। উৎকট উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে ভয়ার হৃদয়। ভয়ার বক্রস্বভাবের অবিকল প্রতিরূপ দুষ্ট বেণ। জঘন্য পুত্রগর্বে গর্বিতা কালকন্যা। বেণ তার নয়নের আনন্দ, প্রাণের প্রাণ। চোখের আড়াল হলে সে পলকে পাগল হয়।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন, খিন্ন হন ধর্মভীরু অঙ্গরাজ। বংশে এ কি অভিশাপ! এই আশঙ্কাই পূর্বে করেছিলেন তিনি—কুমাতার স্বভাবদোষে জন্ম নেবে কুসন্তান, কুটিল কামনার বিষবীজে অঙ্কুরিত হবে লোকত্রাস বিষবৃক্ষ। সন্তানের দুষ্ক্রিয়া তাঁকে চিন্তাকুল করে তোলে—'এর চেয়ে কি নিঃসন্তান হওয়া ভাল নয়?' সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকায় ব্যাকুল অন্তরে রাজ্য গৃহ, পুত্র—সবই অসার মনে হয়, মনে হয়—অর্থহীন প্রপঞ্চসার সংসার। অন্তরে বিরক্তি, গৃহধর্মে নৈরাশ্য, রাজকার্যে নিরাসক্তি—নির্বিণ্ণ মহারাজ ক্ষুত। একদিন নিশিযোগে নিদ্রিতা দুর্বিনীতা ভার্যা ও দুর্বিনীত পুত্রকে পরিত্যাগ করে নির্বেদপ্রাপ্ত অঙ্গরাজ বহির্গত হলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়। পশ্চাতে পড়ে রইল সর্বসম্পত্তিপূর্ণ রাজত্ব!

প্রজাবর্গ পিতৃহীন অনাথের মত হাহাকার করে উঠল। চতুর্দিকে চলল অনুসন্ধান। ব্যর্থ চেষ্টা। অনন্ত অমৃত পথের পথিক ধর্মশীল অঙ্গরাজ। মরজগতের মানুষ সে সাবিত্রী-পথের সন্ধান পাবে কোথা থেকে?

প্রথমে ক্রোধে গর্জন করে উঠল স্বামিপরিত্যক্তা দুর্মুখা, যেন অভিহতা কালনাগিনী। অকথ্য দুরুক্তির অসংখ্য দ্বিরুক্তি—স্বামী বলে ক্ষমা নেই, গুরুজন বলে দ্বিধা নেই। তারপর আকুল স্নেহে সে বুকে তুলে নিল শিশু বেণকে—পত্নীর ক্ষোভ উত্তাল হল মাতৃত্বের অন্ধ স্নেহোল্লাসে। স্বামী গিয়েছে যাক্—ধর্মভীরু দুর্বল স্বামীকে সে কামনা করে না—সে চায় না শান্তির নিঃসীম নির্জীবতা। বেঁচে থাক তার পুত্র। হৃদয়ের ধন এই পুত্রই হবে রাজ্যের সর্বস্ব, প্রজার দণ্ডধর রাজা। অন্তরের দুঃশীলতার নির্যাস ঢেলে দিল সে পুত্রের ওপর। তার মাতৃত্বে বর্ধিত হল দুরন্ত কালের মতই মহাভয়ঙ্কর বেণ, যেন অতি দুষ্ট এক কালসর্প। একে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, অন্ধ স্নেহের প্রশ্রয়ে এই কৃষ্ণতা বিস্তৃত হল অন্তরে ও আচরণে—যেন বিস্তৃত হল সর্বধ্বংসী, বজ্রসূচি কালান্তের নীললোহিত মেঘ।

নিরুপায় অমাত্যবর্গ ও প্রজা। সম্রাজ্ঞী সুনীথার নির্দেশে দুঃশীল বেণকেই

তারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করতে বাধ্য হল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লেলিহান শিখা বিস্তার করল এবার। মাতৃস্বভাবে বেণের পিতৃস্বভাব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ ক্রোধ, মহাদম্ভ, নির্মম নিষ্ঠুরতা—তার সঙ্গে যুক্ত হল দণ্ডনীতি, ঐশ্বর্য-মত্ততা ও আত্মাদরপরায়ণতা। নিরঙ্কুশ গজেন্দ্রের মত দুর্বিনীতি, মদোদ্ধত বেণ প্রচণ্ড দণ্ড—তার পীড়নে ও যথেচ্ছাচারে তটস্থ ত্রিভুবন। বেদ-ব্রাহ্মণ কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। বৈদিক ক্রিয়ার মূর্ত প্রতিবাদ, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের বৈরী, অধর্মের পরম মিত্র বেণ। সমাজ-শৃঙ্খলার মূলে সে কঠিন আঘাত হানল। বর্ণাশ্রমধর্মকে উপেক্ষা করে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করল অবৈধ অনুলোম, প্রতিলোম মিলন ; সে মিলন বিবাহ নয়, ব্যভিচার—দাম্পত্যবন্ধন নয়, স্বৈরাচার। প্রদুষ্টা স্ত্রীজাতি থেকে ক্রমে উৎপন্ন হল কুলঘ্ন বর্ণসঙ্কর। আত্মদম্ভে শৃঙ্খলার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে বজ্রনাদে ঘোষণা করল ভয়ানন্দন—তার রাজ্যে নিষিদ্ধ দেব-আরাধনা, নিষিদ্ধ যজ্ঞক্রিয়া একমাত্র রাজাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর—এই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বরেরই পূজা করতে হবে বেণ-রাজত্বে।

ঘোষণা শুনে পরম পরিতৃপ্তির হাসি হাসল ভয়া। স্বামীর প্রতি প্রচ্ছন্ন ছিল যে আক্রোশ—এ ঘোষণা যেন তারই প্রতিশোধ। ধর্মকে যোগ্য আঘাত হেনেছে তার উপযুক্ত সন্তান ! কটা চোখে কুটিল প্রসন্ন দৃষ্টি।

কিন্তু অসম্মান-ভয়ে ভীত হলেন অমাত্যবর্গ, ক্রিয়ালোপে প্রমাদ গণলেন নিরীহ পুরোহিত, দণ্ডভয়ে সন্ত্রস্ত হল প্রজাকুল। পঞ্চযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত গৃহমেধী আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। এ কি বিপর্যয় !

ধর্মহীন রাজ্য, প্রজা ক্রিয়াহীন। মহাদুর্দৈব আসন্ন ভেবে চিন্তিত হলেন রাজ্যের হিতার্থী তপোঋদ্ধ ঋষিবৃন্দ। তপস্যার ষষ্ঠভাগ তাঁরা কররূপে রাজাকে অর্পণ করেন। সেই কর অশেষ কল্যাণের আকর। সেই করেই সুখে ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয় রাজ্য-শ্রী। কিন্তু অন্ন, ঐশ্বর্য, শ্রী—সবই যজ্ঞ-সমুদ্ভূত। অধর্মাচারী রাজ্য সেই যজ্ঞ বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছে। ক্ষুণ্ণ হলেন আহিতাগ্নি ঋষিসঙ্ঘ। অন্তরের বিক্ষোভ বহ্নি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রেখে ভৃগু প্রমুখ প্রজাপতি বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন বেণসকাশে।

চণ্ড-শাসন ভয়া-নন্দন তখন দম্ভভরে বসেছিল রাজসভায়। সে সভায় মন্ত্রী—কুমন্ত্রী, কৌটিল্য-নীতি-বিশারদ পণ্ডিত বিতণ্ডাবাদী চার্বাক পন্থী। কবি কামশাস্ত্র পারঙ্গম। বিচারমূঢ় ভূপতির বিচারহীন সভা।

মহামান্য মুনিগণ উপস্থিত হলেও উদ্ধত রাজা আসন থেকে উঠে প্রত্যুদ্গমন

করল না তাঁদের। মহা ঔদ্ধত্যে মুখ থেকে কেবল উচ্চারিত হল মদস্খলিত বজ্রস্বর, কি প্রয়োজন!

বিনম্রভাবে দাঁড়িয়েই বললেন মুনিগণ, 'যজ্ঞ থেকেই পর্জন্য, পর্জন্য থেকে অন্ন। ঋদ্ধি ও সিদ্ধির মূল যজ্ঞ। যজ্ঞ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়।'

'কার যজ্ঞ? কে যজ্ঞেশ্বর?'—ভ্রূকুটি-কুটিল নয়নে গর্জন করে উঠল দাম্ভিক বেণ। মহাদম্ভে আস্ফালন করে সে বলল, 'রাজাই যজ্ঞেশ্বর, মর্ত্যের প্রত্যক্ষ দেবতা: রাজ-দেহেই বর্তমান কাল্পনিক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ইন্দ্র-মিত্রাবরুণ। রাজার পূজাই দেবপূজা, যজ্ঞের হবি-সোমে রাজারই অধিকার।'

দুষ্টবুদ্ধি ভর করেছে বেণের রসনায়। বিনষ্ট সদ্ভাব সদ্বৃত্তি। ঋষিগণ বুঝলেন, মাতৃদোষে দুষ্ট সন্তান। যে কাম-মত্তা নারীর শোণিতে পুষ্ট এই পুত্রদেহ, এ দম্ভোক্তিও সেই দুর্মুখা জননীর প্রকৃতি-সম্ভব। প্রতিকার প্রয়োজন। দীপ্তকণ্ঠে বললেন, মহর্ষি ভৃগু, 'রাজা দ্বিতীয় ঈশ্বর, কিন্তু তাঁর ওপরে রয়েছেন পরমেশ্বর—তিনি সর্ব-নিয়ন্তা, বেদে-পুরাণে নানাছন্দে তাঁর মহিমা কীর্তিত।'

ক্রোধে কুঞ্চিত ভ্রূযুগ, মদঘূর্ণিত আরক্ত লোচন—বজ্রনির্ঘোষে বলল মদোদ্ধত বেণ, 'মিথ্যা কথা! মিথ্যা বেদ, মিথ্যা যজ্ঞক্রিয়া। এ সকল ধূর্ত, লোভী ব্রাহ্মণের রচনা। রাজাই সর্বদেব, রাজদণ্ডই সর্ব-নিয়ন্তা, নৃপতিই একমাত্র প্রভু, স্বামী। স্বৈরাচারিণী বারাঙ্গনার মত তোমাদের পর-পুরুষে আসক্তি। যাও, স্বীয় পতিরূপ নৃপতির নিমিত্ত ভোগ্য সামগ্রী আহরণ কর।'

বারবার যজ্ঞেশ্বরের নিন্দায় রুষ্ট হয়েই ছিলেন সাগ্নিক ঋষিবৃন্দ, অন্তরে গূঢ় ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। সেই ক্রোধ দীপ্ত শিখা বিস্তার করে বাইরে প্রজ্বলিত হল। তপ্ত তাম্রের মত আরক্ত হল আনন। তাঁরা অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করলেন, 'দগ্ধ হও, ধ্বংস হও!'

বাক্য সমাপ্ত হতে না হতেই ভীষণ পরিণাম সূচিত হল। ক্রুদ্ধ ঋষিদের বাক্যই অগ্নিগর্ভ বজ্র। সেই বাগবজ্রে নিমেষে গতজীবন হল বেদনিন্দক, দুর্ধর্ষ ভয়ানন্দন।

ক্ষণেকের তরে নিস্তব্ধ সভাকক্ষ। পর-মুহূর্তেই সেখানে উঠল ভয়ার্ত ক্রন্দনরোল। চিরকালের ভীরু, দুষ্ট অধর্মাচারী—তাদের নিকট অতি ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয়। কু-মন্ত্রী, কুতার্কিক পণ্ডিত, স্তাবক-দলের ত্রস্ত হাহাকার সভা অতিক্রম করে প্রবেশ করল রাজ-অন্তঃপুরে।

পাগলিনীর মত ছুটে এল বেণ-জননী ভয়া। রুক্ষ, ধূসর, আলুলায়িত

কেশ—বিশুষ্ক বদন—শুষ্ক পিঙ্গল নয়ন। শোকাতুর হিংস্রতা—অতি করুণ, কিন্তু অতিশয় ভীষণ! হাহাকার করে সে লুটিয়ে পড়ল পুত্রের প্রাণহীন দেহের ওপর, যেন বিধ্বস্ত বৃক্ষের ওপর সবেগে প্রবাহিত হল শোকের ঝড়। মুখে বুকভাঙ্গা গভীর, স্খলিত, আর্তনাদ, 'বেণ! আমার দুলাল!'—মর্মবিদারী সে পুত্রশোক।

জননীর এই শোকমূর্তি দেখে বেদনাতুর হলেন করুণাঘন ঋষিগণ। স্বভাব-শান্ত তাঁরা—চির দয়ার্দ্র হৃদয়। রুদ্র কারণেই তাঁদের রুদ্রতেজ প্রকাশিত হয়। বেণের উদ্ধত আচরণে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বাগবজ্র, শোকার্তা জননীর অরুন্তুদ ক্রন্দনে সে বজ্র বিগলিত হল। তাঁরা দেখলেন, সকল জননীই শোকে একাকার। মাতা ক্রূরা হন, পিশাচী হন, হন পাপীয়সী—সন্তান-শোকে বিশেষ নেই। পুত্রশোকাতুরা জননী যেন খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড জীব! দ্রবীভূত হৃদয়ে তাঁরা দেখলেন—প্রাণহীন নৃপতির দেহ, দেখলেন জননীর মর্মান্তিক শোক-করুণ মূর্তি, দেখলেন হীনসত্ত্ব প্রকৃতিপুঞ্জের অসহায় মুখ। তাঁদের মনে একে একে জেগে উঠল স্বায়ম্ভুব মনুবংশের ধর্মশীল, কীর্তিমান নৃপতিবর্গের চিত্র। মহানুভব 'বৎসব', বিনীত 'পুষ্পার্ণ', 'সর্বতেজা 'চক্ষু', 'নড্‌বলা-পতি মনু'—সর্বোপরি ধর্মপরায়ণ 'ক্ষুত' এমন বংশ নির্মূল হবে?—কিন্তু কি উপায়? তপোবল তাঁদের আছে, ইচ্ছা করলে তপঃশক্তি প্রভাবে এই মৃত বেণ-দেহেই তাঁরা প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। কিন্তু পাপে পূর্ণ দুঃশীল বেণ। এ পাপদেহ পুনর্জীবিত করলে পাপেরই পুনরাবির্ভাব ঘটবে। যদি কেউ শোষণ করে নিতে পারত বেণ-দেহের দুষ্কৃতি!

চকিতে উপায় উদ্ভাবিত হল। কলেবরপায়ী সুনীথা—একমাত্র সেই-ই পুত্রের দুঃশীলতা পান করতে পারে। কিন্তু সে কি সম্মত হবে?—তাকে সম্মত করাতেই হবে।

গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন ঋষিবৃদ্ধ ভৃগু, 'সম্রাজ্ঞি সুনীথা!'

মূর্ছাহতা ভয়ার কর্ণে দূরাগত বজ্রধ্বনির মত ধ্বনিত হল সেই রব। সে যেন চলে গিয়েছিল এমন এক লোকে, যেখানে কেবল মূর্ছা আর নিদ্রা। নিদারুণ শোকের আশ্রয় সে লোক। ঋষির আহ্বানে সুপ্তোত্থিতের মত জেগে উঠল ভয়া। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মোহময় ঘোর। বিমূঢ় দৃষ্টি, বিধূত ওষ্ঠাধর। সভয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। শুষ্ক চোখে গভীর বেদনার ছায়া।

'বংশরক্ষা করতে হবে। রাজ্ঞীকেই অগ্রণী হতে হবে এ কাজে।'—বললেন ভৃগু।

নিরাশায় আশার আলো! কোথায় ভয়ার বক্রকুটিল প্রকৃতি? কিসের আঘাতে যেন বক্র হয়েছে ঋজু! সোৎকণ্ঠ মাতৃ-হৃদয়, সোৎসুক প্রতীক্ষা।

ঋষি বললেন, 'তামসী বিদ্যায় পারদর্শিনী তুমি, কলেবর-পানে অদ্বিতীয়া। তোমাকে পান করতে হবে পুত্রের কলেবর।'

আতঙ্কে শিউরে উঠল ভয়া। ভয়ঙ্করী সে, ভীষণা। কিন্তু তার চেয়েও ভয়াবহ এই নির্দেশ! মাতা হয়ে পুত্রের কলেবর পান? পিশাচী হোক, রাক্ষসী হোক—কোনও জননী এ কাজ করে নি কোনদিন। জননী কি সন্তানের দেহভুক্ হতে পারে? কর্কশস্বরে প্রতিবাদ করে ভয়া, 'এ অসম্ভব! মাতা সন্তানের দেহ পান করতে পারে না।'

'মাতাই চিরকাল সন্তানের দেহ পান করে'—কঠিন কণ্ঠে বলেন মহর্ষি ভৃগু, তাঁর নয়নে রোষ-দীপ্তি: 'কুমাতার কুশিক্ষাই শোষণ করে সন্তানের সদ্‌গুণ, সদ্‌বৃত্তি। তার দৃষ্টান্ত তুমি।'

'আমি!'—শুষ্ককণ্ঠে বলে ভয়া। দেহ যেন হিম হয়ে আসছে। বজ্রমন্দ্রে বলেন ঋষি, 'হ্যাঁ তুমি! ধার্মিক স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে এ পাপ ছড়িয়ে দিয়েছে কে?—তুমি! তুমিই পান করেছ ধর্মপুত্রের ধর্ম, ক্ষান্তি, উদারতা।'

প্রতিবাদ করতে পারে না, দুর্মুখা। একে শোকে বিদীর্ণ হৃদয়, তার ওপর এই কঠিন অভিযোগ। উদ্দাম শোক ও দুর্জয় ক্রোধে রুদ্ধ কণ্ঠ। কেবল কম্পিত হয় তার নয়ন, মুহুর্মুহু কম্পিত হয় ওষ্ঠ। বজ্র স্বরেই বলেন ভৃগু, 'মাতা একদিকে যেমন সন্তানের ভক্ষক, তেমনি তার রক্ষক। মাতাই বংশে নবজীবন সঞ্চার করতে পারে। এতদিন তুমি পান করেছ সন্তানের সদ্‌গুণ, এবার তার দুর্গুণ শোষণ করে বংশ রক্ষা কর।'

দারুণ ভয়ে কাঁপতে থাকে ভয়ার দেহ। নির্বাপিত যেন আশায় ক্ষীণ দীপ—সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকাময় অন্ধকার! রসপায়ী কালের কন্যা সে, কলেবরভুক্। কিন্তু চিরকাল তামসী বিদ্যাবলে সে পান করে এসেছে কলেবরের সদ্‌গুণ। জীবদেহের দয়া, ক্ষমা, করুণা ধর্মবুদ্ধিই তার পানীয়—দুঃশীলতা নয়। একে সন্তানের দেহ পান তদুপরি এই দুষ্পাচ্য পানীয়। কঠিন হয়ে ওঠে ভয়া, মুখে দেখা দেয় সেই পূর্ব কুটিলতা। কটা চোখে বাঘিনীর হিংস্রতা, কুটিল কেশে কোটি কাল নাগিনীর ফণা। ক্রোধে দুলতে থাকে তার দেহ।

বজ্রমন্দ্রে ধ্বনিত হয় সুগম্ভীর ঋষিকণ্ঠ, 'ঋষি-রোষ পুনরায় উদ্দীপ্ত করো

না সম্রাজ্ঞি! পাপমতি তুমি, পাপকে পান করে বংশ রক্ষা কর। নইলে বাগ্‌বজ্রে তোমাকেও বরণ করতে হবে পুত্রের মত শোচনীয় পরিণাম।

সম্মুখে মৃত্যু, পশ্চাতে মৃত্যু! কোন কথা বলতে পারে না ভয়া! একে শোকে বিদীর্ণ বক্ষ, তার ওপর এই কঠিন বাগ্‌বজ্রের ভীতি! বিমূঢ়া বিষধর ভুজঙ্গিনী। সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু, তবু কোথা থেকে যেন ক্ষত বক্ষে ক্ষরিত হচ্ছে মধু-স্নেহ—কে যেন কঠিন অমৃতপদ স্থাপন করেছে তার ফণায়!

কম্পিত দেহে নীরবে উঠে দাঁড়াল ভয়া। মন্ত্রমুগ্ধার মত তার পরাধীনতা। স্তম্ভিত বিদ্রোহিনীর শক্তি। উঠে দাঁড়াল—কিন্তু শোকে টলমল করে অঙ্গ—যেন কতকালের একখানি বিশুষ্ক, শোকার্তা জননীমূর্তি। তারপর মন্ত্রচালিতের মত দুই হাঁটু ভূমিস্পর্শ করে বসল সে, জোড় পা ঠেলে দিল পশ্চাৎভাগে। বিশীর্ণ দেহ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। শুষ্ক দুইখানি হাত একত্র করে প্রাঞ্জলি পানের মুদ্রা ধারণ করে ওষ্ঠাধরের নিকট নিয়ে এল সেই অঞ্জলি। বিকট মুখ, বীভৎস দৃষ্টি! সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে স্খলিতকণ্ঠে কি যেন সে উচ্চারণ করল। তারপর অগস্ত্য যেমন করে সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, তেমনি করে উগ্রগ্রাসে শোষণ করতে লাগল প্রিয়তম পুত্রের কলেবর। এবারকার পানীয় দেহের সদগুণাবলী নয়, অতি দুষ্পাচ্য পৈশুন, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, নির্মমতা।

দেখতে দেখতে উদর স্ফীত হল, বক্ষে সঘন শ্বাস। চক্ষুতারকা প্রথমে বিস্ফারিত হল, তারপর নিশ্চল। নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল, দেহ পাষাণের মত শক্ত, হিম-শীতল তার স্পর্শ। সন্তানের পাপ পান করে প্রাণহীন দেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল কালকন্যা, বেণ-জননী ভয়া। এতক্ষণ তার চোখে চিকচিক করছিল এককণা করুণা, এখন কুটিল চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল শুষ্ক বক্ষ-নিংড়ানো দু ফোঁটা অশ্রু। কালকন্যা ভয়ার বুকে কোথায় গোপন ছিল এই মুক্তার মত নয়নজল?

তখন মৃত বেণের দক্ষিণ-বাহু মন্থন করছিলেন তপোঋদ্ধ ঋষিবৃন্দ। তার মলধৌত স্পন্দিত বাহু থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন দিব্যলক্ষণযুক্ত ধর্মপরায়ণ প্রজাবৎসল 'পৃথু'। স্বায়ম্ভুব মনুর গোত্রে অমিতপ্রভ নৃপতি এই পৃথু—তাঁর নামেই সাগর-মেখলা বসুন্ধরার নাম হয়েছে 'পৃথিবী'। তিনি কালকন্যা ভয়ার পৌত্র। *

* (১) শ্রীমদ্‌ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ, ১৩-১৪ অধ্যায়।
(২) বামনপুরাণ—৪৭ অধ্যায়।

# ॥ পিঙ্গলা ॥

বিদেহ নগরের বিশ্রুত পণ্যাঙ্গনা 'পিঙ্গলা' রূপোপজীবিনী—রূপের বড়াই সে করতে পারে। মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত প্রদীপ্ত তার দেহকান্তি। সু-সম অবয়ব যেন কামদেবের শর-সজ্জা। কৃষ্ণ মেঘের নিকষ-কৃষ্ণ সাগরজলের মত তার কেশপাশ, সাগরজলের মতই উর্মিল। আকর্ণবিথারী নয়ন—তরঙ্গের মত চঞ্চল, অপাঙ্গে বড়বা কটাক্ষ। তার তাম্বূল-রাগরঞ্জিত অধরে হিঙ্গুলের তরলতা তাজা রক্তকে লজ্জা দেয়, উত্তাল করে তোলে হৃদয়রক্ত। তার নয়ন, তার কটাক্ষ, তার অধর, তার হাসি যে কোন মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়। বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত পাগল মানুষ রূপোপজীবিনী পিঙ্গলার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে।

পিঙ্গলার রূপমুগ্ধ নাগরের সংখ্যাও অসংখ্য। বিদেহ নগরের যাবতীয় পুরুষ তার পদানত। তার খ্যাতি অঙ্গ, পাঞ্চাল রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। কে তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে, কে হয় নি? কামাগ্নির অরণি তার দেহ, মুনির মানস-বিভ্রম তার হাব-ভাব বিলাস। পুরুষমাত্রই তার প্রণয়ী, পুরুষ মাত্রই তার স্তাবক।

পিঙ্গলার রূপোন্মত্ত স্তাবকদের মুখে তার রূপের যে স্তুতি ছন্দিত হয়, ভক্তের দেব-স্তুতিও তার কাছে পরাভব মানে। তারা বলে, 'পিঙ্গলা ভানুমতী সূর্যপ্রিয়া। স্বর্গসম্ভবা স্বর্গের দেবতাকে পাগল করে তুলেছিল। স্বরপ্সরীর বৃত্তি নাশ হয় দেখে, অপ্সরীদের ষড়যন্ত্রে, বিধাতার বাক্যে স্বর্গভ্রংশ হয়েছে সে। উর্বশী-রম্ভার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, তাই এসে পতিত হয়েছে মর্ত্যের বিদেহনগরে।'

হয়তো মিথ্যা স্তাবকদের স্তুতিবাদ, হয়তো সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। ভালবাসার ধনকে মানুষ বলে 'আকাশের চাঁদ', 'সাত রাজার ধন মানিক'। স্তুতি সামান্য সত্যেরই অতিরঞ্জিত অতিশয়োক্তি। তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাহলে যে মিথ্যা হয় মানুষের কল্পনা, মিথ্যা হয় কবি-প্রণীত প্রেমের প্রশস্তি।

সত্য হোক, মিথ্যা হোক—স্তুতি শুনে গর্বে পিঙ্গলার বুক ভরে ওঠে। অপরিমিত তার আশা, দুর্দমনীয় লোভ, উৎকট কামনা। কামোন্মত্ত মানুষ পাগলের মত তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, শিকারীর মত পিঙ্গলা তাদের বিবশতা দেখে উল্লাসের হাসি হাসে। মানুষকে সে মাতাল করে ছাড়ে। কামধেনুর স্বতঃক্ষরিত

ক্ষীরধারার মত ঐশ্বর্য বৃষ্টি হয় পিঙ্গলার চরণে—তবু তৃপ্তি হয় না পিঙ্গলার। অধিক শুল্ক লাভের আশায় সে আরও কৌশল বিস্তার করে, মোহিনী—ভুবন-মোহন রূপ ধরে মায়ার ফাঁদ পাতে। স্তম্ভনে, মোহনে, উন্মাদনে ও আকর্ষণে সে অদ্বিতীয়া।

লোকে বলে, পিঙ্গলা যাদু জানে। অভিচার বিদ্যা নাকি তার নখদর্পণে। বাইরে রূপসী, অন্তরে কুটিলা। রূপে মোহমুগ্ধ করে আথর্বন ঋষিদের মন্ত্র সে আত্মসাৎ করেছে। মোহিনী না হলে এমন মোহকর প্রভাব কি কেউ বিস্তার করতে পারে?

বিদেহ নগরে দূর-দূরান্ত বিস্তৃত তার অধিকার। নগরের দক্ষিণ দিক জুড়ে তার এলাকা। বামদিকের অধিকার সে ছেড়ে দিয়েছে ভগ্নী 'ইড়া'কে। চন্দ্রপ্রভারূপিণী ইড়া, সূর্যপ্রভাবস্বরূপিণী পিঙ্গলার যোগ্যা সহোদরা। নগরের দুইদিকে দুই বিভ্রমবতী বিলাসবতী, মধ্যে পুরন্ধ্রী নারীর অন্তঃপুর। পুরন্ধ্রীপুরে ভোগ সংযমের সহিত নিয়মিত, সেখানে বাসনা নয় উচ্ছৃঙ্খল। সে পুরীর পুরে পুরে প্রশান্ত আনন্দ, শান্তির পুণ্য জ্যোতি। কিন্তু ইড়া-পিঙ্গলার মোহময় আকর্ষণে পুরন্ধ্রীপুরীর শান্তিভঙ্গ হয়, পুরুষ অস্থির হয়ে ওঠে। সাধ্বীর সাধ্য কি—স্বৈরিণীর প্রভাবকে প্রতিহত করে? অসংযত ভোগেই মানুষের আসক্তি, পরম আনন্দ বন্ধনহীন প্রমোদে। বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠসম্ভব অধর্মের প্রভাব মানুষের প্রতি রক্তকণায়, শয়তানিতেই সকলের উল্লাস। তাই বিদেহ নগরে রাজরাজেশ্বরীর মত অক্ষুণ্ণ প্রভাব পণ্যাঙ্গনা পিঙ্গলার।

পুংশ্চলী পিঙ্গলার ভোগায়তনও বহুবিস্তৃত। একটি নয়, দুটি নয়—পাঁচ পাঁচটি তার প্রমোদশালা। প্রত্যেকটি ভোগবতী-সদৃশ সুন্দর। এ ভোগবতীর কাছে কি ইন্দ্রের অমরাবতী? একটির নাম 'সৌরভাগার'। সুগন্ধি কুসুমের নন্দন-কানন—বহুবর্ণ পুষ্পের বিচিত্র সৌরভ। কস্তুরী, কুসুম্ভনির্যাসের সুগন্ধে আমোদিত বিলাস-ভবন। ভ্রামর-বৃত্ত পুরুষ বিহ্বল হয়ে ছুটে আসে এখানে। গন্ধ-প্রসাদ বিতরণ করে ক্রুরা পিঙ্গলা তাদের পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখে।

দ্বিতীয়টি, 'বারুণী ভবন'। সেখানে সঞ্চিত দেশ-বিদেশের শুক্র-সঞ্জীবনী সুরা। ভাণ্ডে ভাণ্ডে গৌড়ী, মাধ্বী, পৈষ্টি, দ্রাক্ষারস। মধুর লোভে মাতাল মধুমক্ষিকার মত, মধু-লোভী পুরুষ প্রবেশ করে এখানে। মদস্খলিত বচনের হুঙ্কার মদবিহ্বল কণ্ঠের প্রণয়-ভাষণে পূর্ণ বারুণী-ভবন—চুম্বকের মত তার আকর্ষণ।

পিঙ্গলার তৃতীয় পুরী ঐশ্বর্যের বিলাস-পুরী। অমূল্য মণিমাণিক্য-বৈদুর্য-

বিক্রমখচিত ধাম, নাম তার 'মণিপুর'! কেউ কেউ একে বলে 'অগ্নিভবন'। প্রজ্বলিত বাসনার বহ্নিজ্বালা এই ভবনে পুরুষকে কামজর্জর করে তোলে। সে যে কি সুতীব্র উন্মাদনা, একমাত্র ভোগী ব্যতীত কেউ ধারণাও করতে পারে না। রূপ ও ঐশ্বর্যের প্রমত্ত লীলাস্থল 'মণিপুর'—কামাগ্নি-তরঙ্গে চির-তরঙ্গায়িত।

দ্বাদশ পদ্মের ধ্বজাসমন্বিত চতুর্থ পুরী—চির-সমীরিত, চিরঝঙ্কার-মুখর। এর নাম 'মধ্যমা'। নাতিশীতোষ্ণ বায়ুমণ্ডল, কক্ষে কক্ষে বাসন্ত মলয়ের মৃদু সঞ্চরণ। কোথা থেকে মধ্য লয়ে ঝঙ্কৃত হয় সুমধুর অনাহত এক ধ্বনি। পিঙ্গলার অতি প্রিয় এই প্রমোদ-ভবন, বিলাস-ভবনের মধ্যমণি। অনেক মুনি-ঋষিকে পিঙ্গলা বিভোর করে রাখে এই পুরীতে। তপস্বীর তপোবিঘ্ন সাধনে অমোঘ এই সঙ্কেত স্থান। কতদিন, কত রাতে অঙ্গ ও পাঞ্চালরাজের রথ এই 'মধ্যমা'র ভবন-দ্বারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে, প্রমোদকক্ষ থেকে ভেসে আসে মত্তালির মত অস্ফুট গদ গদ গুঞ্জন! কুহকিনী পিঙ্গলার কুহকে, কুহুযামিনী মধুর হয়ে ওঠে।

নগরের দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় আর এক প্রমোদভবন—নাম তার 'শূন্যসদ্ম'। আকাশবাণী মুখর এই ভোগশালা শূন্যে নির্মিত। শূন্য থেকে আশ্চর্য সোপান নেমে এসেছে মাটিতে। মাটির কলকোলাহল এখানে শান্ত। এখানে কিন্নর-গন্ধর্বের মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হয়, রহস্যময় পদ্মগন্ধে কক্ষ মাতোয়ারা থাকে। পিঙ্গলা এই কক্ষে রতিক্লান্ত নাগরদের ঘুমে বিভোর করে রাখে। শ্রান্ত নাগর, মুগ্ধ নাগর, স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধুর তানে ধীরে নয়ন নিমীলিত করে। পিঙ্গলারও বিশ্রামাগার এই পুরী। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, ওপরের নিঃসীম আকাশ।

রূপের গৌরবে, ঐশ্বর্যের প্রমত্ততায় মদবিহ্বলা পিঙ্গলা। শূন্যসদ্মের বিশ্রাম-কক্ষে এলেই কল্পনার দুয়ার খুলে যায় তার। কত অদ্ভুত চিন্তা, কত অভূতপূর্ব ভাব। কামমুগ্ধ স্তাবকের স্তুতি কল্পনায় তার কর্ণে সুধাবর্ষণ করতে থাকে, মন চলে যায় সুদূর কল্পলোকে।

আজও এই অলস মধ্যাহ্নে অনেক কথা ভাবছে পিঙ্গলা। ভাবছে—হয়তো মিথ্যা নয় স্তাবকের স্তুতি, হয়তো সত্যিই সে স্বর্যসনাথা ভানুমতী, স্বর্গভ্রষ্ট স্বদ্যুতি। আনমনে স্বচ্ছ আরশির সম্মুখে দাঁড়ায় সে, দর্পণে দেখে তার প্রতিবিম্ব। আশ্চর্য রূপ। সুঠাম অবয়ব, যৌবনভারে ঢল ঢল অঙ্গ, চারু আননে মদিরস্রাবী নয়ন। নিজের মোহিনী কটাক্ষে নিজেই মোহিত হয় পিঙ্গলা, নিজের অঙ্গেই খেলে যায় বিদ্যুৎ-শিহরণ! নিজের রূপে কে মুগ্ধ নয়? বিশেষত রূপোপজীবিনী।

নির্জন মধ্যাহ্ন। দূর থেকে ভেসে আসছে আকাশবাণীতে মৃদু-সঙ্গীত। অধিক

রাত্রি জাগরণের শ্রান্তি পিঙ্গলার দেহে, ক্লান্তি পিঙ্গলার নয়নে। ধীরে পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হয় সে, ধীরে উঠে বসে দুগ্ধসিত শয্যায়। অবেণীবদ্ধ-মুক্ত কেশের রাশি, হাত দিয়ে ঈষৎ তুলে, মাথাটা এলিয়ে দেয় উপাধানে। শুভ্র উপাধানটিকে ঘিরে ছড়ানো কৃষ্ণ কেশরাজি যেন চন্দ্র-মণ্ডলগ্রাসী কালো মেঘ। নিদ্রাকাতর নয়ন আবেশে মুদ্রিত হয়ে আসে, রূপসীর মনে নিজ রূপের সোনালী স্বপ্ন! স্তাবকের খণ্ড খণ্ড স্তুতির ছিন্নাংশ জুড়ে জুড়ে যেন একটি স্বপ্নমালার সৃষ্টি হয়। পিঙ্গলা স্বপ্ন দেখে :

সৃষ্টির কোন অনাদিযুগে যেন জন্মেছিল সে। বিধাতার অতুল সৃষ্টি—তিল তিল রূপের সমুচ্চয়ে এক তিলোত্তমা। প্রদীপ্ত ভানুর মত অঙ্গপ্রভা, সূর্যের মতই তেজ। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ ভেবে কমলযোনি ব্রহ্মা তাকে করেছিলেন সূর্য-সনাথা।

সুখের জীবনই গড়ে উঠেছিল তার। দেবচক্ষু দেবজ্যোতি তার পতি। তিনি ত্রিবিক্রম। ত্রিলোকের হুতহবিতে তার অধিকার। পতিসোহাগিনী পিঙ্গলা—সূর্যপ্রিয়া সে, গরবিনী। দেবতার মত সম্মান। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তার হৃদয়, সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার পাতিব্রত্য। সে সূর্য স্বরূপিণী।

কিন্তু সুখী কি হয়েছিল পিঙ্গলা? তার হৃদয়ে সুপ্ত ছিল অপরিমিত আশা, প্রচ্ছন্ন ছিল পুষ্পকেশরে কীটের মত কামনা। দুর্বার লালসা মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তুলত তাকে। বিহ্বলার মত দর্পণে দেখত তার নিজের রূপ। এ রূপ কি দিকে দিকে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করতে পারে না?—কিন্তু পরমুহূর্তেই, প্রাণপণে আত্ম-দমন করত সে। ছি ছি, এ কি কুটিল পিপাসা! অন্তরের নিভৃততম প্রকোষ্ঠের কদর্য আকুতি অন্তঃকর্ণে শুনে সে নিজেই শিউরে উঠত, ভাবত, না—না—এ পাপ! বিধাতার নিয়মের রাজত্বে সৌভাগ্যবতী সে, সে সৌভাগ্যবতী সূর্যপ্রিয়া। স্বামী তার নিয়মের নিয়ামক ত্রিবিক্রম।

কিন্তু হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কামনাই কাল হল তার, রূপ হল কামনার ইন্ধন। অধর্ম-পুত্র কাম। ভুবনসুন্দর তার রূপ, মুখে মোহন হাসি, চোখে মোহের মদিরা। একদিন সে দেখা দিল পিঙ্গলার বহির্দ্বারে। বিহ্বল হল পিঙ্গলা। প্রথমে লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ লক্ষ্য করল—তৃষাতুর দৃষ্টি মেলে 'কাম' দেখছে তাকে, খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে যেন অঙ্গের প্রতিটি রেখা। লালসার দৃষ্টি লহমায় বুঝতে পারে নারী। মুহূর্তে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল পিঙ্গলা। সর্বাঙ্গে শিহরণ, শিরায় শিরায় অদ্ভুত কম্পন। দ্রুত পালিয়ে এল পিঙ্গলা, পালিয়ে যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ল সে! বুকে তখনও ঘনশ্বাস, দেহময় অদ্ভুত উত্তেজনা!

শরমে মরে গেল পিঙ্গলা। পতিমতী নারী সে, ধর্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত তার পাতিব্রত্য। সে কি ব্রতভ্রষ্ট হতে পারে? সতীত্বের দর্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে পিঙ্গলা—সে ব্রতভ্রষ্টা হবে না। 'পতিৰ্হি দেবতা নার্য্যাঃ'—পতিই সতীর দেবতা, পতিই ধ্যান, পতিই স্বর্গ।

—পিঙ্গলার বহির্দ্বার বন্ধ হয়ে যায়, অন্তরে সুকঠিন তপশ্চর্যা।

কিন্তু সুদুষ্কর মন। কোন্ ফাঁকে কন্দর্প কামের মুখখানি মানসপটে ভেসে ওঠে। যেন উগ্র দৃষ্টিতে পিঙ্গলার রূপসুধা পান করছে। এত রূপ তার? এত শক্তি পিঙ্গলার? নিজের রূপ সম্পর্কে পিঙ্গলা সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের শক্তির কথা চিন্তা করে আত্মপ্রসাদ জন্মে মনে। ব্রত ভেঙ্গে যায়, নরম হয়ে আসে মন। তার রূপ দেখে যদি তৃপ্ত হয় কেউ, ক্ষতি কি? দৃষ্টিভোগে দেহ কি অশুচি হয়?

এমনি করেই উন্মুক্ত হয় কামনার অর্গল। মনের অতলে কোথায় সুপ্ত থাকে কামনা, মানুষ জানতেও পারে না। ধর্মে, কর্মে প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি। সহসা একদিন সেই কামনা সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে ওঠে। শিউরে ওঠে মানুষ! চলে প্রাণপণ আত্মসংযম। ক্রমে দ্বন্দ্ব, ক্রমে শৈথিল্য—শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ। প্রবল জোয়ারে তখন ভেসে যায় বিবেক, ধর্মবুদ্ধি—তরঙ্গে উত্তাল দেহ, অন্তর।

এই অবস্থাই হল পিঙ্গলার। সতী নারী হল কামের অবৈধ কামিনী। ভোগেচ্ছা স্বীয় যুক্তিতে আত্ম সমর্থন করল—পৃথিবীতে কে কামনার দাস নয়? কামনা নব রোমাঞ্চ, কামনা সৃষ্টির পুলক। 'সোঽকাময়ত'—তাই জেগেছে সৃষ্টির সুর। ভোগতন্ময় মিথুনসমাজ, সম্ভোগী সহস্রাংশু স্বয়। সহস্রমুখে রসসম্ভোগ করেন তিনি। উদ্দাম, উদ্ধতা পিঙ্গলা।

কিন্তু পিঙ্গলা তখনও বোঝে নি, 'ন জাতু কামঃ কামান্ উপভোগেন শাম্যতি' —ভোগে নিবৃত্তি নেই কামের। দুর্দমনীয় কামনা সর্বগ্রাসী বহ্নি। বহ্নির মত তার অনন্ত ক্ষুধা। প্রমুক্ত, প্রমত্ত দিগ্‌গজ—নির্বাধ তার গতি। অপরিমিত আশার শেষ নেই, অত্যুগ্র লোভের নেই শান্তি।

অপরিমেয় ভোগেচ্ছা তাকে টেনে আনল স্বৈরাচারের পথে। একে তৃপ্তি নেই, বহুতে আসক্তি। কেন সে হবে না বহুবল্লভা? সৃষ্টি ভোগময়। ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কেন সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে বেঁধে রাখবে সে? রূপের দীপ্তি সে ছড়িয়ে দেবে বহুর মধ্যে, স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে সে বিহার করবে বিশ্বলোকে। কি আনন্দ মুক্তির! কি আনন্দ ওই মুক্ত নীলাকাশে! সৃষ্টির পাত্র মধুময়—পুষ্পে মধু, ধূলিকণায় মধু!

মধুর অম্বর, মধুর সাগর! চল, পাত্র থেকে পাত্রান্তরে, মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন কর, আকণ্ঠ পান কর বিশ্বমধু।

পাগল হয়ে পিঙ্গলা রূপের বাগুড়া বিস্তার করল দেবসঙ্ঘে। প্রমত্তা প্রমদা। দেহে তার রূপের আগুন, নয়নে বিষের বিশিখ। স্থির যৌবন, রূপবান দেবতা: ইন্দ্র, সোম, নাসত্য ও দস্র। ভোগ যদি করতে হয়, ভোগ কর সুন্দরকে. বিজয়ের তপ্ত উল্লাস অজেয়কে জয় করেই সার্থক হয়। অত্যাকাঙ্ক্ষায় অধীরা পিঙ্গলা।

ক্রুদ্ধ হলেন বিধাতা পুরুষ। বজ্রের মত নেমে এল কঠিন অভিশাপ: 'দুষ্টা তুমি, মূর্তিমতী ব্যভিচার। অপরিমিত তোমার আশা, অদম্য ভোগলালসা। স্বর্গ থেকে পতন হক তোমার। বহু মানুষেরই ভোগ্যা হও তুমি—স্বর্গে নয়, মর্ত্যে।'

লালসায় অন্ধ পিঙ্গলা, ভাবতে পারে নি, কি হতে পাবে উগ্র লালসার পরিণাম। বিধাতার বাক্যে চোখে যেন অন্ধকার দেখল সে। সূর্যপ্রিয়া সে, স্বর্গের বন্দনীযা, তাকে আশ্রয় করতে হবে মর্ত্যের ভোগদেহ? আর্তনাদ করে উঠল পিঙ্গলা, লুটিয়ে পড়ল বিধাতার চরণমূলে, অতি করুণকণ্ঠে মিনতি করল, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। দারুণ অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।

কামিনীর করুণ ক্রন্দনে কোমল হলেন করুণাঘন কমলযোনি। কিন্তু কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত অপ্রতিহার্য বিধাতার বাক্য। যথাসম্ভব কোমল স্বরে বললেন তিনি, 'স্বর্গভ্রষ্ট তোমাকে হতেই হবে। অপরিমিত আশা, অতি লালসার ফল ভোগ করতেই হবে তোমাকে!'

'এ অভিশাপ থেকে কি কোনদিন মুক্ত হব না আমি?'—পিঙ্গলার চোখে অশ্রু, কাতর কণ্ঠস্বর।

করুণাময় বিধাতার নয়ন ছলছল করে। দণ্ডের আঘাত দণ্ডদাতার হৃদয়েও গভীর হয়ে বাজে। পাপী কি শাপমুক্ত হবে না? কামনার অনলে পূর্ণাহুতি দিয়ে কামিনী কি শান্তি লাভ করবে না? ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয় বিধাতার বদন মণ্ডল, অভয়বাণী উচ্চারিত হয় তাঁর কণ্ঠে: 'অতি আশা দুঃখের মূল। অত্যাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হলে সুখ সুদূরপরাহত। স্বর্গের দ্বার নিশ্চয়ই খোলা থাকবে তোমার জন্য। যদি কোনদিন আশার নিবৃত্তি হয়, যদি কোনদিন সুখাবহ নির্বেদ লাভ কর তুমি, সেই দিন আবার স্বর্গে ফিরতে পারবে। কামনার মোক্ষধাম স্বর্গে সেদিন আবার প্রতিষ্ঠিত হবে সূর্যপ্রিয়ার আসন।'

অন্তর্হিত হলেন বিধাতা পুরুষ। দেখতে দেখতে জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক থেকে

পতন হল পিঙ্গলার। তার আশ্রয় হল বিদেহ নগরের তামসলোক। নগরের দক্ষিণ দিকে অধিকার বিস্তার করে পিঙ্গলা হল পুংশ্চলী। তার বৃত্তি সাঙ্কেতবৃত্তি। স্বর্গের সূর্যপ্রিয়া হল মর্ত্যের লোভাতুর, কামার্তা পথিকবধূ। লোভ, লালসা ও আশার শেষ নেই তার।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। এ যেন এক মোহকর নেশার ঘোর। পিঙ্গলা ভাবে, এ স্বপ্ন কি সত্য? পরক্ষণেই ভুল বুঝতে পারে পিঙ্গলা—এ স্মৃতির মোহিনী মায়া। স্বপ্ন মিথ্যাকেও এমন করে সাজায়, যেন মনে হয়, সত্য—অতি সত্য। মিথ্যাই হোক স্বপ্ন, সে আশা ত্যাগ করবে না। কি তৃপ্তি জয়ের গৌরবে! কি আনন্দ সম্ভোগ-সুখে! মিথ্যার সৃষ্টি কল্পনার স্বর্গ। পিঙ্গলা সে স্বর্গ কামনা করে না। মর্ত্যের ভোগবতীর চেয়ে বড় অমরাবতী আছে কি?

নিদ্রার জড়তা ভেঙে উঠে বসে পিঙ্গলা। ঘুরে ফিরে স্বপ্নের কথাই মনে হয়। বহুভোগ্যা সে। ক্ষতি কি? অমিতাচারী কে নয়? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—কে একনিষ্ঠ? সকাম ইন্দ্র, সকাম সোম! ভোগের আকাঙ্ক্ষা কি কেবল পিঙ্গলার? কামনায় আকণ্ঠ মগ্ন ত্রিভুবন। দেহের পুংশ্চলীবৃত্তি নয়নগোচর—কিন্তু মনের স্বৈরাচার? লোকে দেখে না, কিন্তু মানসিক স্বেচ্ছাচারের কি সীমা আছে? কে জানে, তোমার মনে মনে জাগছে কি কুৎসিত কামনার তরঙ্গ!

উত্তেজিত হয়ে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। শয়নাগারের গবাক্ষপথে দেখা যাচ্ছে অপরাহ্ণের রঞ্জিত আকাশ, যেন সহস্র কামনার রঙিন ছবি। একটা বাজপাখি উঠছে ঊর্ধ্বে, শূন্যে। সে উঠছে। আশার শেষ নেই, শেষ নেই। আশার শেষ তো সবশেষের নিঃসীম নিস্তব্ধতা। জীবনে কে চায় সেই নিস্তব্ধতা? কলরব করতে করতে তার দ্বারে আসে বিশ্বের শ্রীমান, রূপবান, শক্তিমান, গুণবান। ওই দেবদত্ত, ওই ধনঞ্জয়, ওই রুকরকেতু—পিঙ্গলার কটাক্ষের দাস। এত গৌরব কার? কোন্ বিজয়িনী নারী অঙ্গাধিপতি, পাঞ্চালাধিপতিকে আকর্ষণ করতে পেরেছে?—পেরেছে সে—বিশ্বের মনোমোহিনী পিঙ্গলা। সগর্ব পদক্ষেপে সে গবাক্ষের দিকে অগ্রসর হয়।

বেলা শেষ হয়ে আসছে, কর্মক্লান্ত বিশ্ব। বিশ্বের মন বিশ্রামমুখী। শুধু মন নয়, দেহও। পূর্বদিগন্তের দিগ্‌বধূ মেঘকাজল মেঘাম্বরী পরিধান করেছে। পথিকবধূর অঙ্গসজ্জা সমাপনের এই-সময়। চঞ্চলা হয় পিঙ্গলা। তাকেও সজ্জিত হতে হবে। সঙ্কেতোপজীবিনীর সঙ্কেত কেবল অঙ্গলাবণ্য নয়, অঙ্গের অঙ্গসজ্জাও। কৃত্রিম প্রসাধনে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে স্বভাবসৌন্দর্য।

স্বপ্নের দাগ মোছে নি মন থেকে। আজ সে সজ্জিত হবে, সজ্জিত হবে স্বরপ্সরী উর্বশীর মত। সে আকর্ষণ করবে সবচেয়ে বেশি শুল্কপ্রদ নাগরকে। ঐশ্বর্য তার আছে, রাজরাজেশ্বরীর মত ঐশ্বর্য। তবু আরও চাই। বিধাতা বলবেন, 'এ লোভ, অর্থ অনর্থের মূল।' হোক লোভ—অর্থ অনর্থের মূল নয়। পিঙ্গলা বুঝেছে, অর্থেই প্রতিপত্তি, অর্থেই প্রতিষ্ঠা : অর্থই রূপ, অর্থই গুণ, অর্থই আকর্ষণ। প্রশংসা, খ্যাতি—সে তো তারই, যার আছে অর্থ। অধিক কি—কাম্য চতুবর্গের এক বর্গ অর্থ। অর্থের অর্থী কে নয়?

মনোমোহিনীর বেশে সজ্জিত হল পিঙ্গলা। নয়নে নীলাঞ্জন—ভ্রূদ্বয়ে সূক্ষ্ম কাজলরেখা। বদনে লোধ্ররেণু, কপালে সসিন্দূর গোরোচনা ফোঁটা, কপোলে বিচিত্র পত্রলেখা। কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, কণ্ঠে রত্নহার, হস্তে স্বর্ণবলয়। সে পরিধান করল বাসন্তীবর্ণের চীনাংশুক, কটিতে মোহন মেখলা। নয়ন-বিভ্রম সে অঙ্গসজ্জা। মঞ্জীরে মৃদু ঝঙ্কার তুলে রতিদর্পহারিণী ধীরে এসে দাঁড়াল সৌরভাগারের বহির্দ্বারে।

আজ পিঙ্গলার হৃদয়-সাগরে লোভের প্রমত্ত হিল্লোলে আশার তুঙ্গ তরঙ্গ। আজ সে আকর্ষণ করবে সর্বাপেক্ষা শুল্কপ্রদ নাগরকে। আজ রাজরাজেশ্বরীর হৃদয়ে রাজরাজেশ্বর-সম্ভোগের উগ্র কামনা।

সূর্য অস্ত গেছে ; কিন্তু সন্ধ্যা হয় নি এখনো। গোধূলির অপস্রিয়মান আলোকে রঙিন ধরণী যেন রূপোপজীবিনী পিঙ্গলা। আকাশ তার কটাক্ষ, সঙ্কেতে কাকে যেন আহ্বান করছে। সঙ্কেত যেন চলেছে গৃহে, অরণ্যে। অন্তঃপুরের নীল উৎসুক নয়ন আকর্ষণ করছে কর্মক্লান্ত পুরুষকে, বৃক্ষনীড় আকর্ষণ করছে চরন্-শ্রান্ত বিহঙ্গকে। পিঙ্গলার প্রমোদভবনের আকর্ষণও কম নয়। রূপের আকর্ষণ চুম্বকের মত। কুসুম্ভ-নির্যাসের মিষ্ট গন্ধে সুরভিত সৌরভাগার, পিঙ্গলার অঙ্গকস্তুরীর সুবাসে প্রমোদিত রাজপথ। সোৎকণ্ঠে সে তাকিয়ে থাকে পথিকের প্রতীক্ষায়, কটাক্ষে মোহিনী মায়া।

ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে নাগানন্দকে। দ্রুত এগিয়ে আসছে সে। নাগর নাগানন্দ। কি বিপুল দেহ! মুখে সঘন উদ্গার। ঘিনঘিন করতে থাকে পিঙ্গলার সর্বাঙ্গ। ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। উৎসাহী নাগানন্দ থমকে দাঁড়ায়, মুখখানা গম্ভীর করে উদ্গার ছাড়ে। পিঙ্গলা ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। নাগানন্দ একটু প্রতীক্ষা করে, তারপর গভীর নৈরাশ্যে ধীরে ধীরে চলে যায় সম্মুখপথে।

একে একে আসেন কূর্মরাজ, কুকরকেতু। ওদের দেখে পিঙ্গলা হাস্য সংবরণ করতে পারে না। কূর্মরাজের স্থূলদেহ, সারাক্ষণ মিটামট করছে চক্ষু। দেহকে এই স্ফীত করছে, পরমুহূর্তে করছে সঙ্কুচিত। কুকরকেতু আরও চমৎকার। উদরে চিরক্ষুধা, কণ্ঠে অনন্ত তৃষা। ত্রিবক্র দেহ, নাসায় নিরন্তর ফুৎকার। কী আছে ওদের? শুল্কই বা কী দেবে ওরা? রূপ?—আহা মরি! পিঙ্গলা কোন সঙ্কেতই করে না ওদের। উপেক্ষার হাসিতে নিরাশ হয়ে ওরা ফিরে যায়।

নাঃ—সৌরভাগারের দিকে আর আসছে না কেউ। সন্ধ্যার ছায়া ঘোর হয়ে আসছে। মনে আশার সহস্র দীপ জ্বেলে পিঙ্গলা এসে উপস্থিত হয় বারুণী ভবনে। নিশ্চয় ধনী নাগর মিলবে এখানে। ত্রস্ত অঙ্গবাস সুবিন্যস্ত করে সে দাঁড়ায় দেহলীর ওপরে—নয়নে সন্ধানী দৃষ্টি।

কে ও? দেবদত্ত?—হ্যাঁ, দেবদত্ত। বণিক দেবদত্ত অর্থবান। সাত সাতটি তার বাণিজ্য-তরণী, কিন্তু ভারি অলস। দেহে আলস্যের বিজৃম্ভণ। নিদকর্মে দেবদত্তের জুড়ি নেই। চির নিদ্রাকাতর—জাগলেও নেত্র অর্ধ-নিমীলিত, যেন শিবনেত্র, যেন মদের নেশায় বিহ্বল। কি শুল্ক দেবে দেবদত্ত? 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—এ উক্তি মিথ্যা নয়। কিন্তু চির অলস যে, চঞ্চলা তার বাণিজ্যলক্ষ্মী। নিদ্রাকাতর সিংহও আহার থেকে বঞ্চিত হয়। পিঙ্গলা দেবদত্তকে সংকেত করে না। বিরস বদন দেবদত্ত ঢুলতে ঢুলতে চলে যায়। উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি মেলে পিঙ্গলা আবার প্রতীক্ষা করে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসছে নাগর ধনঞ্জয়। ধনপতি ধনঞ্জয়—অনন্ত তার পিপাসা। সুদখোর পোদ্দার—অর্থশোষণে ওর জুড়ি নেই। টাকায় আড়াই আনা সুদ—অনাদায়ে সুদের ওপর চক্রবৃদ্ধি। ওর বুকে যেন মরুতৃষা। শুষ্ক চোখ, শুষ্ক মুখ। অনবরত হাই তুলছে, আর মুখে বলছে কালী কি দুর্গার নাম। হাই তুলতে তুলতে ধনঞ্জয় বারবার হাতে তুড়ি দেয়। হাসি পায় পিঙ্গলার। অর্থবান ধনঞ্জয়, কিন্তু হাড়-কৃপণ। পিঙ্গলার আশানুরূপ পণ্য দিতে ওর মুখ শুকিয়ে যায়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়। তারপর বলে, 'রূপের জন্য এত রূপা!' চোখ দুটো ওর এত বড় হয়ে ওঠে। পিঙ্গলা ধনঞ্জয়কে সঙ্কেত করে না। ধনঞ্জয়ের শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হয়। পিঙ্গলা কি পাওনা টাকার চক্রবৃদ্ধি কষেছে? আপন গরজেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় ধনঞ্জয়। পিঙ্গলা নূতন নাগরের আশায় আবার সম্মুখপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

নিবিড় হয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। তমঃপ্রচ্ছাদিতা ধরণী। রাজপথে

জ্বলে উঠেছে দীপাবলী। আঁধারের বুকের আলো ওই দীপ যেন অন্ধকারের পণ্যাঙ্গনা। কৃত্রিম রূপের সজ্জায় অন্ধকারের মন ভোলায়। পিঙ্গলাও বুঝি ওই দীপের মত। মূঢ়ের মন ভোলাবার জন্য দেহলীতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কই, কেউ তো আসছে না? পিঙ্গলা বারুণীভবন ত্যাগ করে আসে মণিময় পুরে। মণিমাণিক্যে খচিত মণিপুর। দীপালোকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে স্ফটিক, নীলা, গোমেদ। কে যেন ফুলঝুরিতে আগুন দিয়েছে। পিঙ্গলার নয়নে আশার মণিদ্যুতি, কল্পনায় রত্নের ফুলঝুরি। অংস-স্খলিত দুকূল সংবৃত করে সে মণিপুরের অলিন্দে দাঁড়ায়।

পুরদ্বারে ক্রমে এসে উপস্থিত হন বণিক 'অপান' দত্ত, শ্রেষ্ঠী 'সমান' শেঠ। অঙ্গরাজের রপ্তানিদ্রব্যের পরিদর্শক অপান দত্ত। অতিশয় কর্মদক্ষ। বহির্বাণিজ্যে তাঁর অপরিসীম কুশলতা। মন তার বহির্মুখী। কিন্তু অঙ্গরাজের অনুরোধে বাইরে বহু দূরে যেতে পারেন না তিনি। রাজার সঙ্গে কি যেন একটা গোপন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাঁর। রজ্জুবদ্ধ শ্যেনপাখির মত তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত। শ্রেষ্ঠী সমান শেঠও অতুল সম্পদ ও শক্তির অধীশ্বর। লোকে বলে, অঙ্গরাজের পুষ্টি সমান শেঠ, তারই প্রযত্নে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। তাঁরাই এসেছেন পিঙ্গলার রতার্থী হয়ে। কত রত্ন, কত কাঞ্চন, কত উপঢৌকন। কিঞ্চনের আকিঞ্চন।

তবু মন ওঠে না পিঙ্গলার। এঁরা প্রজামাত্র। রাজার ঐশ্বর্য এঁদের চেয়ে অনেক বেশি। হয়তো রাজা স্বয়ং আসতে পারেন আজ। পণ্যজীবিনী পিঙ্গলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেন? চোখে তার আলেয়ার আলো। অপান দত্ত, সমান শেঠকে সে প্রত্যাখ্যান করে, ফিরিয়ে দেয় ঐশ্বর্যের উপহার। আশার সীমা কোথায়? দীপালোকে কি দেখা যায় দিগন্তের চক্রবাল? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে পিঙ্গলা দেখতে চেষ্টা করে, তার চোখে আজ বসুমান বসুপতির স্বপ্ন।

কিন্তু আসছে না তো আর কেউ! আসবে, নিশ্চয় আসবে—ভাবে পিঙ্গলা। এখন তো মাত্র সন্ধ্যা। পশ্চিমাকাশে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ এখনও অস্ত যায়নি। চতুষ্কল বাঁকা চাঁদ, মুখে স্মিত হাসি। সে-ও যেন প্রতীক্ষা ব্যাকুল। সমুদ্র-প্রিয়া চাঁদ, তার হৃদয়ে রত্নাকর সাগরের স্বপ্ন। পিঙ্গলার আশার রত্নাকর কে? চাঁদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপহাসি হাসে পিঙ্গলা, সগর্বে তাকায় নিজের প্রতি। অপূর্ণ চাঁদ, ক্ষীণকল—কিন্তু সে পূর্ণ, ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ তার

যৌবন, নিখুঁত তার অঙ্গশ্রী। মণিপুরের অসংখ্য মণি লোলুপ দৃষ্টিতে তার প্রসাধিত পূর্ণ দেহের স্পর্শ কামনা করছে।

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ অস্ত গেল, অস্ত গেল অতৃপ্ত কামনা বুকে নিয়ে। দুরুদুরু কেঁপে উঠল পিঙ্গলার হৃদয়। মণিপুরের মাণিকদ্যুতি যেন অসহ্য বোধ হচ্ছে। ওরাও কি উপহাস করছে পিঙ্গলাকে ? ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিঙ্গলা ত্রস্তে অগ্রসর হল চতুর্থ পুরীর দিকে।

চিরসমীরিত অনাহতপুর মধ্যমা। পাঞ্চালরাজ, অঙ্গরাজের অতি প্রিয় প্রমোদাগার। দ্বাদশদল পদ্মের ধ্বজায় শোভিত ভবনশীর্ষ। মকরকেতন সদৃশ সে ধ্বজা মুনির মানসবিভ্রম সৃষ্টি করে। এই ভবনে কত রাত্রে কত তাপসের তপোভঙ্গ করেছে পিঙ্গলা, নিজে অবতীর্ণ হয়েছে উর্বশী, রম্ভা, মেনকা, বিদ্যুৎপর্ণার ভূমিকায়। তপোভঙ্গে তাপসের নয়নে সে বহ্নি দেখে নি কোনদিন, দেখেছে কামনার আলো, অনুরাগের দীপ্তি। রিক্ত অবধূতকে জয় করে বিজয়ের উল্লাস অনুভব করেছে পিঙ্গলা। কিন্তু আজ ভিখারী, রিক্ত অবধূতকে সে কামনা করে না, তার লক্ষ্য আজ ধনকুবের অঙ্গরাজ, 'প্রাণেশ'কে সে আজ চায় প্রাণপতিরূপে।

স্বীয় অঙ্গে অপাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় পিঙ্গলা। কণ্ঠহার, কাঞ্চী যথা সন্নিবিষ্ট। সাতনরী হারের দুটি লহর যেন স্বচ্ছ ঝরনার মত উন্নত পাহাড় ভেদ করে নামছে। হস্তদর্পণে সে চকিতে নিজের মুখ, কেশপাশ দেখে নেয়। একটু শিথিল হয়েছে কবরী, চূর্ণ কুন্তল ছড়িয়ে পড়েছে কর্ণান্তে। নিমেষে কেশবিন্যাস করে নেয়। অধরের তাম্বুলরাগ একটু ম্লান। করঙ্ক হতে একটি সুবাসিত তাম্বুল মুখে দেয় পিঙ্গলা। মুহূর্তে রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়ে অধরে, গণ্ডে। বঙ্কিম ভ্রূযুগল অনঙ্গের উদ্যত ধনু, কটাক্ষ কুসুমশর। অনাহতপুরের বহির্দ্বারে দাঁড়ায় অনঙ্গমোহিনী।

মনোজব পঞ্চাশ্বের রথারূঢ় হয়ে কেউ আসছে না ?—হ্যাঁ, পঞ্চ অশ্বযোজিত রথ। পিঙ্গালারই সামনে এসে থমকে দাঁড়াল, একটা চঞ্চল গতি যেন শুব্ধ হয়ে গেল চোখের পলকে। রথ থেকে নামছেন পাঞ্চালরাজ 'মানস'। সর্বাঙ্গে চঞ্চল বিদ্যুৎতরঙ্গ—চপলমতি পাঞ্চালপতি, সঙ্কল্পে-বিকল্পে চির-অস্থির। বদনে, নয়নে, বক্ষে, চরণে সেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গ। বহুবিস্তৃত তাঁর রাজ্য, বহুবিস্তৃত ক্ষমতা। পঞ্চ চর, পঞ্চ কর্মাধ্যক্ষ—পঞ্চে পঞ্চীকৃত পাঞ্চালরাজ্য। 'চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ'—পাঞ্চালরাজ তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অতি ধূর্ত ছয়জন মন্ত্রী, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত। রাজা হয়েও পাঞ্চালরাজ এই ষণ্মন্ত্রীর অধীন। মর্ত্যের ইন্দ্র যেন

পাঞ্চালেশ্বর। ইন্দ্রের মতই ভোগী, ইন্দ্রের মতই প্রতাপশালী। অসীম তাঁর ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে সৃষ্টিকে তিনি নরকে পরিণত করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে স্বর্গও করে তুলতে পারেন নরককে। সবই নির্ভর করে তাঁর ইচ্ছার ওপর। সৃষ্টির অমৃত ও গরল—দুই-তাঁর করায়ত্ত।

নাগরবৃত্তিতেও নিপুণ পাঞ্চালরাজ। চতুঃষষ্ঠী কলার তিনি অধীশ্বর। অসম্ভব জল্পনা ও অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা তাঁর ইঙ্গিতের দাসী। সুদক্ষ শিল্পীর মত তিনি বাক্‌চতুর। কল্পনা করে এমন গল্প রচনা করেন যে, তাকে মিথ্যা বলার উপায় নেই। মানুষের মনস্তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। লোকে বলে, সত্যযুগে উনিই নাকি ছিলেন আদি 'কবির্মনীষী'।

পাঞ্চালরাজ মানসের এই কবিত্ব পিঙ্গলা উপভোগ করেছে অনেকদিন। অনেক উতলা মাধবী রাতে পাঞ্চালরাজের সরস প্রণয়ভাষণে মোহিত পুলকিত হয়েছে পিঙ্গলা। লুব্ধ চিত্তে বাক্যসুধা পান করেও তৃপ্তি হয় নি। কিন্তু আজ কবিত্বে পিঙ্গলার প্রয়োজন নেই। যত অপ্রয়োজনের বোঝা স্তূপীকৃত করে কবি। মিথ্যার ফানুস রচনায় ওরা অদ্বিতীয়। বস্তু নয়, অবস্তু নিয়ে ওদের কারবার। পণ্যাঙ্গনা পিঙ্গলা, পিঙ্গলার কাম্য পণ্য। বাণীর বরপুত্র নয়, আজ লক্ষ্মীর বরপুত্রে তার আসক্তি। ঐশ্বর্য পাঞ্চালরাজেরও আছে, কিন্তু অঙ্গরাজের তুলনায় তা নগণ্য। পাঞ্চাল তো অঙ্গের করদ রাজ্য। পিঙ্গলা ইচ্ছা করে কোন সঙ্কেত করে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রগলভ পাঞ্চালরাজ এসে সম্মুখে দাঁড়ান। একগাল হেসে বলেন, 'কি গো, আজ যে রাজরাজেশ্বরীর বেশ। কোন্ কন্দর্পের দর্প হরণ করবে? কন্দর্প তো ভস্ম হয়েছে অনেক দিন। অনঙ্গ আজ ভর করেছেন আমাদের অঙ্গে। এই দিকেই দৃষ্টি ফেরাও সজনী!'

পিঙ্গলা উত্তর দেয় না। দুরাশার নিঃসীম সাগরে দোল খাচ্ছে তার মন। হয়তো কানেই যায় না মানসের কথা। সে ভাবে, বাঁকা চাঁদটা কোথায়? নয়নে কি এখনো তার রত্নাকরের স্বপ্ন? অস্ত সীমায় রত্নাকর কি বুকে টেনে নিয়েছে তাকে?

অপ্রস্তুত পাঞ্চালরাজের রত্নকুণ্ডল গণ্ডে দোল খেতে থাকে। কণ্ঠের রত্নহার অর্ঘ্যের মত হস্তে ধারণ করে তিনি বলেন, 'এষ অর্ঘ্যঃ'—

বাক্য শেষ হয় না। সঙ্কোচে সরে দাঁড়ায় পিঙ্গলা। আরও মহার্ঘ অর্ঘ্য আজ তার কাম্য। শুধু রত্নহার আজ তুচ্ছ। অমরাবতীর ইন্দ্রমায়া তার অন্তরে।

অঙ্গপণ্যে আজ ইন্দ্রাগার জয় করবে সে। বারাঙ্গনা অলুব্ধা নয় কোনদিনই—আজ অন্তহীন লোভ, আজ অপরিমেয় আশা।

উপেক্ষায় ক্ষুব্ধ হন পাঞ্চালরাজ। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। চন্দ্রবংশে তাঁর জন্ম। রসাধার যেমন সোম, তেমনি রসে পূর্ণ তাঁর মন। সরস একটা ব্যঙ্গ সোচ্চার হয় তাঁর কণ্ঠে, 'পতিব্রতা সূর্যপ্রিয়ার আজ বুঝি পতি-প্রসাদন ব্রত? পতিতার এত পতিপ্রাণতা! জানতুম না তো এতদিন!'

বিদগ্ধা বারাঙ্গনা পিঙ্গলা। বাগবৈদগ্ধ্য তারও অসামান্য। প্রত্যুত্তর দিতে বিলম্ব হয় না তিলার্ধও, সে বলে, 'পতিপ্রাণতাই তো বহুপতিক পতিতার ধর্ম। সে তো একবীরা নয়, বহুবীরা।'

—কোন্ ভাগ্যবান বীর আজ বীরবধূকে ব্রতচারিণী করেছে, তাই তো প্রশ্ন!

—সে যিনিই হন, অন্তত আজকের রাতে তিনি চন্দ্রবংশজ নন।

—ঠিকই ধরেছি। সূর্যমুখীর অন্তরে আজ সূর্যের ধ্যান। কিন্তু ওগো তপন-প্রিয়া, নিশীথে যে নিশাকরেরই একাধিকার।

—নিশাকরের সে একাধিকার জেনো দিবাকরেরই কৃপায়। করদ পাঞ্চাল—সে কথা কি ভুলে গেলে?

আহত পাঞ্চালরাজ মুহূর্তে বুঝতে পারেন কটাক্ষ। কামান্ধ ক্রোধান্ধও যে না হন, তা নয়। কিন্তু কামমোহিতের ক্রোধ কাপুরুষের মতই—নিজের অঙ্গলগ্ন হয়ে অঙ্গেই নির্বাণলাভ করে। তবু শেষ চেষ্টা করেন পাঞ্চালরাজ:

—পণ্যে ক্রেয় পণ্যাঙ্গনা: সে যে-কোন পথিকের ভোগ্যা। স্বৈরিণী-সরোবরে অবগাহন করার অধিকার সকলেরই—হোক সে রাজা, হোক সে প্রজা কিংবা করদরাজ।

—কিন্তু মানস-সরোবরে অবগাহন করার অধিকার রাজহংসেরই। পুষ্পিত সহকারকে পরিত্যাগ করে কোন্ মধুকরী অপুষ্প বৃক্ষকে ভজনা করে?

—ওগো সূর্যপ্রিয়া, আজ যে বড় বড় কথা শুনছি তোমার মুখে!

—সে তো তোমাদেরই দেওয়া দান। আলো-হাওয়া দিয়ে আশার মুকুলকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করেছ তোমরাই। অশেষ বন্যবাদ তোমাদের।

পিঙ্গলার কণ্ঠস্বর যেন কাঁপছে। পাঞ্চালরাজ বোঝেন, গতিক আজ সুবিধের নয়। হয়তো পিঙ্গলা আজ বাগদত্তা। তাতে দুঃখই বা কি? চঞ্চল পুরুষ চিরস্বাধীন, স্বেচ্ছাচারিণী নারীর চেয়েও স্বাধীন। তাদের নিমন্ত্রণ অনেক রূপের রূপমহলে। পিঙ্গলা প্রত্যাখ্যান করেছে, তিনি ইড়াকে বরণ করবেন।

ইড়া না হয়, আছে গান্ধারী, কুহূ, শঙ্খিনী, বারুণী, অলম্বুষা। নারীর অভাব কি? বিদেহনগরে, অঙ্গে, পাঞ্চালে 'সার্ধ লক্ষত্রয়' সঙ্কেতোপজীবিনী। সকলেই পিঙ্গলার মত দুরাশা পোষণ করে না।

পাঞ্চালরাজ দ্রুত পঞ্চ অশ্ববাহিত মনোজব রথে অরোহণ করেন। চক্ষের পলকে রথ অদৃশ্য হয়ে যায়।

কেমন যেন হয়ে যায় পিঙ্গলা। অত্যন্ত অস্বস্তি। পাঞ্চালরাজ মানস। কতদিন পিঙ্গলা ওকে কামনা করেছে। যেদিন সে কাছে এসেছে, পিঙ্গলা অন্য নাগরকে বিদায় করেছে সঙ্কেতবাক্যে। ওর স্পর্শে উন্মাদ হয়ে উঠেছে পিঙ্গলা, রক্তকণায় যেন মাতাল ঢেউ। ওর কবিত্বে স্বপ্নে বিভোর হয়েছে সে—নয়নে রূপলোকের মোহ। চঞ্চলকে বশ করে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে পিঙ্গলা। আজ অতিলোভের বশবর্তী হয়ে পিঙ্গলা একি করল! আনমনা হয় বিশ্বমোহিনী।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হয়ে গেছে। রাজপথে বিরল জনসমাগম। মাঝে মাঝে আসছে দু-একজন, সঙ্কেত করার মত পথিক তারা নয়। আজ পিঙ্গলা কামনা করে অঙ্গরাজকে। কোথায় তিনি, তার কামনার স্বপ্ন? পিঙ্গলার আশা চঞ্চল হয়ে কাঁপছে রাজপথের দীপালোকের মত। ওরাও প্রতীক্ষাব্যাকুল উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। কার ধ্যান ওদের বুকে?—পতঙ্গ? কামোন্মত্ত হয়ে যে দগ্ধ হয় রূপের আগুনে? পিঙ্গলার মনে হয়, প্রদীপ পতঙ্গ-প্রিয়া নয়, প্রদীপের অন্তরে দূরাকাশের চন্দ্রতারকার ধ্যান। সেই চন্দ্রতারকা কি বাস্তব মূর্তি ধরে নেমে এসেছে কোনদিন?—আসে নি। তবু তো আশাহত হয় নি প্রদীপ। অনন্তকাল ধরে যেন প্রতীক্ষা করছে ওরা।

পিঙ্গলার সন্ধানী দৃষ্টি আরো তীব্রতর হয়। প্রদীপের সারি ছাড়িয়ে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে দূর অন্ধকারে। অন্ধকার—সৃষ্টিকর্তা বিধাতার তামসী তনু। সিসৃক্ষু বিধাতা নাকি বহুবার তনু ত্যাগ করেছেন। অবুদ্ধিপূর্বক যখনি সৃষ্টিতে উন্মত্ত হয়েছেন তিনি, তখনি হয়েছে ঘোরা তামসী সৃষ্টি। সে সৃষ্টি সৃষ্টির ব্যভিচার, অমঙ্গলের নিদান। ক্ষুব্ধ হয়েছেন বিধাতা, ত্যাগ করেছেন অশুচি তনু। বিধাতার এই পরিত্যক্ত তনুই সন্ধ্যা, দোষা, নিহারময় তমঃ। অন্ধকার সেই তামসী তনুর আর এক প্রতিরূপ। পুংশ্চলী তমসা—প্রেত-পিশাচের ভোগ্যা। বুকে ওর রাক্ষসী ক্ষুধা। বিকট গ্রাস যেন মেলে ধরেছে পৃথিবীর দিকে। লোভের বিশ্বগ্রাসী রূপ দেখে নিজের অন্তরে নিজেই শিউরে ওঠে পিঙ্গলা। তার আশাও কি অমনি কদর্য, অমনি সর্বগ্রাসী!

মধ্যমা পুরী আর ভাল লাগছে না পিঙ্গলার। প্রমোদভবনের একটানা অনাহত মূর্ছনা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। দ্বাদশদল কমলের সুউচ্চ ধ্বজাটা যেন দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। আকাশকে যেন স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছে সে। কি স্পর্ধা! কোথায় আকাশ, আর কোথায় এই পতাকা! নাঃ, পাঞ্চালরাজ মানসকে উপেক্ষা করা উচিত হয় নি পিঙ্গলার। এত আশা কি ভাল? যদি অঙ্গরাজ প্রাণেশ আজ না আসেন? বিদেহনগরে রূপজীবিনী সে তো একা নয়। গান্ধারী, শঙ্খিনী, কুহূ—সর্বোপরি রয়েছে ইড়া, তারই সহোদরা। আশঙ্কায় দুরুদুরু কাঁপে পিঙ্গলার হৃদয়।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। এই প্রহর ভোগীর সম্ভোগকাল। শিশু সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ে। বৃদ্ধ দ্বিতীয় শিশু—ভোগে বীতস্পৃহ। শিশুর মতই সন্ধ্যায় শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে জরাতুর। তার তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়নে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন, ভোগ-প্রহরে সে কালের ঘণ্টা শুনে চমকে ওঠে। কিন্তু ভোগী অতন্দ্র হয়ে জেগে থাকে রাত্রির এই দ্বিতীয় প্রহরে। বরাঙ্গনা কিংবা বারাঙ্গনা কারও চোখে ঘুম নেই। ভোগপ্রমত্তের দেহে উত্তেজনা, অন্তরে কামনার নৃত্য, নয়নে রঙের মশাল। বাইরে অন্ধকার—ভিতরে উল্লাসের দীপ্তি। মধুকণ সদৃশ কাম, মাধ্বিক মধুর মতই মোহকর। হৃদয়ে আশ্লিষ্ট হৃদয়, বিশ্লিষ্ট বহির্জগৎ।

দারুণ অস্বস্তি বোধ করে পিঙ্গলা। সে ভাবতে চেষ্টা করে, গান্ধারী অলম্বুষা, কুহূ—আজকের রাতে তারাও কি পিঙ্গলার মত নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ কেন হবে। আসঙ্গকামনায় তারা হয়তো এতক্ষণ বরণ করে নিয়েছে দেবদত্ত কিংবা ধনঞ্জয়কে। তাদের প্রমোদকক্ষে এখন উল্লাসের কলরোল। কৃকরকেতুর হাঁচি হয়তো শান্ত হয়েছে শঙ্খিনীর বাহুবেষ্টনে। ইড়া?—পিঙ্গলার প্রতিদ্বন্দ্বিনী সহোদরা? হয়তো পাঞ্চালরাজ মানসের পঞ্চাশ্ববাহিত আজানেয় রথ তার দুয়ারে গিয়েই থেমেছে আজ। লোকে বলে, অসাধারণ গুণবতী ইড়া। তার তুলনায় পিঙ্গলা নাকি ক্রূরা, ছলনাময়ী। উপেক্ষিত শত্রুরা বলে, পিঙ্গলা মায়াবিনী—বশীকরণে, আকর্ষণে, এমন কি মারণকর্মেও সে নাকি যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে।

অন্তঃকর্ণে পিঙ্গলা শুনতে পায় শত্রুর দুরুক্তি। ঈর্ষায় উন্মাদ হয়ে ওঠে সে। অতৃপ্ত কামনা বুভুক্ষু পিশাচীর মত চোখে জ্বলজ্বল করে—হৃদয়ে গর্জন করে ক্ষুধাতুর বাঘিনী। দুরন্ত আক্রোশে ওষ্ঠাধর দংশন করতে থাকে সে। অঙ্গরাজ কি আসবেন না তাহলে? রাত্রির ভোগপ্রহর অতীত হয়ে গেল যে! হতাশার বিক্ষোভে কণ্ঠ, তালু শুষ্ক মনে হয়।

এবার পিঙ্গলা সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। পণ্যাঙ্গনার অমিত পণ্যলিপ্সা তার মধ্যে একটা ব্যর্থতার হাহাকার জাগিয়ে তোলে। ব্যর্থ তাহলে এই রূপ? ব্যর্থ অঙ্গসজ্জা। উন্নত পীনবক্ষ যেন পিঙ্গলাকে ব্যঙ্গ করে, কটিদেশে কাঞ্চীর নিক্কণ যেন উপহাস করে তাকে। নূপুর-শিঞ্জিনীতে গুঞ্জরিত কি বক্রশ্লেষ? পিঙ্গলার মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে।

আর ভাবতে পারে না সে। অদূরে পুরন্ধ্রী পুরী—লোকে আদর করে তাকে বলে 'সুষুম্না' পুরী। শান্তির শুভ্রালোকে উদ্ভাসিত সর্বশুক্লা পুণ্যময়ী পুরা প্রশান্ত, সদানন্দ। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে গৃহপ্রদীপের শান্ত শিখা। কি স্নিগ্ধ, কি শীতল! পুণ্যবতী পুরন্ধ্রী। তার অন্তরে দুরাশা নেই, জ্বালা নেই। পুণ্যবান গৃহমেধীর একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ তাঁর হৃদয়। সীমন্তে সৌভাগ্যরেখা—সতী নারীর বিজয় কেতু। অম্লান তার দীপ্তি। কি গভীর শান্তি। কি সুগভীর তৃপ্তি। পুরন্ধ্রী পুরীর দিকে তাকিয়ে স্বৈরিণী পিঙ্গলার নয়ন চিকচিক করতে থাকে। চোখে কি জল নামে?

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে পিঙ্গলা ধীর চরণে এসে উপস্থিত হয় 'শূন্যসদ্মে।' সোৎকণ্ঠ অভিসারিকার উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে এসেছে। আর সে উৎসাহ নেই। আশা আছে, সে যেন ভগ্নাংশের শেষ আশা, অতিক্ষীণ তার দীপ্তি। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে ধীরে ধীরে নির্জন দেহলীর ওপর এসে সে দাঁড়ায়।

নিম্নে জনহীন পথ, চলে চলে শ্রান্ত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এবার। পথের দীপাবলীতে একটা নিশ্চল প্রশান্তি। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ঘুমন্ত পৃথিবী। লোভী পৃথিবী, আশাতুর পৃথিবী—যেন আশাহত হয়েই শান্ত হয়েছে। পুরন্ধ্রী পুরী গভীর নিদ্রামগ্ন। সংযত কামনার পবিত্র হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিয়ে, পুরোহিত যেন শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে শান্তির জলে অভিষিক্ত করে দিয়েছেন গৃহস্থের অন্তর। এখনও যেন শেষ রাগিণীর মত জাগছে তার অনুরণন—ওঁ শান্তি! দ্যৌ শান্তি! পৃথিবী শান্তি! অন্তরীক্ষ শান্তি!

নিরাশ হলেও ঈর্ষা হয় না পিঙ্গলার। উদার-দৃষ্টি পৃথিবী ছেড়ে বিস্তৃত হয় ঊর্ধ্বে। নির্জনতা এমনি করেই মানুষের মনকে ঊর্ধ্বগামী করে তোলে। নিঃসীম কালো আকাশ। কী বিরাট! আকাশের বুকে অগণিত আশার আলো। ওরা তো উদ্দাম নয়, উদ্ধত নয়। সুস্নিগ্ধ, শান্ত! ওই চন্দ্রপত্নী সপ্তবিংশ নক্ষত্র—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকাদি ষট্‌মাতৃকা। কি গভীর তৃপ্তির হাসি ওদের মুখে। সপত্নীবিদ্বেষ ভুলে গেছে তারা। শূন্যাখ্য অভিজিৎ নক্ষত্র কোন্‌টি? নয়ন বিস্ফারিত করে দেখতে চেষ্টা করে পিঙ্গলা।

ওই দূরে সপ্তর্ষিমণ্ডল—স্থির, শান্ত। সতী অরুন্ধতীর নয়ন কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল তাকে নিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডল একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। কি তাদের প্রশ্ন? পিঙ্গলার অপরিমিত আশার শেষ কোথায়—এই কি তাঁদের জিজ্ঞাস্য?—কি উত্তর দেবে পিঙ্গলা? কি উত্তর দেবে আশার সমুদ্রে নিমগ্না পিঙ্গলা? সাধ্বী অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে পিঙ্গলার বুক কাঁপতে থাকে! তিনি যদি প্রশ্ন করেন, ভানুমতী তুমি, সূর্যপ্রিয়া; কেন পতন হল তোমার?'—লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয় পিঙ্গলা। অন্তরে অনুশোচনার দংশন। স্বর্গসম্ভবা সে, সূর্যস্বরূপিণী—কিন্তু সে স্বর্গভ্রষ্টা! বুকের অতলে জাগে অশ্রু-উচ্ছ্বাস।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুচ্ছরেখায় অদূরে, ঠিক উত্তরে উজ্জ্বল ধ্রুবনক্ষত্র। ধ্রুবজ্যোতি ধ্রুব নক্ষত্র। একটি শিশু-হৃদয়ের ভক্তিবলে স্বর্গীয় কৃপা লাভ করেছে। জ্যোতিশ্চক্রে অক্ষয় তাঁর আসন। শাশ্বত শান্তির প্রতীক ওই ধ্রুবতারা। সংসারতরঙ্গের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে আছে, করুণার দৃষ্টিতে দেখছে যেন সংসারের অশান্ত তরঙ্গভঙ্গ, যেন মৌন ইঙ্গিতে বলছে আশাপ্রমত্ত মানুষকে, 'ত্যাগ কর অধ্রুব চঞ্চল আশা, দমন কর লোভ। দেখ এই ধ্রুবজ্যোতি। অনির্বাণ আমার দীপ্তি। আমিই আশার আশা. আমিই অনাদি, অনন্ত। অশান্তিতে আমি শান্তি, লোভের পরমা নিবৃত্তি। চঞ্চল গ্রহ, চঞ্চল নক্ষত্র—কল্পান্তে তাদের প্রলয় হয়, আমিই শুধু স্থির থাকি। আমি অব্যয়, অক্ষয়, ধ্রুব। আমি বিষ্ণুর পরমপদ—পরমা শান্তি। আমাকে দেখ, আমাকে ভাল করে দেখ।'

নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে পিঙ্গলা। স্থির দৃষ্টিতে বেদনার অশ্রু চিক-চিক করে। মনের অতলে তবু কোথা থেকে নামে যেন সুখের জোয়ার! আসবে না, কেউ আসবে না আজ। শুক্লের আশায় আজ নিরাশা। পণ্য-জীবিনী পিঙ্গলার সমূহ ক্ষতি। তবু একি সুখের নৈরাশ্য! ওই পূর্বদিগন্তে উদিত হয়েছে শুকতারা—ত্রিযামার শেষ ঘোষণা, ওই দিক্‌চক্রবালে উষার শুভ্র জ্যোতিরেখা—শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তের চিহ্ন। যোগীদের জেগে ওঠার সময় এখন, ভোগীরা ঘুমিয়েছে অনেকক্ষণ।

পিঙ্গলার দুচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ধীরে শূন্যসদ্মের কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে। শান্তির ঘুম যেন ডাকছে তাকে, ডাকছে শূন্য শয্যা। বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি, তবু শান্তি অনুভব করে পিঙ্গলা। বিরহিণী বিপ্রলব্ধার বিরহকুঞ্জে আজ বুঝি ভাবসম্মিলন। কোথায় যেন কিসের উৎসব শুরু হয়েছে মধুর সুরে বাজল কি ভোরের সানাই!

ক্লান্তিভরে পিঙ্গলা শয্যায় দেহ এলিয়ে দেয়, মুদ্রিত নয়নে ভাবে, 'কি সুখের এই নৈরাশ্য! কি আনন্দ এই নিরাশায়! দুরাশার তাড়নায়, কি দুঃসহ দুঃখ, অশান্তি ভোগ করেছি এতক্ষণ! সন্ধ্যা থেকে শেষরাত্রি—স্বস্তি ছিল না, ছিল না শান্তি। লোভ, দুরাশা উন্মাদ করে তুলেছিল আমাকে। এখন কি আরাম! কত মধুর এই লোভের অবসান, কত গভীর নিরাশার প্রসাদ!'

পরম নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদ্রিত করে পিঙ্গলা। দূর থেকে ভেসে আসছে গন্ধর্বকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত, মধুর লয়ে ঝঙ্কৃত কিন্নরীর গান। গবাক্ষপথে প্রবেশ করছে মৃদুমন্দ সমীরণ। রজনী প্রভাতকল্পা। মধুর নিশান্তে স্বপ্ন দেখে পিঙ্গলা, অতি মধুর স্বপ্ন :

সুদূর দেবযানলোক থেকে সুশুভ্র ছায়াপথের ওপর দিয়ে কে যেন নেমে আসছেন। হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির্ময় বিরাট তনু। সমুজ্জ্বল, অথচ শান্তিঘন স্নিগ্ধ কান্তি। সুপ্রসন্ন বদন, সুপ্রসন্ন নয়ন। চতুর্দিকে নিঃসীম প্রশান্তি।

পিঙ্গলা যেন চেনে এই বিরাট পুরুষকে। হ্যাঁ, সেই কমলযোনি বেদগর্ভ ব্রহ্মা। তিনিই এসে দাঁড়িয়েছেন পতিতা পিঙ্গলার সম্মুখে। নাম ধরে ডাকছেন তাকে, কথায় অমৃতের ধারা, 'পিঙ্গলা!'

বিস্মিত, সচকিত পিঙ্গলা। ত্রস্তে সে উঠে দাঁড়ায়। তার দুটি কর আপনিই যুক্ত হয়। করজোড়ে সে আদেশ প্রতীক্ষা করে। বুকে কিসের যেন কম্পন!

বিধাতাপুরুষ বলেন, তিনি অভয়ের অধীশ্বর, বাণী তাঁর মধুক্ষরা : 'পিঙ্গলা, আজ তুমি শাপমুক্ত। অপরিমিত আশায় তুমি অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলে। সেদিন তুমি ছিলে কামার্তা, ভ্রষ্টা। আমি বলেছিলাম, যেদিন এই আশা ত্যাগ করবে, সেদিন আবার স্বর্গের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হবে তোমার তরে। আজ তুমি নিরাশ হয়ে দুরাশা পরিত্যাগ করেছ, শ্রান্ত হয়ে বিসর্জন দিয়েছ অমেয় লোভ। আজ তোমার অশান্তির অবসান। সুখাবহ নির্বেদ তোমাকে আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর তুমি মর্ত্যের স্বৈরিণী, সঙ্কেতোপজীবিনী নও, তুমি সেই সূর্যসনাথা সূর্যপ্রিয়া। ওই দেখ, বিশ্বচক্ষু বিবস্বান সাগ্রহে তোমার আলিঙ্গন প্রতীক্ষা করছেন। স্বর্গের বধূ সূর্যস্বরূপিণী তুমি, এস, স্বর্গে আবার তোমার আসন গ্রহণ কর।'

পিঙ্গলা কথা বলতে পারে না। আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আবেশে কম্পিত সর্বদেহ, দেহে পুলক রোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুর প্রবাহ। কি অনির্বচনীয় শান্তি। শান্তির অফুরন্ত নির্ঝর যেন অবারিত হয়েছে কতদিন

পরে। এত সুখ, এত আনন্দ কার? পিঙ্গলার দুচোখ আবেশে নিমীলিত হয়ে আসে, মূর্ছিতের মত সে বিধাতা পুরুষের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে। অমৃত ও অভয়ের অধীশ্বর বিরাট পুরুষ তার অঙ্গে তাঁর আরক্ত করকমলের স্পর্শ বুলিয়ে দেন। তপ্ত দেহ যেন জুড়িয়ে যায় পিঙ্গলার।

অন্তর্ধান করেন বিধাতা পুরুষ। জেগে ওঠে পিঙ্গলা। অবাক বিস্ময়ে সে দেখে, প্রভাতের অরুণ সূর্য সহস্ররশ্মি দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করছেন। পিঙ্গলার বুকে সুধাক্ষরণ করছে যেন সুধাসমুদ্র, মধুবর্ষণ করছে যেন প্রভাতের অম্বর। সে সুধাধারার শেষ নেই। *
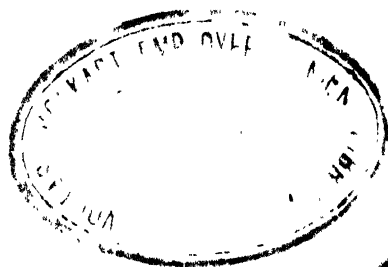
* পিঙ্গলার উপাখ্যান রয়েছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১ স্কঃ, ৭ অঃ)। এখানে যোগশাস্ত্রের পিঙ্গলা নাড়ীর রূপক গ্রহণ করা হয়েছে। সৌরভাগারাদি পঞ্চ প্রমোদাগার আধারাদি পঞ্চ কমল : প্রাণেশ প্রভৃতি নাগর প্রাণাদি বায়ু। যোগশাস্ত্র মতে প্রাণবায়ু যতক্ষণ পিঙ্গলায় প্রবাহিত হয়, ততক্ষণ সাধক চঞ্চল—পিঙ্গলা নিরাশ হলেই মন, প্রাণ শান্ত হয় এবং তখনই সাধক সমাধি-শান্তির স্তরে উন্নীত হন।